কর্ম্ম-কথা

"কুর্ব্বন্নেবেহ [illegible] জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ.

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩০নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৭

মূল্য ১৷৹ টাকা।

কলিকাতা,

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

দেব নরেন্দ্রনারায়ণ,

ঊর্দ্ধে যাহার মূল, অবাক্ যাহারা শাখা, সেই সনাতন অশ্বত্থের পত্রচ্ছায়ায় সংসারের আতপদগ্ধ নরনারী বিশ্রাম করিতেছে; ক্ষুৎপীড়িত মানবের জন্য পিপ্পল ফলের আহরণ করিতে দেবগণ সেই অক্ষয়তরুর শাখাবলম্বনে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যলোকের সম্বন্ধ এইরূপে স্থাপিত হয়, তাহা স্বীকার করি।

বঙ্গের পল্লীসমাজের একদেশে পৃথিবীর সঞ্চিত ধূলিস্তূপে গার্হস্থ্য কর্ম্মতরুর প্রতিষ্ঠায় তোমার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল; শ্রদ্ধার ও নিষ্ঠার বারিসেকে আজীবন তুমি তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলে; নর নারীকে তাহার ফলচ্ছায়া ভোগ করিতে চক্ষে দেখিয়াছি।

আত্মীয়জনের ও আশ্রিতগণের যুগপৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য তোমার দিব্যমূর্ত্তি এখন লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত। তোমার প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম-তরুর শাখাপল্লব তোমার অন্তর্দ্ধানে ছিন্ন হইয়া ভূলুণ্ঠন করিতেছে; পৃথিবীর মলিন ধূলি তাহাকে ধূসরিত করিতেছে। মিত্রাবরুণ তুল্য যে পুরুষদ্বয় তোমাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধরায় আসিয়াছিলেন, যাও দেব, ত্বরায় যাও, যেখানে তাঁহারা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। কর্ম্ম তোমার অসমাপ্ত রহুক।

জানিলাম, ইহা নিয়তির বিধান;—নিয়তির জয় হউক।

ভাগ্যহীন পুত্র

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নিবেদন

এই গ্রন্থখানি পাঠকগণের সম্মুখে আনয়ন করিবার সময় গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য বহুস্থলে পুনরুক্তি এবং কোথাও বা অসঙ্গতি-দোষ দেখা যাইতে পারে। তবে মোটের উপর একটা সূত্রে সবগুলি বাঁধা আছে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি দাঁড় করাইয়াছি। কর্ম্ম-পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখ্য বক্তব্য। যজ্ঞ-নামক অন্তিম প্রবন্ধে ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতিপয় প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর যে কটাক্ষ আছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন পাঠক লেখকের প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিতে পারেন; কিন্তু ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যদ্দ্বারা মানুষে জীবনের কর্ম্মভারগ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়াছেন। জীবনসমরে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানব শান্তিপ্রয়াসী হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনে বিমুখ হয় এবং এইজন্য দারাসুত-পরিবারকে বিধাতার কৃপার অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে পলায়নের প্রবৃত্তি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অনেকের পক্ষে দেখা যায়। বস্তুতই সারা জীবন লড়াই করিয়া এক সময়ে যদি কাহারও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার ইচ্ছা হয়, সে সময়ে ছুটি না দিলে কতকটা নিষ্ঠুরতা হয়। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি যে কোন

সময়ে এইরূপ ছুটি চাহিতে গেলে সমাজ থাকে না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সঙ্ঘের এবং ইউরোপে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ইতিহাস অবহিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে এই শ্রেণির সন্ন্যাসীর দল শেষপর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজশত্রুর দলে পরিণত হইয়া পড়ে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সংসারতাপদগ্ধ মানবকে যথাসময়ে ছুটি দিতে আপত্তি করিতেন না; বার্দ্ধক্যে যখন সেবা করিবার ক্ষমতা যায় এবং সেবা লইবার সময় আইসে, সেই সময়কেই প্রব্রজ্যাগ্রহণের কাল বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সাধারণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; এবং গৃহধর্ম্মত্যাগের পর ও যতিধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে বানপ্রস্থের অতি কঠোর ব্রতের ও অতি দুষ্কর তপস্যার ব্যবস্থা করিয়া অনধিকারী ব্যক্তি যাহাতে প্রব্রজ্যাগ্রহণে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কর্ম্মপরিত্যাগ করিতে কেহ কোন কালেই পারে না। জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহারনিদ্রাদি স্বার্থপর কর্ম্মের পরিত্যাগ জীবের পক্ষে সাধ্যই নহে; তখন কেবল পরার্থপর কর্ম্ম পরিহার করা কখনই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। ঈশাবাস্য হইতে ভগবদ্গীতা পর্য্যন্ত সমুদয় উপনিষৎ এবং মন্বাদিপ্রণীত যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান্ তথাগত, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী অনেক মহাত্মা অকালে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই; বরং তাঁহারা ক্ষুদ্র কর্ম্মের স্থলে বৃহৎ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের ফল সমস্ত মানবজাতি অদ্যাপি ভোগ করিতেছে এবং চিরকাল ভোগ করিবে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে অভিন্ন। সেই বৈরাগ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত আমার পক্ষে সাধ্য নহে।

পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। আধুনিক কালের হিতবাদী পণ্ডিতেরা যেরূপে উত্তর দেন,

তাহাতে তৃপ্তি হয় না। ডারুইনপন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে বোধ করি এই খানেই নিরস্ত হইতে হয়। আমি কেন পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞানবিদ্যার নিকট পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রেরণার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের বীজের মধ্যে নিহিত আছে, এই গ্রন্থের অন্তিম প্রবন্ধে সেই কথা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি জানি না।

অধ্যাপক ডয়সেন তাঁহার *Philosophy of the Upanishads* নামক বিখ্যাত পুস্তকের শেষ ভাগে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞান-কাণ্ডের বিরোধের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, মূশা-প্রবর্ত্তিত পুরাতন বিধান ও যীশু-প্রবর্ত্তিত নূতন বিধান ইহাদের পরস্পর যে সম্পর্ক, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্পর্ক কতকটা সেইরূপ; একের ভিত্তি legality, অপরের ভিত্তি morality; এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে না। কেবল ডয়সেন কেন, এই বিরোধের সম্মুখে আসিয়া অনেক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরই এইরূপ খটকা বাধে। কর্ম্ম-কাণ্ডের সঙ্কীর্ণ "গণ্ডী" ও তাহার জটিল বন্ধন দেখিয়া মুক্তিপ্রয়াসী বহু সাধু ব্যক্তি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব-সমাজ এই কর্ম্মকাণ্ডকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া থাকিতে যায়; সময়ে সময়ে কোন কোন মহাপুরুষ আসিয়া প্রাচীরের বেড়া ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহার স্থলে হয় স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া সমাজধর্ম্মকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, অথবা নূতন একটা প্রাচীর উঠিয়া নূতন বেষ্টনের সৃষ্টি করে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান লইয়া এই কর্ম্মকাণ্ড, কোন সমাজই কোনরূপে তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে না; উহারা কেবল মূর্ত্তি বদল করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়। মানবের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এই ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তি-

হীন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না; মানব-সমাজরূপ জীবন্ত যন্ত্রের আত্মরক্ষণ-প্রয়াস হইতে ইহার উৎপত্তি। আচার এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এই দুই প্রবন্ধে এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু ইহার মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলা ঘটে নাই। আমার বিশ্বাস কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে আপাততঃ যে বিরোধ দেখা যায়, সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্যের আবিষ্কার ভগবদ্গীতায় ঘটিয়াছে। Legality ও morality এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মূলগত ঐক্যসংস্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার মাহাত্ম্য। এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা কখনও বলিবার অবসর পাইব কি না জানি না।

কোন্ প্রবন্ধ কবে কোথায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সূচীপত্রে উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতিপূজা নামক প্রবন্ধটি আমার জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দিয়াছিলাম। সেখান হইতে সরাইয়া এই গ্রন্থে স্থাপন করিলাম। ধর্ম্মের জয় প্রবন্ধটি বৌবাজারের সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটুটের অনুরোধে ক্লাসিক থিয়েটারে আহূত সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। যজ্ঞ প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল, মহাশয়ের রচিত কালের স্রোত নামক পুস্তকের উপক্রমণিকারূপে ঐ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। উহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া যজ্ঞ নাম দিয়া বাহির করিলাম।

বিশ বৎসর মধ্যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি, এই দীর্ঘকালে লেখকের মতের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; আমি বৎসরাবধি শারীরিক পীড়ায় নিতান্ত অবসন্ন; ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির যথোচিত পরিবর্ত্তন বা সংশোধন সাধ্য হয় নাই।

১লা বৈশাখ, ১৩২০ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সূচী

কর্ম্ম-কথা

মুক্তির পথ

মনুষ্যজাতির আদিম পিতা মাতা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া ধরাতলে পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু আনয়ন করেন, এইরূপ একটা কিংবদন্তী বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

এই কিংবদন্তীর ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে পাপের ও তজ্জাত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় পাপ নাই, তজ্জাত দুঃখও নাই, ইহা জগতের অন্যতম বিভীষিকাময় সত্য।

স্থলান্তরে আবার ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা তত্ত্ব-কথা প্রচলিত আছে। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন কোন কোন সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি, জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ সেইরূপ অন্য সমাজে প্রচলিত-ধর্ম্মতত্ত্বের মূল।

কোন্ কথাটা সত্য, এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। উভয়েরই মূলে কতকটা সত্য নিহিত আছে, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না।

তবে মানবজাতির অন্তর্গত দুই বৃহৎ সমাজকে এই দুই বাক্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব যোগেযাগে ধরাতল হইতে জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান সাধন করিতে পারিলেই বোধ করি দুঃখ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ তর্কশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট যুক্তির বলে

এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়ায়। তবে দুঃখ ‘এই যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল’ ভোজন করিয়া একবার তাহার রসাস্বাদন করিয়া ফেলিলে রসনাকে পুনরায় সেই রসের অন্বেষণে নিবৃত্ত করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সেরূপ চেষ্টায় কোন ফল পাওয়া যায় না। তথাপি যখন দুঃখ-নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং সেই পরম পুরুষার্থ সাধনের উপায়বিধানই মানবজাতির গুরুগণের ও শিক্ষকগণের জীবনের ব্রত, তখন সেই গুরুগণ ও শিক্ষকগণ মানবের দুঃখনিবৃত্তির জন্য কিরূপ উপায়বিধান করিয়াছেন, ইউরোপের দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাসে তাহা রক্তাক্ত অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরোপে সভ্যতার প্রাক্কালে গ্রীসদেশে যে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়াছিল, তাহা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পশ্চিম দেশকে আলোকিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার অভ্যুদয়ে রাষ্ট্রীয়শক্তি ও যাজকশক্তি একত্র সংহত হইয়া কিরূপে সেই জ্ঞানের বাতিকে নিবাইয়া দিয়া গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টীয় যাজক-শক্তি কাহাকেও কোন আলো জ্বালিতে দেন নাই। যে একমাত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মনুষ্য আপনার মহত্ত্ব অব্যাহত রাখিয়া আসিতেছে ও এতাবৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতির নিষ্ঠুর কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, সেই ভিত্তিভূমির মূল উৎপাটনের জন্য নির্লজ্জভাবে আপনার সমুদয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছে, ইউরোপে খ্রীষ্টীয় পন্থার ইহাই ইতিবৃত্ত।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়া, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিলেই সেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, এই বিশ্বাসে মনুষ্য বহুযুগ ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপে আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতেছেন, যে যদি দুঃখ হইতে মুক্তি চাও ত জ্ঞানমার্গ পরিহার করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের পন্থা অবলম্বন কর;

যদি পরম পুরুষার্থ-লাভে তোমার বাঞ্ছা থাকে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরোধ কর, আর জ্ঞানের অন্বেষণে দিনক্ষয় করিও না ; ব্যক্তিবিশেষে ও বাক্যবিশেষে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া জীবনের পথে চলিলেই পরম পুরুষার্থ লব্ধ হইবে।

বস্তুতই মানবের মত হতভাগ্য জীব দুনিয়ার মধ্যে দুর্লভ। মনুষ্য ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ; এবং সনাতন নিয়মমতে যে ক্ষুদ্র সে দুর্ভাগ্য, যে দুর্ব্বল সে দীন। তাহার অক্ষমতার কারণে সে পরের নিকট কৃপাভিক্ষার জন্য চিরকাল লালায়িত ও তাহার পরমুখপ্রেক্ষিতার ফলে চিরকাল প্রতারিত। মানবসন্তান প্রকৃতির হস্তে বিবিধ বিধানে উৎপীড়িত হইয়া দুঃখযন্ত্রণায় ত্রাহিস্বরে ডাকিয়া আসিতেছে এবং যে কোন ব্যক্তি আপন মূর্খতা ও নির্লজ্জতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই সনাতন দুঃখব্যাধির একমাত্র চিকিৎসক বলিয়া জাহির করিয়াছে, তাহারই প্ররোচনায় ভ্রান্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত কুপথ্য সেবন করিয়া প্রতারিত হইয়াছে।

"জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, সচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি ; কিন্তু সেই দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানের আলোক ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ নতশিরে বহন করিতে সুস্থ ও মোহমুক্ত মানব নিশ্চয়ই অসম্মত হইবে।

জ্ঞানের পথ পরিহার করিয়া দুঃখনাশের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির মধ্যে এই বাক্য স্বীকৃত হয় নাই। অপূর্ণ জ্ঞানে যাহার উৎপত্তি, জ্ঞানের পূর্ণবিকাশই তাহার ধ্বংসের একমাত্র উপায়, এই মত অন্ততঃ একটা বৃহৎ সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

তবে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর কি না, ইহা আলোচনাযোগ্য। যতদূর দেখা যায়, জ্ঞানের বিকাশের সহিত দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়। নানা ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কেহ কেহ পৃথিবীতে দুঃখের অস্তিত্ব একেবারে স্বীকার করিতেই চাহেন না; মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকারে ইঁহারা কুণ্ঠিত। কিন্তু মানবের অনুভূতির তীব্রতম ও মুখ্যতম বিষয়ই দুঃখ; ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইলে চলিবে না। ইহুদী জব হইতে বাঙ্গালী রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে ইহা মানিয়া লইয়াছেন। মনুষ্যকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া পদে পদে জীবনের প্রসারণবিরোধী সর্ব্বগ্রাসী জড়শক্তির ও সমাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ইহা নিত্য ঘটনা ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাই মনুষ্যের জীবন। সংগ্রামে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই জীবনরক্ষা অসাধ্য হয়। এমন কি সাবধানেও সবিক্রমে যুদ্ধ চালাইলেও জীবনরক্ষা শেষ পর্য্যন্ত সাধ্য হয় না, ইহাই ত জীবনের বিশিষ্টতা। ইহার দুঃখ নাম দিতে না চাও, সে স্বতন্ত্র কথা; তাহা ভাষাগত বিবাদের বিষয়; আমরা যাহাকে দুঃখ নাম দিতেছি, তাহার অভাব ইহাতে প্রতিপন্ন হয় না।

তবে সকলে এই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না এবং ইহার উৎপত্তির কারণ অন্যরূপে নির্দ্দেশ করেন।

জরথুস্ট্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মতানুসারে বিশ্বজগতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিধাতা প্রভুত্ব করিতেছেন; একের কার্য্য সুখবিধান, অপরের কার্য্য দুঃখবিধান। শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি সুখবিধাতারই জয় হয়; অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই সুখবিধাতার আশ্রয়গ্রহণ।

শেমিটিক জাতিরাও সম্ভবতঃ সেই মত গ্রহণ করিয়া দুই বিধাতার—খোদার ও শয়তানের—অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুখবিধাতার পরাক্রম দুঃখবিধাতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই অধিক, এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদয় দুঃখের বিলোপসাধনও করিতে পারিতেন। তবে তাঁহার আদেশের অবহেলাই এই হতভাগ্য মনুষ্য জাতির প্রতি তাঁহার নিদারুণ ক্রোধের হেতু হইয়াছে, এবং এই ক্রোধের ফলেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে দুঃখভোগে বাধ্য থাকিতে

হইবে, এই তাঁহার ব্যবস্থা ও আদেশ। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতার প্ররোচনায় মানবজাতির আদিম পিতা মাতা তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিল, তজ্জন্যই মানবজাতির উপর তাঁহার এই দুর্জ্জয় কোপ। আদিম পিতা মাতার পাপে ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরা কিরূপে নিগ্রহভাজন হইতে পারে, এবং পরমকারুণিকত্বের সহিত এই তীব্র প্রতিহিংসার প্রবৃত্তির কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহা খোদার একটা খেয়ালমাত্র, অথবা রহস্যময় জাগতিক বিধানাবলীর অন্তর্গত একটা রহস্যময় বিধানমাত্র। যাহাই হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতা যে তাঁহার সাধের জগতে বাদ ঘটাইয়া অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সর্ব্বশক্তিমানের অদূরদৃষ্টির ফল মনে করিতে হয়। তবে তিনি এই অনর্থের প্রতীকারে সমর্থ ও কোন সময়ে ইহার প্রতীকার করিয়া দিবেন, মনুষ্য এই ভরসায় আশ্বস্ত থাকিতে পারে। মানবজাতির আদি দম্পতীকে স্বাধীন ইচ্ছার সহিত অক্ষমতা প্রদান করিয়া সেই সুখবিধাতা কেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যাবৃত্তি পরিতৃপ্তির সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহাও চিন্তার বিষয়।

বস্তুতই বিধাতায় করুণাময়ত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই জন্য এই দুঃখের নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া দুঃখের অস্তিত্ব ঢাকিয়া ফেলিবার অথবা উড়াইয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে।

আর একরূপ ব্যাখ্যা আছে। দুঃখের পরিণতি পরম সুখ, দুঃখের অভাব ঘটিলে সুখানুভূতির ব্যাঘাত ঘটিত, সেই জন্য শেষপর্য্যন্ত সুখের মাত্রা বাড়াই-বার জন্যই এই দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। চরমে পরমসুখদানই দুঃখসৃষ্টির উদ্দেশ্য।

আজকাল যাঁহারা অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসেন, তাঁহারাও ঐরূপ একটা কথা বলিয়া মানব-

জাতিকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন। অভিব্যক্তির আর একটা নাম ক্রমোন্নতি। অভিব্যক্তির ফলে সুখের উন্নতি ও দুঃখের হ্রাস। কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় মহাদুঃখজনক ব্যাপার যখন প্রত্যেক মনুষ্যের ও সমস্ত মানবকুলের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে উপস্থিত রহিয়াছে ও সেই মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধই জীবের জীবন, এবং সেই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টাতেই জীবের ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি, অথচ সেই মৃত্যুর হাত এড়াইবার কোন উপায় এপর্য্যন্ত কোন জীব আবিষ্কার করিতে পারিল না; অভিব্যক্তির যখন এই পরিণাম, তখন ঐরূপে দুঃখের অপলাপ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

ফলে দুঃখের সহিত সুখ আইসে, অবিমিশ্র দুঃখ জগতে নাই, এ কথাটা যেমন সত্য, সুখের সহিত দুঃখ আইসে, অবিমিশ্র সুখ জগতে নাই, এ কথাটাও তেমনি সত্য। ইহাতে সন্দেহ করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

জ্ঞানের বৃদ্ধি দুঃখনাশের প্রয়াসমাত্র, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলা যায়; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখের হ্রাস ঘটিয়া সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, একথা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে, ইহার যাথার্থ্য-সম্বন্ধে চারিদিক্ হইতে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। হয় ত মানবজাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সমাজ এই কারণেই জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অতি নিরুপায় হইয়া বিশ্বাসের মার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছে। তুমি বলিতেছ যে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে দুঃখের হ্রাস হইবে, কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে জ্ঞানের সহিত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত উহার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নাশ হইবে, ইহা কিরূপে জানিতে পারি?

এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এইরূপে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, তাহা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান। ঐ জ্ঞান না থাকিলে জগৎ থাকিত না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। সেই তথা-কথিত জ্ঞানের অভাবে জগতের অভাব যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে সেই জগতের সহিত সেই জ্ঞানের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দাঁড়ায়; একে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান হইতেই এই সুখদুঃখময় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। সুখদুঃখ উভয়ই এই জ্ঞাননামধারী ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন। উভয়ই একরকম বিকারের ফল; একই বিক্রিয়ার এপিঠ আর ওপিঠ। এ পিঠ হইতে দেখিলে যাহা সুখ, ও পিঠ হইতে দেখিলে তাহা দুঃখ। যদি কেবল বিশুদ্ধ সুখ চাও, তাহা হইলে তাহা তুমি কোথাও পাইবে না; যদি বিশুদ্ধ দুঃখ চাও, তাহাও কোথাও মিলিবে না। একখানা কটাহের এক পৃষ্ঠ যেমন কুব্জ ও অপর পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, এই কুব্জত্ব লোপ করিতে গেলে ন্যুব্জত্ব যায়, আর ন্যুব্জত্ব দূর করিতে গেলে কুব্জত্ব অন্তর্হিত হয়, আর একের লোপের সহিত উভয়েরই লোপ হইলে কটাহের আর কটাহত্ব থাকে না, সেইরূপ এই জগতের দুঃখভাগ লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতেই লোপ পাইয়া যায়; সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখদুঃখ লোপ করিতে গেলে সুখদুঃখময় জগতেরও আর অস্তিত্ব থাকে না। যে জগতে সুখও নাই, দুঃখও নাই, এবং সুখদুঃখ ভোগের জন্য চেতন কেহ নাই, সেই অচেতন জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। জ্ঞান নামে পরিচিত ভ্রান্তি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সেই ভ্রান্তি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ সুখদুঃখ পরিহারের চেষ্টা বৃথা।

জ্ঞানের নামে পরিচিত এই ভ্রান্তির বিলোপ সাধন অসাধ্য না হইতে পারে। তবে তাহা বিলুপ্ত হইলে যেমন দুঃখ থাকিবে না সত্য, সেইরূপ সুখও থাকিবে না; তখন এই প্রত্যক্ষগোচর বিচিত্র সুখদুঃখের আশ্রয় যে জগৎ, তাহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া তাহার স্থানে সুখ-প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত মূঢ়তা। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি ; উহা ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, উহা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান যদি কল্পনীয় হয়, তবেই পরম পুরুষার্থ সাধিত হইবে।

ভারতবর্ষে এককালে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এই মুক্তি-বাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জনসঙ্ঘের অস্থিমজ্জায় এই মত গূঢ়ভাবে নিহিত থাকিয়া তাহাকে জীবনের পথে প্রেরিত করিতেছে। অন্য দেশে অন্য সমাজে এই মতের ক্ষীণ ধ্বনি যে শুনিতে পাওয়া যায় নাই, এরূপ বলিতে চাহি না। কিন্তু অন্যত্র ইহা মানবের জীবনের গতির নিয়ামক হইয়াছে বা মানবের গন্তব্য-নির্দ্দেশে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছে, ইহা ইতিহাসে লেখে না। এই মত বিচারসহ কি না, এই পথ সুপথ কি না, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

বৈরাগ্য

দারাসুত পরিবার, কে বা কার কে তোমার, কেহ সঙ্গে আসে নাই, কেহ সঙ্গে যাবেও না; কেবল চক্রান্ত করিয়া তাহারা তোমাকে সংসার-কারাগারে মোহের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; যদি বুদ্ধি থাকে ও কল্যাণ চাও, সত্বর শিকল কাটিয়া আপনার পথ দেখ।

চিরদুঃখী মানবজাতির হিতৈষী বন্ধুগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া আত্মীয়-স্বজনকে উন্মার্গগমনে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই উপ-দেশের ফলে বহু মানব আপন দারাসুতপরিবারকে বিধাতার করুণায় সমর্পণ করিয়া নিজ ইষ্টলাভের ও শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় বহুদিন হইতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

আর সমাজস্থ অবশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে যাহারা বুদ্ধির অভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় সেই মায়াবন্ধন কাটিতে অসমর্থ হইয়াও উক্ত উপদেশের ভাব-গ্রহণে অধিকার ও তাৎপর্য্যগ্রহণে শক্তি রাখে, তাহারা ঐ স্বাধীন মুক্ত পুরুষদের অবস্থার সহিত আপনাদের যাতনাময় বদ্ধদশার তুলনা করিয়া জীবনটা মিছা গেল বলিয়া হা হুতাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

এরূপ উপদেশও আছে যে আজিকার দিনটা মনের আনন্দে চরিয়া খাও, কালিকার দিনের রুটির ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিবেন। নহিলে বিধাতার করুণাময়তায় সন্দেহ প্রকাশ হইবে।

দারাসুতপরিবারকে দারত্ব, সুতত্ব ও পরিবারত্ব প্রদান করিবার সময় বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা হয় কি না জানি না; কিন্তু সংসারের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুই একটা লাঠির ঘা পাইবামাত্র ভাগ্যহীন দারাসুতকে অন্যের করুণায় ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে

জীবসাধারণ প্রবৃত্তিগুলি তাহার পূর্ব্বগত পুরুষপরম্পরা হইতে আগত হইয়া তাহার অস্থিমজ্জায় নিহিত ও শোণিতে প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে সামাজিক বন্ধন হইতে প্রতিক্ষণে ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে; অপর দিকে প্রবল সমাজশক্তি তাহার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে একই কেন্দ্রে আকৃষ্ট রাখিয়া একই মুখে ঘুরাইবার প্রয়াস পাইতেছে। পুরুষপরম্পরাগত প্রাকৃতিক শক্তি তাহাকে প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়; সামাজিক শক্তি তাহাকে নিবৃত্তির পথে চলিতে উপদেশ দেয়। মানুষের জীবন এইরূপে একটা ঘোর বিরোধে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে এমন দিন এককালে ছিল, যখন তাহার জীবত্ব বা পাশবিকতা তাহার সামাজিকতাকে অভিভূত রাখিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্যসমাজ বলিতে যাহা বুঝি, তখনও তাহা রীতিমত গঠিত হয় নাই। সে সময়ে মনুষ্য একরূপ স্বচ্ছন্দবিহারী স্বাধীন জীবরূপে আহার ও বিহার করিত। ধর্ম্মাধর্ম্মসম্পৃক্ত পাপপুণ্যঘটিত সূক্ষ্মতত্ত্বের তখন উদ্ভাবনা হয় নাই। যেন তেন আত্মরক্ষা ও শরীরপোষণ ব্যাপারটা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের কার্য্য একরূপ নিষ্পন্ন হইয়া যাইত; এবং প্রাকৃত নিয়মে আপনার বংশরক্ষার উপায় বিধান করিলেই সে জীবনের কর্ত্তব্যদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইত। সমাজ নামক জটিল কৃত্রিম যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার জন্য সেই দুইটি কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অব্যাহতি পাওয়া মনুষ্যের পক্ষে বড়ই দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ দুইটার উপর আরও পঞ্চাশটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া মানুষের হাত পা বাঁধিয়া দিয়াছে ও তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নিয়মিত করিয়া দিয়াছে। এখন আর কেবল প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া প্রাকৃত নিয়মগুলি পালন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে গেলে চলে না; সমস্ত সমাজ সমবেত হইয়া জোর করিয়া লাঠি তুলিয়া তাহাকে কতকগুলি কৃত্রিম বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ রাখিতে চায়। তাহার এমন শক্তি বা সাহস

নাই যে, সেই সমবেত বলের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যদি কেহ এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিতে যায়, তাহার উপর সমস্ত সমাজ এমন ঘোর নির্য্যাতন উপস্থিত করে যে, তাহার জীবনরক্ষাই দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। সুবুদ্ধির মত সমাজের মন যোগাইয়া আপনার স্বভাবলব্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিলে সুশীল বলিয়া নাম পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মানুষের মজ্জাগত চিরন্তন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্নায়ুতন্ত্রকে এরূপে উত্তেজিত ও তাহার মাংসপেশীগুলিকে এরূপে পরিচালিত করে, যে সমাজমধ্যে সুশীলতার জন্য পুরস্কার লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজশক্তি কত রকম উপায়ে, কখন রাজতন্ত্র, কখন লোকতন্ত্র, কখন ধর্ম্মতন্ত্র, আখ্যা ধারণ করিয়া, ভ্রূকুটী দেখাইয়া ও দণ্ড উদ্যত করিয়া, প্রত্যেক মনুষ্যকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু, হায়, কয়টা মনুষ্য এই শাসনের সম্পূর্ণ অধীন হইতে পারিয়াছে! কয়জন মনুষ্য প্রকৃতই ভাল ছেলে হইয়া সমাজ-জননীর অঙ্ক সুশীতল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে!

মনুষ্যের যখন এইরূপ সাধারণ অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি বস্তুতই তাহার দুর্দ্দম নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া সম্পূর্ণ নিরীহভাবে সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দেয়, তাহার ক্ষমতার বাস্তবিকই পরিসীমা নাই। মনুষ্যসমাজ যে তাহার মহত্ত্ব দুন্দুভিনাদে ঘোষিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাস্তবিকই স্নায়ুযন্ত্রের ও পেশীযন্ত্রের প্রবৃত্তিপ্রেরিত স্বাভাবিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে একটা অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি যাহার আছে, তাহাকে পূজা করিতে পাইলে মনুষ্য ধন্য হয়।

বৈরাগ্যের পক্ষে দাঁড়াইলে যুক্তিতর্কের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অর্থে সংসারে আসক্তির অভাব। বস্তুতঃ সংসারে এমন কি আছে যে তৎপ্রতি

অনুরক্ত হইয়া আমাকে থাকিতে হইবে? সংসারে প্রলোভনের সামগ্রী এমন কি আছে যে আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত সেই মধু আহরণের জন্য ঘুরিয়া মরিব? হৃদয়ে হাত দিয়া কি বলা যায় যে, যাহাকে মধু বলিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে হলাহলমাত্র নহে? যাহাকে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ সরোবর মনে করিতেছি, তাহ মরীচিকামাত্র নহে? যাহার বর্ণের উজ্জ্বলতায় রূপমুগ্ধ পতঙ্গ ভুলিতেছে তাহা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখামাত্র নহে? এই ত সংসারের অবস্থা। উহা মৃগ ধরিবার ফাঁদ, উহা ব্যাধনির্ম্মিত বাগুড়া; যে ব্যক্তি বুদ্ধিবলেই হউক বা অভিজ্ঞতাবলেই হউক, উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছে, তাহাকে প্রলোভনের চেষ্টা বৃথা। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞানতঃ জালবদ্ধ হইতে কে চায়?

আর সরলভাবে কি বলা যায় যে সংসারে পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয় বলিয়া একটা যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা একটা প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনা নহে? এ কথা কি প্রকৃত নহে যে, যে নিষ্ঠুর পাষণ্ড আপনার প্রতিবেশীর অস্থিপঞ্জর পদতলে দলিত করিয়া দ্বিধাহীন ও দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া চলিয়া যায়, অনেক সময়ে তোমরা তাহারই জয়ডঙ্কা বাজাও? ইহা কি সত্য নহে যে, যে শান্ত নিরীহ দুর্ব্বল ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে সংসারক্ষেত্রে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোথায় কে ব্যথা পাইবে, কোথায় কে ব্যথা দিবে, এই আশঙ্কায় যাহার জীবনের বলটুকু প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইয়া যায়, তোমরা তাহার দুর্ব্বলতাকে মার্জ্জনা কর না, তাহার জীবনকে যাতনাসঙ্কুল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি তোমাদের হস্তনির্ম্মিত পরকলা দিয়া সমাজের চোখে বিকৃত ও প্রসারিত করিয়া দেখাও এবং সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে যদি তাহার দৈবাৎ পদস্খলনের সম্ভাবনা হয়, তখন তোমরা পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিয়া তাহাকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া করতালি দিয়া থাক? তোমাদের উপকারের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

যখন আমি তোমাদেরই অনুগ্রহের ভিখারী হই, তখন তোমরা আমাকে চিনিতে পার কি? বরং আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহদ্বার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দাও না কি? সম্পদের বন্ধু বিপদে শত্রুতাচরণে ত্রুটি করে কি? তোমাদের আচরণ দেখিয়া টাইমনের মত মানবদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করে না? সমাজের যখন এইরূপ ব্যবস্থা, তখন যদি কেহ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, যদি কেহ মানবদ্রোহী বা স্বজাতিদ্রোহী না হইয়া, সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া থাকে, যেমন দান করিতে পারে না, তেমনি প্রতিদানও চাহে না, তাহাকে সমাজ কি একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতর হইবে?

বস্তুতই টাইমনের জীবন কবির কল্পনামাত্র নহে। পরার্থপরায়ণ সাধুব্যক্তির প্রতিও এরূপ অত্যাচার ঘটে, যাহাতে সে গৃহবদ্ধ কুপিত মার্জ্জারের ন্যায় মনুষ্যসমাজরূপ আততায়ীকে নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বস্তুতই আমি দেখিতে পাইতেছি ও শিখিয়াছি, তোমরা সংসাররূপ নাট্যশালায় যে কয়খানি মোহন দৃশ্যপট ধরিয়া রাখিয়াছ, উহার সৌন্দর্য্য কৃত্রিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে; কিন্তু ক্ষণকাল পরে প্রদীপটি ও পরকলাখানি সরিয়া গেলেই সমুদয় নাট্যশালা দুঃখের তমোজালে আচ্ছন্ন হইবে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সুতরাং ঐ নাট্যশালায় মনুষ্যকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য যে প্রতারণার অবতারণা হইতেছে, তাহাতে আমি আকৃষ্ট হইতে চাহি না। ইহাতে আমার দোষ কি? ইহা হইতে দূরে থাকাই আমার কর্ত্তব্য এবং আমি ইচ্ছা করিয়া প্রতারিত হইতে না পারি, তাহাতে আমাকে দোষ দিও না।

সংসারে সুখ কোথায়? যদি কোথাও কিয়ৎপরিমাণে থাকে, তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? জনকজননী, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় এবং স্বজন স্নেহবাৎসল্য, ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রণয়ের কুহকে আচ্ছন্ন রাখিয়া কিছু দিনের জন্য অমৃতধারায় ডুবাইয়া রাখে সত্য, কিন্তু যাহাদের মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমি সংসারকে

নন্দনকানন ভাবিয়া তুই দিন উল্লাসে স্ফীত হই, তুই দিন পরে যখন সেই স্নেহের পুতুলগুলি একে একে ফাঁকি দিয়া অন্তর্হিত হয়, আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহার জন্য চিন্তামাত্র করে না. তখন আমার উল্লাস কোথায় থাকে? তাহাদের অন্তর্দ্ধানজনিত শোকে যখন আমি অভিভূত হই, যখন সমস্ত জগৎকে নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইতে দেখিবার বাঞ্ছা হয়, তখন তুমি কোথায় থাক? তখন তুমি নিষ্ঠুর সান্ত্বনা-বাণী লইয়া গম্ভীরভাবে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আমাকে সুস্থ করিতে আইস; কিন্তু তখন কি সে উপদেশ আমার কাণে যায়? তখন কি জগৎকে একটা মাংসশোণিতহীন কঙ্কালময় পিশাচের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয় না? মনুষ্যমাত্রেরই অভিজ্ঞতার যখন এই শেষ ফল, তখন কেন আমি সাধ করিয়া আপন পায়ে শিকল পরিতে যাইব? আমি পরিণামে অন্তর্দাহকর তুঃখজ্বালা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি, এবং সেইজন্য আমি সমাজের সুখের ভাগী হইতেও চাহি না। এইরূপ সমাজে বাস করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের অভাব জন্মিলে সমাজই তাহার জন্য দায়ী।

সামাজিক গৃহস্থ ব্যক্তি বিরক্ত পুরুষকে সম্বোধন করিয়া একটা কথা বলিতে পারে। সমাজের নানাবিধ অত্যাচার আছে সত্য; কিন্তু মোটের উপর সমাজ মনুষ্যের কল্যাণের জন্যই স্থাপিত। সামাজিক মনুষ্য তুর্ভাগ্য জীব হইতে পারে, কিন্তু সমাজহীন মনুষ্যের তুর্ভাগ্যের তুলনা নাই। সমাজমধ্যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও সমাজের অনুগ্রহেই পালিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছ; সুতরাং সমাজ যদি কিছু অত্যাচার করে, তাহা তুমি সহ্য করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্র যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও জন্মদাতা ও বাল্যে পালনকর্ত্তা পিতার অত্যাচার সহিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তুমিও সেইরূপ তোমার নিরাশ্রয় অবস্থার আশ্রয়, তোমার মনুষ্যত্বের রক্ষক সেই সমাজের নিকট সর্ব্বদা অবনতমস্তকে থাকিতে বাধ্য। সমাজের হস্তে যে ভীতিজনক দণ্ড উদ্যত দেখিয়া ভয় পাইতেছ, তাহা স্নেহময় পিতা

অথবা হিতৈষী শিক্ষকের করধৃত শাসনদণ্ডের তুল্য। হইতে পারে তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সুবুদ্ধি দ্বারা চালিত ও প্রযুক্ত হয় না; অথবা মানবীয় অপূর্ণতা যেমন সর্ব্বত্র, তেমনি এস্থলেও বিদ্যমান। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শাসনদণ্ডের অবাধ্য হইবার, অথবা তাহা হইতে দূরে থাকিবার তোমার কোন অধিকার নাই। জননী প্রকৃতির যেমন এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অভয়, সমাজেরও সেইরূপ ভীম ও কান্ত উভয় মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; তোমার চক্ষু অন্ধ বা বিকৃত, তাই তুমি একটা মূর্ত্তি দেখিতেছ, অন্য মূর্ত্তি দেখিতেছ না। তুমি সমাজের নুণ খাইয়াছ, এখন নিমকহারামি করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিও না।

বিরক্ত সমাজত্যাগী এইরূপে ইহার উত্তর দিতে পারেন। হইতে পারে, আমি যখন আমার জীবনের অথবা আমার কর্ম্মের প্রভু ছিলাম না, এমন অবস্থায় মনুষ্যসমাজ আমাকে কোলে লইয়া রক্ষা করিয়াছে ও আমাকে লালন পালন করিয়া মনুষ্যপদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, আমি কখনও সমাজের নিকট এরূপ অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে যাই নাই। আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া সমাজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমাজের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করিতেছি এবং সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, ভবিষ্যতে আর যেন আমাকে তিনি এরূপ অযাচিত অনুগ্রহঋণে আবদ্ধ না করেন। আমি যে কারণেই হউক জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু জীবনে আমি সুখের প্রয়াসী নহি, কেবল শান্তির প্রয়াসী। সমাজ আমার শান্তিটুকু অপহরণ করিয়া আমার দুর্ব্বল স্কন্ধের উপর যেন আর অনুগ্রহের বোঝা আরোপণ না করেন। জননী প্রকৃতির অনুগ্রহে যখন আমার নাবালক ভাব সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, এবং নিজকৃত কার্য্যের শুভাশুভ ফলের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী হইয়াছি, তখন আমাকে এই স্বাতন্ত্র্যটুকু প্রদান

না করিলে বড়ই অবিচার করা হয়। তাই বা কতটুকু! আমি তোমার অনুগ্রহের বোঝাটুকু ঘাড়ে লইতে অসম্মত, এই পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্য চাহিতেছি। তোমাদের মধ্যে সকলকেই সুখের জন্য লালায়িত দেখিতেছি ও নিজ নিজ সুখের জন্য তোমরা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে তোমরা সমাজভুক্ত মনুষ্য সকলেই স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত। আমিও তোমাদের মত জীবধর্ম্মা, সুতরাং সুখাভিলাষী, তবে তোমাদের মত কাটাকাটিতে যোগ দিতে আমি চাহি না। আমার সুখের অর্থ কেবল শান্তি। আমার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব কি না সন্দেহ, কিন্তু তেমনি তোমাদের নিকটও আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই। পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান বায়ু এবং বন্যবৃক্ষের গলিত পত্র ও পতিত ফলই আমার খাদ্যপক্ষে যথেষ্ট, এবং লোকালয়ের বহির্ভাগে দূর অরণ্যমধ্যে প্রশস্ত তৃণভূমি—তাহাই আমার শয্যা ও নিবাসস্থল। আমার অস্তিত্ব তোমাদের কাহারও জীবনপথ কণ্টকিত করিবে না, বা আমার জীবনরক্ষার জন্য তোমাদের সমাজকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। ইহাতেও যদি আমি তোমাদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ শান্তিলাভের অধিকার পাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার উপায় কি? ইহাতেও যদি আমার নিন্দা কর, উপায় নাই। আমি যশের প্রার্থী নহি, নিন্দাতেও আমার কেশাগ্র বিচলিত হইবে না।

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। এরূপ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির নিন্দাবাদ বাস্তবিকই নিষ্ঠুরতা হইয়া দাঁড়ায়। বোধ করি এইরূপ উত্তর দিতে না পারিয়াই মানবজাতি বিরাগীকে নিন্দা করিতে চাহে না। যে ব্যক্তি সংসারের সমরক্ষেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রণে ভঙ্গ দেয়, এবং আপনার তাপক্লিষ্ট জর্জ্জরিত আত্মা লইয়া দূরে লুক্কায়িত রহে, তাহার প্রতি নিন্দাবাদ কাপুরুষের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

তবে কি জীবনসংগ্রামে পলায়ন পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না? যে ব্যক্তি

সম্মুখ সমর পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণরক্ষার্থ লুক্কায়িত হইয়াছে, আমরা তাহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইব ?

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজধর্ম্ম স্বার্থমূলক। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নহে, মনুষ্যসমাজের স্বার্থে ইহার প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থে আমরা ইংরাজি রিলিজন্ বুঝিব না। ধর্ম্ম অর্থে যাহা সমাজকে ধরিয়া রাখে, যাহার উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বলে সমাজের স্থিতি ও গতি, তাহাই বুঝিতেছি। এক কথায় সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা সমাজের স্বার্থের বিরোধী ও প্রতিকূল, যাহাতে সমাজের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকেই মোটের উপর এখানে অধর্ম্ম বলিতেছি। অতএব এই অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বার্থমূলক।

বিরক্ত পুরুষ নিরীহ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি; তাঁহা হইতে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অচেতন লোষ্ট্রখণ্ডের মত নির্দ্দোষ পদার্থ কিছুই নাই, এবং লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় নিষ্পাপ পদার্থের অস্তিত্বও বিরল। সংসারত্যাগী বিরাগী কতকটা সেইরূপ। বরং লোষ্ট্রখণ্ড হইতে মনুষ্য কিছু না কিছু উপকারের প্রত্যাশা রাখে, কিন্তু যে ব্যক্তি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে কখন কোন লোকহিতের প্রত্যাশা আছে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের স্বার্থ তাঁহা কর্ত্তৃক একপাদ-প্রমাণও অগ্রসর হয় না।

সমাজের ভিতর বাস করিয়া তাহার নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজ সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য নহে। এখানে স্বার্থের সহিত স্বার্থের বিরোধ। তোমার আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধ। তুমি শান্তিলাভের আশায় স্বার্থের জন্য যেমন সমাজ হইতে দূরে পলাইতেছ, সমাজও সেইরূপ আপন স্বার্থসাধনের জন্য তোমাকে আপনার নিকট টানিতে চাহিতেছে।

যদি তুমি ধরা না দাও, তাহাতে তাহার স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তোমাকে প্রশংসা না করিবার যথেষ্ট কারণ তাহার পক্ষে বর্ত্তমান আছে।

জননী প্রকৃতির কোটি সন্তানের মধ্যে দুই একটী বিগড়াইয়া গেলে বা বিদ্রোহাচরণ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য তেমন নহে। সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুটার কাছে সাগরবেলায় স্তূপীকৃত কোটি কোটি বালুকণার অন্তর্গত একটি কণা নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নগণ্য নহে; কারণ সেই কোটি কণিকার মধ্যে একটির গণনায় ভুল হইলে বিশ্বরাজ্যের হিসাবনিকাশের সময় গোল বাধিয়া যায়। বৃহৎ সূর্য্য এবং ক্ষুদ্র বালুকণা উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অভাব হইলে বিশ্বযন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল হইতে নগণ্য বালুকণা উভয়েরই জগৎ-যন্ত্রের স্থিতি ও গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সমানভাবে প্রয়োজন। আমাদের সহিত প্রকৃতির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভেদ বর্ত্তমান। প্রকৃতির নিকট কোটি টাকারও যে মূল্য, কড়াক্রান্তিরও ঠিক সেই মূল্য। হিসাবে একটা কপর্দ্দকের ভুল হইবার যো নাই।

সুতরাং আমার কোটিসংখ্যক ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমি স্বাধীন হইয়া বিচরণের দাবি করিতে পারি না। কোটি ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আমার বন্ধনও কোটি গুণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কর্ত্তব্যপালনের জবাবদিহি আমার, অপরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে কারণেই হউক, তুমি মানবসমাজ হইতে দূরে রহিতে চাহিতেছ, কিন্তু মানবসমাজ তোমাকে চাহে। তুমি আর পাঁচজনকে দেখাইয়া দিয়া নিজে এড়াইতে চাহিলে চলিবে না। তুমি ছাড়িতে চাহ, কিন্তু মানবজাতি তোমাকে ছাড়িবে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি মানবত্ব লইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতে মানবজাতি তোমার উপর একটা স্বত্বাধিকার

লাভ করিয়াছে। হইতে পারে সেটা গায়ের জোর মাত্র; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূমণ্ডলে সমুদয় স্বত্ব ও সমুদয় অধিকার গায়ের জোর হইতেই সমুৎপন্ন।

ভূপৃষ্ঠে ফল, জল, সোণারূপা, যেখানে যাহা পাওয়া যায় এবং যাহা তোমার দরকারে লাগে তাহা আত্মসাৎ করিব, মানুষ এইরূপে সকল দ্রব্যের উপর স্বত্ব স্থাপন করিয়া লইয়াছে। ইহা মানুষের গরজ। তাহার স্বার্থপর প্রবৃত্তি হইতে সে আপনাকে ঐরূপ অধিকারী ঠাওরাইয়াছে। মানুষ নিজের গরজে এই পার্থিব যাবতীয় পদার্থে আপনার চিরন্তন স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। ঠিক সেইরূপ গরজে মনুষ্যসমাজও তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে তাহার অধিকার স্থাপিত করিতে চায়। তুমি তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিতে পার—তোমার শান্তির জন্য তোমার নিজের স্বার্থের জন্য। মনুষ্যসমাজ সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়—তাহার নিজের স্বার্থের জন্য। তুমি যদি মনুষ্যজাতিকে ফাঁকি দিতে চাও, সেও তোমাকে নিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। নিউটনের প্রতিভা ও নিউটনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রতিভার ও সেই ক্ষমতার অপব্যয় ও অপচয় করিলে অথবা সেই প্রতিভাকে ও ক্ষমতাকে মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত না করিলে উৎকট পাপাচরণ হয়, মনুষ্যজাতি নিজের গরজে নিউটনকে এই কথাই বলিবে। তবে সকলে কিছু নিউটনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তথাপি তোমার যে একটু ক্ষমতা আছে, সেইটুকু তোমাকে মনুষ্যজাতির কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এক হিসাবে জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডলের এবং সামান্য বালুকাকণার মধ্যে ব্যবধান বর্ত্তমান থাকিলেও আর এক হিসাবে উভয়েই তুল্যমূল্য। সেইরূপ তুমি নিউটনের প্রতিভার কণিকামাত্র না পাইলেও মনুষ্যজাতির নিকট তোমার নিউটনের সহিত সমান দর। 'জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ, ক্ষুদ্রজন্তবঃ,' বাক্যটা এক অর্থে ঠিক্ বটে, কিন্তু মদ্বিধ

ক্ষুদ্র জন্তরও জীবনের মূল্যের পরিমাণ অন্য এক অর্থে নিউটনের প্রকাণ্ড জীবনের সমতুল্য।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার আমার ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য সন্দেহ নাই, এবং আমার জীবনকাহিনী ভবিষ্যতের ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তথাপি আমার একটা সঙ্কীর্ণপরিধিবিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহা মনুষ্যমাত্রের সাধারণ দায়িত্ব। আপনাকে কেন্দ্রবর্ত্তী রাখিয়া ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় চতুর্দ্দিকে প্রসারণ করিয়া সেই পরিধিরেখা আমাকে নিজ চেষ্টায় টানিয়া লইতে হইবে। মানবজাতি বলিতেছে, ইহাই তোমার ধর্ম্ম, নতুবা মানব-সমাজ ধৃত রহিবে না।

পল্লীবাসী কৃষক খায়, খেলায়, আপনার ক্ষেতটুকু চাষ করিয়া ফসল তোলে ও কিছুকাল আপন পুত্রকলত্রের ভার বহিয়া মরিয়া যায়। তাহার জীবনের ইতিবৃত্ত কেবল খানিকটা খাওয়া দাওয়া, খানিকটা হাসিকান্না ও খানিকটা বিবাদ বিসংবাদ মাত্রেই পর্য্যবসিত। তাহার মৃত্যুর দুই চারিদিন পরে তাহার নাম কাহারও স্মরণে থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনকে নিষ্ফল মনে করা চলিবে না। সে যে কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, সে যথাশক্তি তাহার সাধনাতে নিরত আছে। জড়রাজ্যে যেমন প্রত্যেক পরমাণুর স্থান আছে, এবং কোনটিই অযথাস্থানে সন্নিবেশিত নাই, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে তাহারও আসন নিরূপিত রহিয়াছে, সেই আসন হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবন মনুষ্যের জাতীয় জীবনের অন্তর্গত; সেই ক্ষুদ্র জীবনটুকু গণনায় না ধরিলে জাতীয় জীবনের ঠিকে ভুল হয়।

সত্য বটে সংসারে থাকিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অপরের সহিত বিবাদ করিতে হয়, চিরকাল প্রহার সহা চলে না, দুই একটা প্রহার দিতেও হয়। প্রহার দেওয়া স্থূলতঃ নিন্দনীয় কাজ। স্থূলতঃ নিন্দনীয়

হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র নিন্দনীয় নহে। এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে, এই উক্তি অতি উন্নত ধর্ম্মবৃত্তির পরিচায়ক; কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বত্র এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যসমাজের হিতের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সর্ব্বত্র ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনের নাম বিরোধ এবং সেই বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়ায় অধর্ম্ম নাই। এই বিরোধে মনুষ্য প্রকৃতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলেও উহা এড়াইতে পারিবে না। জীবন রক্ষার জন্য এককণিকা তণ্ডুল উদরসাৎ করিতে গেলে আর একজন ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিকে ঐ তণ্ডুলকণা হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। কেন না প্রকৃতির বিধানে তণ্ডুলকণার সংখ্যা পরিমিত। যত মানুষ বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সকলকে বাঁচাইবার মত তণ্ডুলকণা বিদ্যমান নাই। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন বিরোধ মাত্র। ঘা দিতে হইবে বলিয়া ঘা সহিতে কাতর হইলে চলিবে না; পদস্খলন হইবে বলিয়া পা ফেলিতে দ্বিধা বোধ করিলে চলিবে না। নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জীবনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের প্রতি প্রকৃতির আদেশবাণী।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন স্বজনপরিচালিত কৌরব অক্ষৌহিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার শরীরে বেপথু এবং রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, আমি বিজয়াভিলাষ করি না, রাজ্যভোগ ও সুখভোগ আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ মহতী বাণী মনুষ্যবদন হইতে সর্ব্বদা বহির্গত হয় না। তথাপি অর্জ্জুনের এই বৈরাগ্য ভগবানের অনুমোদিত হয় নাই। "দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, জননীসমা নদী ও নির্ঝরবান্ পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন; সূর্য্য ও উষাদেবী আমাদের অপরাধ লইবেন না"—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা

জীবনে আসক্ত হইয়া এইরূপে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। "যাহাতে ভূতগণের পীড়া না হয়, একান্তপক্ষে অল্পমাত্র পীড়া জন্মে, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে। অগর্হিত কর্ম্মের দ্বারা, শরীরকে ক্লেশ না দিয়া, ধনসঞ্চয় করিবে। যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব জন্তু বাস করে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সমুদয় আশ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ, অতিথিগণ, সকলেই গৃহস্থের প্রত্যাশী ; গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নাই—এইরূপ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। 'কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, ফল-কামনায় তোমার রতি না থাকে, ফলকামনা তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় ; কর্ম্ম-পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না জন্মে"—এইরূপ আমাদের ভগবদুক্তি।

জীবন যাতনাসঙ্কুল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। আসক্তি ত্যাগ কর অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মাচরণ কর; ফলকামনা করিও না; কর্ম্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সে কালের অনাসক্তি, সে কালের বৈরাগ্য ; সে কালের কর্ম্মসন্ন্যাস। সে কালের, যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত ; জগতে যাহা কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত্ব দ্বারা আবৃত, এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধ জ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি ; ভক্তি ও তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল।

কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি শান্তি লাভ করিতে পার ; তোমার স্বার্থসাধন ঘটিতে পারে ; কিন্তু মানবজাতি তোমাকে ক্ষমা করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করিয়া তুমি আপনাকে লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিতে পার ; কিন্তু মনুষ্যসমাজ তোমাকে স্তুতি করিতে বাধ্য হইবে না।

একটা কথার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। দুঃখবিমুক্তিই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ ; এবং সহস্র যুক্তি সত্ত্বেও মনুষ্য সেই দুঃখবিমুক্তির

আশায় লালায়িত থাকিবে। সমাজধর্ম্ম যদি সকল দুঃখের নিদান হয়, তবে মনুষ্য কিসের আশায় সেই মোহপাশে আবদ্ধ থাকিবে ?

মুক্তিকামনা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু মুক্তির পথ তত সরল নহে। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবনহীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তি লাভ না ঘটিতে পারে এমন নহে; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। সংসারের শোণিতকর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব; এবং এই জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যসাধনই তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে; তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, সেই দুঃখের স্বীকারই জীবের উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে; দুঃখভোগশক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়া লইবে; এবং আপনার প্রতি, পুত্রকলত্রের প্রতি, স্বজনবান্ধবের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, বিশ্বের প্রতি, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই এমন এক পরম প্রীতি, এমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দ, অনুভব করিবে, যে জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসগ্রন্থে এই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে কবিকুলগুরু এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহামহিম আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন। সে পথ আমরা অনুসরণ না করি, সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

জীবন ও ধর্ম্ম

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ-নির্ণয় ও সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন; এবং যদ্দ্বারা সেই সম্বন্ধ-স্থাপন ও সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। তুমিই আমার একমাত্র মিত্র, আর তুমিই আমার একমাত্র শত্রু; উভয় সম্পর্কে সনাতন বিরোধ, আর উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক; সামঞ্জস্যের পূর্ণতা কখন ঘটে না, তবে পূর্ণতার দিকে গতি, সেই মুখে চেষ্টা, সেই মুখে যত্ন, শ্রম, প্রয়াস। সেই প্রয়াসের ধারাবাহিক ইতিহাস জীবনের কাহিনী। জীবনের ইতিহাস সর্ব্বত্র এক কথা বলে না। বিভিন্ন স্থলে জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন রূপ। চেষ্টা পূর্ণ সামঞ্জস্যের দিকে; চেষ্টার সফলতায় ধর্ম্মের পরিমাণ। সুতরাং জীবনের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ বন্ধন।

তুমি আমি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এবং তুমি ও আমি এই উভয় লইয়া জগৎ। এ হিসাবে জগতে তৃতীয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 'তুমি' ও 'আমি' শব্দ দুইটার অর্থ একটু পরিষ্কার বুঝা আবশ্যক।

'আমি' শব্দের পারিভাষিক নাম বিষয়ী অর্থাৎ যে কর্ত্তা, যে ভোক্তা, যে সুখী, যে দুঃখী, যাহার জন্য বিষয়রূপী সমস্ত জগৎ। 'তুমি' শব্দের অর্থ, আমার বাহিরে যা কিছু আছে, তাহা; আমি ছাড়া আর সবই, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর, আমার ভোগ্য বিষয় কেবল তাহাই কেন,—যাহা আমার ধ্যান, আমার ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা, এবং কামনা। এই আমি ছাড়া সমগ্র জগৎকে 'তুমি' শব্দে নির্দ্দেশ করিলাম। কেননা, তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, আমার প্রত্যক্ষ-গোচর বা কল্পনাগোচর বা অনুমানগোচর বা স্বপ্নগোচর আর সকলেরই

সহিত আমার এক হিসাবে সেই সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে আমা ছাড়া কিছুই নাই; যাহাকে আমি-ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া মনে করিতেছি এবং স্বতন্ত্র নাম দিতেছি, তাহা সমস্তই আমারই ভিতরে, আমার অংশ মাত্র, সবটাই আমার অনুভূতি বা আমার কল্পনা, আমার নিজেরই লীলা বা খেলা বা কারিকরি। যুক্তি আমিছাড়া আমার বাহিরে আর কিছুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। সুতরাং, সমস্ত বাহ্য জগৎটা আমারই ভিতর, আমারই এক অংশ। অংশ বলিলেও হয়ত ভুল হয়, কেননা আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অনুমানের যে ভাগটাকে বাহ্য জগৎ আখ্যা দিই, সেটা বাদ দিলে আমার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কতটুকু থাকে, নির্দ্দেশ করা সন্দেহ। আমি কতকগুলা সহবর্ত্তী ও ধারাবাহিক সুখময়, দুঃখময় ও না-সুখ-না-দুখ-ময় অনুভূতির বা বেদনার প্রত্যয়ের সমবায় মাত্র। এই অনুভূতি বেদনা প্রত্যয় ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থ আমাতে বর্ত্তমান আছে, যেমন স্মৃতি, ও কল্পনা, ও চিন্তা, ও কামনা, ও আশা। কিন্তু সেই প্রত্যয়গোচর অনুভূতিগুলার সহিত ইহারা এরূপে জড়িত যে, সে গুলার অস্তিত্ব না থাকিলে, ইহাদের অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। তাহাদের অস্তিত্বে ইহাদেরও অস্তিত্ব, তাহাদিগকে লইয়া ইহারা। অনুভূতিগুলাকে স্থূলতঃ তিন ভাগে ফেলিতে পারা যায়। কতকগুলার নাম অতীত; কতকগুলার নাম বর্ত্তমান; কতকগুলা ভবিষ্যৎ। তিনের মধ্যে বিভেদ, আবার তিনে মেশামিশি। অতীত বর্ত্তমানকে জড়াইয়া আছে, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে টানিয়া সম্মুখে আনিতেছে। শুধু বর্ত্তমান লইয়া যদি কারবার থাকিত, অতীত ও ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানের সহিত এককালে বিচ্ছিন্ন থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি জীবনের খেলা খেলিতে হইত না। অনুভূতি থাকিত, কেবল বর্ত্তমান অনুভূতি; সুতরাং আমি হয়ত থাকিতাম; কিন্তু আমার জীবন থাকিত না। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনুভূতিগুলা যে পরস্পরকে জড়াইয়া জড়াইয়া পরস্পর মাখামাখি,

পাশাপাশি থাকিয়া, পরস্পর হাতাহাতি, মুখোমুখি করিয়া, যে প্রবাহ ক্রমে চলিয়া যায়, সেই স্রোতটা, সেই প্রবাহটা লইয়া আমার সমগ্র জীবনব্যাপী আমি। অতীত অনুভূতি যে বর্ত্তমান অনুভূতিকে জড়াইতে চায়, সেইটুকু লইয়া আমার স্মৃতি। অতীতের উপর দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান যাহা রচনা করে, তাহার নাম আমার কল্পনা। অতীতের বলে ভবিষ্যৎ অনুভূতির বর্ত্তমানে আকর্ষণের নাম কামনা। অতীতের উপর ভর করিয়া ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া বর্ত্তমানে বসিয়া থাকার নাম আশা। এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, সঙ্গে সঙ্গে আশা ও কামনা ও স্মৃতি ও কল্পনার যে জড়াজড়ি সম্বন্ধ, যাহার ফলে এটার হাত ধরিয়া ওটা চলে, এটার ঘাড়ে ওটা চাপে, এটা ওটাকে টানিয়া আনে, ওটা এটাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহার নাম চিন্তা। সুতরাং অনুভূতি লইয়াই সব। সুতরাং অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নাই। সুতরাং সমগ্র বাহ্য জগৎটা আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ্য জগৎ। এই অর্থে উভয়ে অভেদ। সুতরাং আমি ও আমি-ছাড়া উভয়ই এক; এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, যুক্তির কথা এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা প্রবল যুক্তি আছে। আমি ছাড়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে স্বীকার করিতেছি, তা নয়। আমা ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমি বাধ্য নহি। তবে আমি আছি, এটা যেমন এক অর্থে ঠিক, তেমনি আমার বাহিরে আমাছাড়া একটা বাহ্যজগৎ খাড়া করিয়া সেই বাহ্যজগতে আমাকে একটা বিশেষ পথে চলিতে হইতেছে, ইহাও অন্য অর্থে ঠিক্। আমি কেন আছি, এ কথার উত্তর নাই। আমি না থাকিলে কি হইত বা কি থাকিত, সে কথারও উত্তর নাই। বোধ করি, এরূপ প্রশ্নের অর্থই নাই। অবশ্যকতাও নাই। একটা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং সেটা আমি। যে কতকগুলা সহচারী ও পারম্পরিক অনুভূতির সমবায় ও প্রবাহ লইয়া আমার জীবনের ধারা,

তাহাদের সমবায় ও পর্য্যায়ের মধ্যে যে একটা শৃঙ্খলা, প্রণালী, সম্বন্ধ ধারা বা নিয়ম বা বিশিষ্টতা দেখা যায়, সেইটাই আমার বিশেষণ। আমি আছি ও আমার একটা নির্দ্দিষ্ট বিশেষণ আছে; কেন আছে; কেন এইরূপ হইল, কেন অন্যরূপ হইল না, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় ত অজ্ঞতা আছে ও অজ্ঞতাবশতঃ উত্তর দিবার নানাবিধ আয়াস আছে। সেই অজ্ঞতাকে জ্ঞানের আবরণ দিয়া পুরাকালের সাংখ্য দর্শন একটা কাল্পনিক নাম খাড়া করিয়াছেন, তাহার নাম প্রকৃতি। হালের বিজ্ঞানও সেই নামটি গ্রহণ করিয়া যাহার উত্তর নাই, তাহার উত্তর দিতে গিয়াছেন। আমি আছি কেন?—প্রকৃতি বিধাতা। আমি এমন কেন?—প্রকৃতি জানেন। আমি এরূপে এ পথে চলি কেন?—প্রকৃতি প্রভু। প্রকৃতির বশতাপন্ন আমি আছি, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে আমি চলি। না চলিয়া আমার চলে না। আমি চলি, এবং আমি-ছাড়া অপরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার সহিত কারবার করিতে করিতে চলি, প্রকৃতির উপদেশে, প্রকৃতির নিয়োগে, প্রকৃতির বিধানে; কেন না, প্রকৃতি প্রভু; কেন না, প্রকৃতির প্রভুত্ব বিনা আমার এইরূপ যে অস্তিত্ব, তাহা বজায় থাকে না।

তাই প্রকৃতির নিয়োগে তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমিও যেমন সুখদুঃখভোগী একটা কিছু, তুমিও সেইরূপ সুখদুঃখভোগী একটা কিছু; অথচ তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার সৃষ্ট, তুমি আমার অন্তর্গত। আমি যেন দর্পণ, তুমি তাহাতে প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দর্পণ ছাড়া আর কিছু নহে; দর্পণের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই; দর্পণের পশ্চাতে গিয়া খুঁজিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বুঝি প্রতিবিম্ব বলিলেও ভুল হয়। কেননা প্রতিবিম্ব বলিলে দর্পণের বাহিরে ও সম্মুখে এমন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আসিয়া পড়ে, প্রতিবিম্বটা যাহার দর্পণপৃষ্ঠে প্রতিফলিত মূর্ত্তি-মাত্র। তেমনি তুমি আমার ভিতরে একটা প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ মনে

মনে করিলে, আমার বাহিরে স্বতন্ত্র একটা কিছু মনে আইসে, যাহা হইতে আমার মধ্যে তোমার উৎপত্তি। অথচ আমার বাহিরে সম্মুখে ও আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছু খুঁজিয়া মেলেনা। সে যাই হউক, বাহিরে কিছু থাক্ বা নাই থাক্, প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমি ছাড়া আর একজন আছে ইহা মানিয়া লই। আমাতে আমার যেমন বিশ্বাস, তোমাতেও আমার তেমনি বিশ্বাস। আমি আছি, এবং আমি ছাড়া তুমিও আছ। আমা হইতে তুমি বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, পৃথক্ হইয়া আছ।

তুমি আছ, সুতরাং উনি, তিনি ইঁহারা, তাঁহারা সকলেই আছেন। মৎস্য, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, পর্ব্বত, গহ্বর, সকলই আছেন। কেননা, সকলেই কোন না কোন সময়ে তুমি-স্থলীয়। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, সকলেরই সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। তুমিও যেমন আমার বিষয়, তাহারা তেমনি আমার বিষয়। তুমিও যে অর্থে আমার সুখদুঃখের বিধাতা, তাহারাও সেই অর্থে আমার সুখদুঃখের বিধাতা। সকলেই আমার প্রত্যক্ষ বিষয় ও অনুভূতির সামগ্রী, এবং সকলেই সমান ভাবে তুমিত্বের দাওয়া করেন। সুতরাং যেটাকে আমি-ছাড়া বাহ্যজগৎ বলি, সেটা এই বিশিষ্ট অর্থে আমা হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এই অর্থে বাহ্যজগৎটাই তুমি। অন্ততঃ এই বিস্তৃত পারিভাষিক অর্থে এই প্রবন্ধে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

আমি ও তুমি শব্দ দুইটার অর্থ একরকম বুঝা গেল। 'আমি' অর্থে আমি; আর 'তুমি' অর্থে এস্থলে আমি ছাড়া আর সব। কিন্তু মূলে বিরোধ। আমাতে তুমি ও তোমা লইয়া আমি; এই অর্থে উভয়ে ভেদ নাই। আবার—আমা ছাড়া তুমি স্বতন্ত্র; তোমার অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া, এই অর্থে উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এই বিরোধ লইয়া জীবনের উৎপত্তি; এই বিরোধেই জীবনের সমাপ্তি। ইহারই নাম প্রকৃতির খেলা।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় বুঝিবার প্রয়াস পাইও না; প্রকৃতির খেলা দেখিয়া স্থির থাক।

মূলের এই বিরোধ সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যেখানে যাই, যেখানেই থাকি, এই বিরোধ কোন্ না কোন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। আমায় তোমায় একতা, অথচ আমায় তোমায় ভিন্ন ভাব। তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থ; অথচ তোমার সংহারে আমার পূর্ত্তি। খেলা নয় ত কি বলিব?

আর একটা কথা এইখানে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমার এই ভৌতিক শরীরটা—প্রত্যক্ষতঃ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি রহিয়াছি, ইহাকেই এই হিসাবে আমার অন্তর্গত মনে না করিয়া তোমার অন্তর্গত মনে করিতে পারি। ইহাও আমার কল্পিত, সৃষ্ট, অনুভূতিগত, প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতেরই অংশীভূত। আর সবই যেমন আমার প্রত্যক্ষগত ও বহিঃস্থ, ইহাও তেমনি আমার প্রত্যক্ষগত ও বহিঃস্থ।

আধুনিক জীববিদ্যা একথা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। শরীরের সহিত হাত পায়ের যেরূপ সম্বন্ধ, গাছের সহিত তাহার শাখাপত্র-ফুলের যে সম্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্তানের সেই সম্বন্ধ। শাখা যেমন গাছের অবয়ব, পত্র-পুষ্প যেমন গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বীজ ও তজ্জাত বৃক্ষ আপাততঃ স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হইলেও, সেই একই সম্বন্ধে পিতৃ-বৃক্ষের অংশীভূত। আবার এক প্রোটোপ্লাজম্ হইতে যখন জীবমাত্রের উদ্ভব স্বীকার করিতে হয়, তখন প্রাণিমাত্রকেই এক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আমার, তোমার, তাঁহার, সকলেরই শরীর সেই এক পিতৃশরীর হইতে উদ্ভূত, অভিব্যক্ত। আবার জড়জগৎ ও জীবজগতের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া এইটাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিলে, জাগতিক ব্যাপারকে সমস্যার উপর সমস্যা করিয়া তোলা হয়, এবং জ্ঞানের চোখে আঙ্গুল দিয়া বিকৃতদৃষ্টি উৎ-পাদনের পাতক অর্শে। সুতরাং সমগ্র বাহ্যজগৎ—জীবশরীর ও জড়

শরীর উভয় লইয়া জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমগ্র জড়জগৎটা—একমাত্র। এই হিসাবে আমার শরীরও সেই জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত ও তাহার সহিত এক।

অর্থাৎ, সমগ্র জগৎটারই আমার সহিত সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ। জগৎটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের সহিত যদি আমার মুখ্যভাবে ও গৌণভাবে সম্বন্ধ আলোচনা করা যায়, তবে এইরূপ দাঁড়ায়। আমার সহিত মুখ্য সম্বন্ধ প্রথমে আমার শরীরের; পরে আমার পুত্র-পৌত্রাদির, পরে আমার পত্নী-বন্ধু-আত্মীয়বর্গের। এইরূপে ক্রমশঃ মুখ্য গৌণ পরম্পরায় জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, কুল, বর্গ, এইরূপে চলিয়া শেষে মানবজাতি জীবকুলে ও জড়জগতে গিয়া শেষ হয়। শেষ হয়—ঠিক বলা যায় না; কেননা, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া আর একটা এমন প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা হয়ত কোন কালেই প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। প্রত্যক্ষের অতীত অতীন্দ্রিয় এই প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা আমার কল্পনার বিষয়, সুখদুঃখের হেতু, আমায় চিন্তার ধ্যান ও আমার আশার লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ জগতের সহিত দৈনন্দিন নিত্য আবশ্যক কাটা ছাঁটা রুটিন অনুযায়ী কারবার সমাপ্ত করিয়া একটু অবকাশ পাইলেই, আমি সেই অতীন্দ্রিয় জগতে আশ্রয় লইয়া স্বচ্ছন্দভাবে গা খুলিয়া বিহার করিয়া বেড়াই ও হাওয়া খাই।

সম্বন্ধ অবশ্য সেইখানে মুখ্যতর, যেখানে ঘনিষ্ঠতা অধিক, যেখানে কারবার ও নিত্য আদানপ্রদান অধিক। সুতরাং আমি ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে, অর্থাৎ সমগ্র তোমার মধ্যে, প্রথমে দাঁড়ায় আমি, পরে পুত্রপরিবার লইয়া মানবজাতি, পরে জীবসমূহ লইয়া জড়জগৎ ও সর্ব্বশেষে সর্ব্বতোভাবে আমার রচিত ও কল্পিত সেই অতীন্দ্রিয় মানসরাজ্য।

এই ভাবে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমার জীবন। এই সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

কিন্তু ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অদ্যাপি। অথবা মানবসমাজের আদি হইতে আজি পর্য্যন্ত। কেননা, তোমাতে আমাতে এক ও অভিন্ন, অথচ তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র। মূলে বিরোধ। উপরে বলিয়াছি ইহা প্রকৃতির খেলা। বিরোধ বড় যেমন তেমন নহে। তুমি আমার, অথচ তুমি আমার নহ। তোমায় আমায় অভেদ; অতএব তোমার উৎকর্ষে আমার উৎকর্ষ, তোমার ভালয় আমার ভাল, তোমার অভিব্যক্তিতে আমার অভিব্যক্তি। অথচ অন্যদিকে দেখিতে তোমার স্বার্থে আমার অনর্থ; তোমার মঙ্গলে আমার অমঙ্গল; তুমিই আমার পরম শত্রু। মিথ্যা কথা নহে; মানবজীবনে ইহা প্রকাণ্ড সত্য।

অধিক কথা বলিতে হইবে না। মাতার শোণিত শোষণ করিয়া সন্তানের দেহের পুষ্টি। তোমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে গেলে আমার দেহ বহে না। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া না লইলে তোমার চলে না, তাই তুমি আমার ছিদ্র অন্বেষণে নিরত। আমি আমার পরম শত্রু তোমা হইতে আত্মরক্ষণে সর্ব্বদা নিরত। সমগ্র জীবসমষ্টি আমাকে উদরসাৎ করিবার জন্য লোল জিহ্বা বাহির করিয়া আছে; সমগ্র জড় জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। পদস্খলন আর মৃত্যু। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; ইহা হইতে অভিব্যক্তি। ইহার নাম ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, কপটতা, ক্রোধ, হিংসা, রক্তপাত। কিন্তু ইহা হইতেই স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ইহার নাম প্রকৃতির লীলা। ইহার উপরে তোমার আমার হাত নাই।

তুমি আমার মিত্র ও তুমি আমার ঘোর শত্রু। তোমাকে লইয়া আমি। তোমাকে ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না; অথচ তোমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই আমার অস্তিত্ব; তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই আমার জীবনের ব্রত। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয়ই

সমস্যা ; তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যনির্ণয়ই আমার জীবন। সেই সম্বন্ধনির্ণয়ের ও কর্ত্তব্যনির্ণয়ের অপর নাম ধর্ম্মব্যবস্থা।

তোমার প্রতি কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য ; আমার জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য ; মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য ; জীব ও জড়ের উপর কর্ত্তব্য, ও আমার আশা, ভয়, স্বপ্ন, কল্পনার প্রতি কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সমষ্টি ধর্ম্ম। মূলে বিরোধ ; সামঞ্জস্যের অভাব। ধর্ম্ম সামঞ্জস্যস্থাপনের উপায়। ধর্ম্মের গতি সামঞ্জস্যের পূর্ণতার অভিমুখে। নেত্রী প্রকৃতি স্বয়ং। পথ দুর্গম, পিচ্ছিল। পাঁচটা পথ পাঁচ দিক্ হইতে আসিয়া সমস্যা বাধায়। মনুষ্য কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পথে যাই ? ভিতর হইতে কে একজন উত্তর দেয়, ধর্ম্মের পথে চল। প্রশ্ন উঠে, ধর্ম্ম কোথায় ? ধর্ম্মের তত্ত্ব কোথায় ? তখন উত্তর আসে, ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

স্বার্থ ও পরার্থ

স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি, ও নিবৃত্তি এই দুইটা বিরোধ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। অথবা যে দিন হইতে এই বিরোধের আরম্ভ, মনুষ্যের সমাজেরও আরম্ভ সেই দিনে। এই বিরোধের ধারাবাহিক প্রবাহকেই সমাজের জীবন বলিলে বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে, ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের যে সনাতন বিরোধ দেখা যায়, তাহাও মোটের উপর ইহাই। স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে—প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম অধর্ম্ম। পরার্থের অভিমুখে—নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম ধর্ম্ম। হয়ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে খাটিবে না; স্বার্থপ্রবৃত্তিমাত্রকে অধর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তুমুল সমস্যা হইয়া পড়ে; আবার স্বার্থনিবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ধার্ম্মিকের সংখ্যায় বিব্রত হইতে হয়। তবে দুই চারিটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ হাতে রাখিয়া ধরিলে মোটামুটি অধিক ভুল না হইতে পারে। বিচারের কথা ছাড়িয়া, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের দিকে চাহিলেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম, ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা বড় নূতন নহে।

বলা বাহুল্য, স্বার্থ পরার্থের এই ঝগড়া মানুষ ভিন্ন অন্য জীবে বড় লক্ষিত হয় না। ইতর জীবের জীবন স্বার্থময়; পরার্থপ্রবৃত্তি যদি কোথাও দেখা যায়, সেখানে পর অর্থে নিজের সন্তান, অথবা সহচর বা সহচরী। ইতর জীবের মধ্যে যাহারা দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখা যায়, নৈতিক কাব্যলেখকেরা

যে সকল উদাহরণ দুঃশীল মানুষের সম্মুখে উৎসাহের সহিত স্থাপিত করেন, সে সমস্তই তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারজাত;—মানুষের মত স্বাধীন-ইচ্ছা-প্রসূত নহে। তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে তাহাদের স্থান নাই। স্বাধীন ইচ্ছা কথাটা উচ্চারণ করিতে ভয় হয়, কেন না, এই কথাটা উৎকট তর্কসমরের ক্ষেত্র। এস্থলে সে তর্কে প্রবেশের কোন আবশ্যকতা নাই। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইতর-জীবে নাই, মনুষ্যসমাজে আছে; কেন না, জাতিবিশেষে ইতর জীব হয় সকলেই ধার্ম্মিক, নয় সকলেই অধার্ম্মিক; মানুষে কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক। ইতর জীবে যেমন স্বার্থে পরার্থে বিরোধ নাই, যে সব মানুষের অবস্থা এখনও ইতরজীবের সদৃশ, তাহাদের মধ্যেও তেমনি এই বিরোধের প্রখরতা দেখা যায় না। কেন না, এই বিরোধের সূত্রপাতেই সমাজের সৃষ্টি; এই বিরোধের স্থায়িত্বেই সমাজের জীবন; এই বিরোধের বর্ণনাই সমাজের ইতিহাস। এবং যাহাকে সভ্যতা বলে, তাহাও এই বিরোধের পরিণতি ও আনুষঙ্গিক ফল।

আর একটা কথা আছে। মানুষের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি, এই দুইটি মাত্র পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। সূক্ষ্ম হিসাবে, স্বার্থপ্রবৃত্তি ও স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি, এই তিনটা পর্য্যায় আনিতে হয়।

প্রথম, স্বার্থপ্রবৃত্তি;—যেমন, ক্ষুধা পাইলে আহার করিও। বলা বাহুল্য, এই উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ আড়ম্বরের দরকার নাই; ভোজনকালে বৃদ্ধের বচন সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়, স্বার্থনিবৃত্তি;—যেমন, চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না। যাজকসম্প্রদায়, লোকশাসন ও রাজশাসন, পুলিশ ও আদালত এই শিক্ষাদানে নিযুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিক ভাগই এই উপদেশ।

তৃতীয়, পরার্থপ্রবৃত্তি ;—যথা, দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র-মাত্রেই এরূপ বাক্য দুই চারিটা পাওয়া যায়। তবে মানুষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে পরার্থপ্রবৃত্তির অপেক্ষা স্বার্থনিবৃত্তির দিকেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিক টান দেখা যায়।

এই তিনের সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বজায় রাখিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়ম এই ; নতুবা জীবন টিকে না। পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না ; আর, সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। স্বার্থসাধন ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী ; পরার্থসাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। মানুষ দুর্ব্বল জীব ; সমাজে না থাকিলে উৎকট জীবনসংগ্রামে তাহার কল্যাণ নাই ; তাই যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে ; নিজের মুখের গ্রাস সময়ে সময়ে পরের মুখে না দিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাটা নিতান্ত ইউটিলিটি মতানুযায়ী হইল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ ; ভালর মূলে মন্দ। তাহাতে পরিতাপ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা লইয়া জীবন ; কিন্তু সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার ; একেবারে ঘটে কিনা সন্দেহ। কতটুকু নিজের জন্য রাখিব, কতটুকু পরের জন্য রাখিব, মীমাংসা সহজ নহে। পাঁচ জনের পাঁচ মত। আবার মত অনুসারে কাজ হয় না। মতের সহিত কাজের মিল নাই। কাজ প্রধানতঃ প্রবৃত্তির অভিমুখে ; মত প্রধানতঃ নিবৃত্তির অভিমুখে। উপদেশদানে যিনি পরম সন্ন্যাসী, কাজের বেলায় তিনি ঘোর বিষয়ী। সংসারের এই একটা প্রধান রহস্য বা আমোদ।

নিবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তনার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংখ্যাতীত নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে

পরার্থপরতার প্রচার করিতে গিয়া পরের সহিত বিবাদ, বিসংবাদ, রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর, এই গুরুগম্ভীর উপদেশের অপ্রতুল দেখা যায় না।

স্বার্থ বিসর্জ্জন করিব কেন, সহজেই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রশ্নটার সঙ্গত উত্তর না দিলে উপদেশ নিষ্ফল হয়। তাই ঘোর পরার্থবাদীরাও ইহার উত্তর দিয়াছেন, বা নানারূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর দুই চারিটার একটু সমালোচনা করিলে শিক্ষা ত আছেই, আমোদও কিছু আছে।

প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম, নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আচরণ কর, সুখে থাকিবে। ধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ; প্রথমে দুঃখ আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুখ। সুখই যখন জীবনের উদ্দেশ্য, সুখলাভের ইচ্ছাই প্রবৃত্তি, তখন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্ত্তমান দুঃখে ভয় পাইও না। অর্থাৎ, তোমাকে নিবৃত্তি উপদেশ দিতেছি কেন,—না, শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির অনুযায়ী ফল পাইবে বলিয়া। সংসারের বন্দোবস্তটা খারাপ; কষ্ট না করিলে সুখ হয় না; সেই জন্য কষ্ট করিতে বলিতেছি। পরার্থসাধনে যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এমন নহে; তবে সেটা নইলে স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না; অন্যরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে তোমাকে এ উপদেশ দিতাম না। উত্তরটা কতদূর ধর্ম্মসঙ্গত বলা যায় না; তবে মানুষের মনের মত বটে। প্রলোভন দেখাইয়া কাজ পাওয়া যায়, এ হিসাবে বুদ্ধিমানের উপযুক্তও বলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রলোভনটা প্রলোভনমাত্রই; ধর্ম্মপথে সুখ লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কষ্ট পাওয়াই সার হয়, ফললাভ সর্ব্বদা হয় না। অধিক বলা আবশ্যক নহে; ধর্ম্মের জয় সংসারের অখণ্ড নিয়ম হইলে উপদেশের এত বাড়াবাড়ি হইত না।

সুতরাং উত্তরটা নিখুঁত হইল না। কাজেই প্রলোভনের মাত্রাটা চড়াইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। ইহলোকে সুখ দুর্ঘট বটে, কিন্তু

পরলোকে সুখ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মপথে চল, পরকালে সুখে থাকিবে। পরকালের সুখ নানাবিধ;—স্বর্গ, নন্দনকানন, পারিজাত, অপ্সরা, ইন্দ্রত্ব। কেহ এতদূর নামিতে সাহস করেন না; তাঁহাদের মতে দেবত্বলাভ, মুক্তি, নির্ব্বাণ। এক শ্রেণীর মতে সুখপ্রাপ্তি; অন্যের মতে দুঃখনিবৃত্তিমাত্র। আবার অন্য উপায়ও আছে। উপদেশমত কাজ কর ভালই, নতুবা পরকালে ঠকিবে। রৌরব, কুম্ভীপাক, ডাঙ্গশ, গন্ধকের আগুন; অগত্যা ন্যূনপক্ষে পুনর্জন্ম। কিন্তু হইলে কি হয়, দুরন্ত মানব ইহাতেও বশ হয় না। গুরু-সমীপে উপদেশের যাথার্থ্য সকলেই মানিয়া লয়; কিন্তু কার্য্যকালে "যো ধ্রুবাণি পরিত্যাজ্য" ন্যায় অবলম্বন করে। সুতরাং উত্তরটা যেমনই যুক্তিযুক্ত হউক, কাজে বড় সফলতা লাভ করে না। মানুষের স্বভাব এমনি দুর্দ্দম।

তৃতীয় উত্তর সেই একই কথা, আর একটু ঘুরাইয়া। ধর্ম্মের জয় সত্য; কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিলে হইবে না। পরকালের ভরসায় প্রস্তুত নহ; ইহকালে সুখের দাবি করিলেও ঠিক্ থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের জয় মিথ্যা নহে; সর্ব্বত্র জয় না হইতে পারে, তবে মোটের উপর জয়। আজিকালি না হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় অব্যাহত। এইরূপে অর্থের পরিসর বাড়াইয়া ব্যাখ্যা করিলে আর আপত্তি বড় চলে না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম সমাজ লইয়া। যেখানে সমাজ নাই, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টিকৃত হইয়া সমাজজীবনে পরিণত হয় নাই, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ বা অস্তিত্ব নাই। যেখানে সমাজ বাঁধে নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; পরতন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটাআঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। আবার যাহা সমাজরক্ষার অনুকূল, স্থূলতঃ তাহারই নাম ধর্ম্ম; যাহা প্রতিকূল, স্থূলতঃ তাহাই অধর্ম্ম। আবার সমাজের অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃতিভেদ; সমাজের গতি ও

অভিব্যক্তির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং, যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহারই গতি ঊর্দ্ধমুখে; যেথানে লাঞ্ছনা, তাহার গতি অধোমুখে। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পার; বস্তুতঃ প্রকৃতির নির্ব্বাচনপ্রণালী, যাহা জীবরাজ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সমাজের পক্ষে ইহা তাহারই প্রয়োগমাত্র।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তি নিরোধ কর, তাহাতে ভাল হইবে। তোমার ভাল হইবে ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমাদের ভাল হইবে। আমাদের ভাল হইলে কতকাংশে তোমারও ভাল। সেই পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে প্রলোভন। অন্য প্রলোভন তোমাকে যা দিই, সেটা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সেটা আমাদের পলিসি। পরের মন্দ করিও না, করিলে শাস্তি দিব; পরের ভাল করিও, তোমাকে সুশীল বলিব।

এইরূপ উত্তরে যুক্তি আছে, সরলতা আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউটিলিটি ও ক্ষতিলাভ গণনাও আছে। আবার আত্মপক্ষে লাভাঙ্ক অপেক্ষা ক্ষতির অঙ্ক গুরু দেখায়; তাই এরূপ উত্তর ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তনায় সাহায্য করে না; কাজেই ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে গণ্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার স্থান নাই।

চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের একরকম উত্তর আছে; সেই উত্তর এ তিনটি হইতে স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম আচরণ কর, কেন না, ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য। সুখের আশা করিও না; সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখিয়া ডরাইও না; দুঃখ জীবনের সহচর। এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এইমাত্র বোধে ধর্ম্মাচরণ কর; ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি ইহকালে কি পরকালে সুখপ্রাপ্তি তোমার যদি ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে ধর্ম্মচারী বলিব না। সমাজের লাভ হইবে কি না গণনা করিয়া, ইউটিলিটির হিসাব ধরিয়া, যদি তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রস্তুত হও, তোমাকে ধার্ম্মিকের শ্রেণীতে ফেলিতে চাহিব না। কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, কর্ত্তব্যপালনই তোমার প্রকৃতিগত হউক, কর্ত্তব্যপালন বিনা তোমার যেন শান্তি না জন্মে। কেন করিব, জিজ্ঞাসা করিও না; যুক্তি তর্ক অন্বেষণ করিও না; ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না।

বলা বাহুল্য, সকল শাস্ত্র এইরূপে ধর্ম্মের উপদেশ দেয় না। যে শাস্ত্র দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কোন্ শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে বলিতে হইবে না।

কাব্যগ্রন্থ মধ্যে রামায়ণ এই উপদেশ দেয়। তাই রামায়ণ কাব্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হইতে পারে, এরূপ উপদেশে প্রলোভন নাই, প্রবোধ নাই, সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আদর্শ মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে না; কর্ত্তব্য পালন করে। সংসারে প্রবোধ ও সান্ত্বনার অস্তিত্ব নাই।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি।

রাজা দিলীপ বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জীবন-দানে উদ্যত হইলে, মায়াসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, একটা গরুর জন্য জীবন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার প্রজাগণকে কত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

দিলীপ দুই কথায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রথম, আমি ক্ষত্রিয়, আর্ত্তত্রাণ আমার ধর্ম্ম, দ্বিতীয়, আমি এক্ষণে পরাধীন, প্রাণপাতেও প্রভুর নিয়োগপালনে আমি বাধ্য।

আজ কাল যাহাকে ইউটিলিটি বা হিতবাদ বলে, যাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা অধিক লোকের অধিক হিত, সেই অনুসারে ধরিলে, দিলীপের হিসাবে, ভুল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভুয়া সেণ্টিমেণ্টের বা ভাব-প্রবণতার জন্য এতটা সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিচারমূঢ়তাই দেখাইয়াছিলেন। গরুর জীবনের অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য, বশিষ্ঠের নিকট না হউক, সমস্ত সমাজের নিকট অনেক অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় বশিষ্ঠকেও স্বীকার করিতে হইত।

দিলীপ ঠিক্ বুঝেন নাই, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ইউটিলিটিতত্ত্বের জয়-জয়-কারের দিনেও এমন লোক অনেক দেখা যায় যে, কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের সময় ইউটিলিটির বা সমাজের হিতপরিমাণের হিসাব না করিয়া সেণ্টিমেণ্টেরই বা ভাবপ্রবণতারই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বস্তুতই এই প্রাচীনা বসুন্ধরায় মনুষ্য বহুদিন যাবৎ বাস করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; তথাপি তাহার জীবনে কোন্ কাজটা করা

উচিত, এবং কেনই বা করা উচিত, এই সাধারণ তত্ত্বের অদ্যাপি মীমাংসা হইল না।

তবে সমাজবিশেষে কতিপয় স্থলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ শাস্ত্রের বিধান দ্বারা বিহিত হইয়াছে; এবং সেই বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিবার, অথবা তাহার যুক্তিযুক্ততাবিষয়ে সন্দেহ স্থাপন করিবার অবকাশ সামাজিক মনুষ্যের একবারে নাই। পরের গাছের আম পাড়িয়া খাইব কি না, এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই শাস্ত্রে ব্যবস্থা দেয়, যে ধরা পড়িলেই বেত্রাঘাত। বলা বাহুল্য, এই শাস্ত্রের নাম পীনাল কোড; এবং এই দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ থাকায় অন্ততঃ কতকগুলা সংসারিক কাজে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য বিশেষ মাথাব্যথার দরকার হয় না।

কিন্তু পীনালকোডের মধ্যে নির্দ্দেশ নাই, এরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য মনুষ্যের সম্মুখে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। সে স্থলে মানুষ কোন্ পথে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া আকুল ও দিশাহারা হয়। পথের সংখ্যা এত অধিক, এবং বিশ্বাসী পথ-প্রদর্শকের এত অভাব যে, পথিকের অবস্থা এ স্থলে শোচনীয়।

এক সম্প্রদায় পথপ্রদর্শক এইরূপ আশ্বাস দেন যে, এরূপ স্থলেও মনুষ্যের এক উপায় আছে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-নামক আর একটা পীনাল কোড খাড়া করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এই কোডের ব্যবস্থানুসারে চল, তাহাতে মঙ্গল হইবে। ইহা মানিয়া চলিলে ইহপরত্র পুরস্কার, না মানিলে শাস্তি। কেন মানিব, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পীনাল কোডের ব্যবস্থা যেমন রাজশক্তি হইতে আসিয়াছে, ইহার ব্যবস্থাও সেইরূপ অপর কোন শক্তি হইতে আসিয়াছে, যাহার উপর তোমার কোন প্রভুত্ব নাই। কোনরূপ দ্বিধা ও দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া চল, তোমার মঙ্গল হইবে।

এইরূপে কোন একটা শাস্ত্রবিশেষ মানিয়া চলিতে পারিলে অনেকটা

সুবিধা হয়; অন্ততঃ নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয় না, সুতরাং নিজের দায়িত্বের বোঝা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু অনেক সময়ে অন্তরাত্মা এইরূপ শাস্ত্রের শাসন মানিতে চাহে না; বরং অনেক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সকল সমাজেরই ধর্ম্মশাস্ত্র কতকগুলা কার্য্যকে পাপ ও কতকগুলাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রে শাস্ত্রে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভয়ানক মতভেদ আছে। আবার যখন শুনা যায় যে, রবিবারে স্কুলে যাওয়াকে নরহত্যার সহিত এক শ্রেণীতে স্থান দিয়া শাস্ত্রবিশেষে উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান করিয়াছে, তখন সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহাচরণই কর্ত্তব্য বলিয়া উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হয়।

ফলে, মনুষ্যের অন্তর মধ্যে conscience নামে একটা কি আছে, সে সকল সময়েই মনুষ্যের মনোমধ্যে অশান্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই কন্‌সেন্সের দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত দেশী নাম যাহাই হউক, চলিত বাঙ্গালাতে আমরা ইহাকে 'সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি' আখ্যা দিতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে অন্তর্যামী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহার স্বরূপই বোধ করি এই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। মানুষ যখন এ দিকে যাইতে চায়, তখন এই প্রবৃত্তি তাহাকে ও দিকে টানে। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পীনাল কোড, যখন মানুষকে এ পথে যাইতে বলে, তখন উহা অন্য পথ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতই মনুষ্যের ঘরে ও বাহিরে কুত্রাপি শান্তি নাই। মনুষ্যের অন্তরে এই একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অনুরোধ ও উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সে সকল অনুরোধ ও সে সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া এবং সে সকল ভীতি-প্রদর্শন তাচ্ছীল্য করিয়া অন্য পথ দেখাইয়া দিতেছে।

মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তিসমূহের প্ররোচনায়, অথবা বন্ধুবর্গের উপদেশ বাক্যে, একটা গন্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশের কোথা হইতে কাহার গম্ভীর স্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাহাকে চালাইতে পারে না; হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; শাস্ত্রের শাসন তখন আর সম্মান পায় না; ইউটিলিটীতত্ত্ব বা অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষতিলাভ-গণনা ও হিসাব নিকাশের তখন অবকাশ মিলে না।

মায়াসিংহ যখন দিলীপকে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গে ক্ষতিলাভ-গণনা ও হিসাব নিকাশের কথা আনিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে দিলীপের সহজ সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ফলতঃ মনুষ্যের সৌভাগ্য এই যে, বিবিধ নীতি ও বিবিধ উপদেশ ও বিবিধ শাস্ত্র যখন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যত্বের চক্ষুকে অন্ধীভূত করে, ও তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সেই অকৃত্রিম সরল সুস্থ ধর্ম্মসংস্কারই তাহাকে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের এই স্বাভাবিক সহজ সংস্কার বা প্রবৃত্তি, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে? এ প্রশ্নের কি উত্তর নাই?

এই স্থানে মনুষ্যপ্রকৃতির একটু আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য স্বভাবতঃ সুখান্বেষী। সুখ শব্দের ও দুঃখ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। সুখ শব্দে কি বুঝায় ও দুঃখ শব্দে কি বুঝায়, তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য স্বভাবতই সুখ অন্বেষণ করে ও দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চেষ্টা করে। ইহাতে মানুষের দোষ নাই। প্রকৃতিকর্ত্তৃক মনুষ্য ইহাতে নিযুক্ত। মনুষ্যের অপর ধর্ম্ম যাহাই হউক, আপন জীবন রক্ষা

করিয়া চলিতেই হইবে, ইহা তাহার প্রথম ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং জীবন রক্ষার জন্যই সে সুখের অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃতির অবস্থা অন্যরূপ হইত, যদি জীবনরক্ষায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি না থাকিত, যদি মনুষ্য সুখ ত্যাগ করিয়া স্বভাবের তাড়নায় দুঃখেরই প্রতি ধাবিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে মনুষ্যজাতিসংক্রান্ত পরিচ্ছেদটা বোধহয় অস্তিত্বহীন হইত। যাহা জীবনের অনুকূল, তাহারই নাম সুখ, যাহা জীবনের প্রতিকূল, তাহারই নাম দুঃখ। কাজেই যাহাকে জীবন ধরিতে হইবে, সে সুখ-সাধনে ও দুঃখ-বর্জ্জনে বাধ্য। তাহার গত্যন্তর নাই। সময়ে সময়ে দেখা যায় বটে, সুখান্বেষণেই মনুষ্যের বিপদ্ ঘটে, জীবন বিপৎসঙ্কুল হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃতির বন্দোবস্তের দোষে; প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য সুখান্বেষণেই প্রকৃতিকর্ত্তৃক নিযুক্ত আছে।

মানুষ মনুষ্যত্বলাভের পূর্ব্বেই জীবত্ব লাভ করিয়াছিল। সংসারমধ্যে মনুষ্য একটা জীব। তাহার জীবনরক্ষা-বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে এতদিন সংসারে টিকিতে হইত না, ও পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে বিচার লইয়া আমাদিগকেও তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। জীবনরক্ষাই মানবরূপী জীবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। অন্যান্য জীবের সহিত এই স্থলে তাহার সাধারণত্ব। জীবনরক্ষার অনুকূল পথে তাহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না, প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং প্রকৃতি এই জন্য তাহাকে সুখান্বেষী করিয়াছেন। কোন্ পথ জীবনের অনুকূল, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সকলের নাই; তাহা পদে পদে বিচার করিয়া জানিতে গেলে জীবন রক্ষা হয় না; জীবনসমর এমনি ভয়ানক। সেই জন্য প্রকৃতিই তাহার কতকগুলি মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জীবনরক্ষার্থ সেই প্রকৃতিপ্রদত্ত মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে।

সেই স্বভাবজাত মনোবৃত্তির নাম সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি বা দুঃখ-পরিহার-প্রবৃত্তি। জীব সেই প্রবৃত্তির বশে চলে বলিয়াই আজি পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব। সত্য বটে, এই সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাকে ঠিক পথে, জীবনের অনুকূল পথে, লইয়া যায় না। সে প্রকৃতির ব্যবস্থার দোষ। কিন্তু তাহার পক্ষে অন্য উপায় নাই। জীবন থাকুক, আর নষ্টই হউক, সে সুখান্বেষণে বাধ্য। এবং সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই সুখ জীবনের অনুকূল, দুঃখ জীবনের প্রতিকূল। সুতরাং জীব যে সুখ চাহে, ও জীবধর্ম্ম মনুষ্যও অন্য জীবের মত সুখান্বেষণ করে ইহাতে মনুষ্যের দোষ নাই ইহা প্রকৃতির বিধান। ইহাতে মঙ্গল; ইহা সত্য কথা; ইহার অপলাপ করিও না।

মনুষ্য জীব ও সুখান্বেষী জীব, প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। এই পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। এক জীবের জীবন নষ্ট না করিলে অন্য জীবের রক্ষা হয় না; একের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে দুঃখ; অপরকে দুঃখ না দিলে নিজের সুখ নাই। ইহা প্রকৃতির ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার উপর জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত। আহার বিনা জীবন রক্ষা হয় না, এবং জীবের আহার জীব।

ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, কিন্তু ইহার উপর তোমার আমার হাত নাই। প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর তোমার আমার প্রভুত্ব নাই। জীবন রাখিতে হইবে, অথচ অন্যকে নাশ না করিলে জীবন থাকিবে না। জীবমাত্রের এই চেষ্টা জীবমাত্রেরই এই দিকে গতি; ফলে ঘোর জীবনসংগ্রাম। মূলে এই দ্বন্দ্ব; এবং এই দ্বন্দ্বের উপর সমগ্র জাগতিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত। জগৎ ব্যাপারের আগাগোড়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখা যায়, এই স্থলেই তাহার মূল। এইখান হইতেই ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি।

মূলে দ্বন্দ্ব: সংগ্রাম, বিবাদ, রক্তপাত; অথচ ইহা নহিলেও যেন চলে

না। দ্বন্দ্ব হইতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব হইতে মৃত্যু, দ্বন্দ্ব হইতে পাপ। অথচ দ্বন্দ্বহীন, দুঃখহীন, পাপহীন জগৎ কেমন হইত, তাহা তো কল্পনায় আসে না। কবির কল্পনায় হয় ত আসিতে পারে। যে জগতে দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, পাপ নাই,—সবই সুখ, সবই শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন, আর বসন্ত, আর মলয়পবন—সে জগৎ কবিকল্পনায় হয় ত আসিতে পারে। কিন্তু সে জগতের প্রকৃতি কেমন, তাহা জ্ঞানবিজ্ঞানের অগোচর। জরামরণহীন, দুঃখদ্বন্দ্বহীন অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের কি প্রভেদ, আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি, এই বৈচিত্র্য, ও সৌন্দর্য্য, জীবনের এই উচ্ছ্বাস ও বিকাশ, সেই সনাতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হইতেই উৎপন্ন। মৃত্যু ছাড়িয়া জীবন নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই, পাপ ছাড়িয়া পুণ্য নাই, জগতের এই সর্ব্বপ্রধান সত্য।

জীবনরক্ষার জন্য জীবে জীবে দ্বন্দ্ব, নখানখি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তি—ফলে জীবমধ্যে অভিব্যক্তি, উচ্চের আবির্ভাব, নীচের তিরোভাব; দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভিব্যক্তি, বিকাশ, উন্নতি; সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আশা, নূতন অশান্তি, নূতন দ্বন্দ্ব। জীবমধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এবং জীবসমাজে মনুষ্যমধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা।

এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বকোলাহল মধ্যে প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য দেখিতেছ? জীবের প্রতি দয়া? ব্যক্তি-জীবনের রক্ষণ-প্রয়াস? বাতুলের কথা। জীবন-রক্ষার উৎকট প্রয়াসে জীবগুলা ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে; কিন্তু জীবন-রক্ষা ত হয় না। সুখান্বেষণে প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবমাত্রেই ছুটিতেছে; আপন জীবনরক্ষার জন্য ছুটিতেছে; পরের জীবনে দয়া করিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু সেই আপন জীবনই কি রক্ষা পায়? উত্তরে বলিব, পায়না। অভিব্যক্তি? উন্নতি? কাহার? উত্তরে বলিব ব্যক্তির নহে; জাতির।

জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিজীবনের জীবনব্যাপী প্রয়াসের চরম ফল মৃত্যু; মৃত্যুর চরম ফল জাতি-জীবনের অভ্যুদয়। ব্যক্তি যায়, জাতি থাকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য জাতীয় অভিব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি। ব্যক্তির জীবন তাহার নিকট মূল্যহীন। ব্যক্তির জীবন খেলার পুতুল, ক্রীড়নক। ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতি আপন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া লয়। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তির নাশ, জাতির বিকাশ। মনুষ্যজাতি আজিও আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের তীব্র ও উৎকট উত্তেজনা লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা? তুমি মরণের কুক্ষিতে বিস্মৃতির গর্ভে অন্তর্হিত হও; তোমাকে লইয়া প্রকৃতির আর কোন দরকার নাই। তোমার জীবনের যেটুকু কাজ, তাহা তোমা দ্বারা প্রকৃতি সাধিয়া লইয়াছে। তুমি যাও, অপরকে স্থান দাও। অন্তিমকালে ব্যক্তিমাত্রের প্রতি প্রকৃতির এই নির্ম্মম বাণী।

প্রকৃতির নিকট ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন; জাতির অভ্যুদয় তাহার উদ্দেশ্য। তবে জাতির অভ্যুদয়-সাধনের জন্য ব্যক্তিমাত্রকে কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিয়া খাটাইয়া লইতে হয়; তাই প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যক্তিমাত্রই জীবন ব্যাপিয়া খাটিতেছে। সে মনে করে, আমি আপন জীবনের উৎকর্ষের জন্য এত প্রয়াস, এত যত্ন করিতেছি। কিন্তু হায়, সে জানে না কি বিষম প্রতারণায় সে প্রতারিত। জীব প্রকৃতির তাড়নায় কাজ করে; তাহাতেই তাহার সুখলাভ। তাহাতেই তাহার জীবন কিছুদিনের জন্য রক্ষিত হয়। প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার যতদিন বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, ততদিন তাহার জীবন রক্ষিত হয়। কিছুকাল তাহার জীবন পুষ্টি পায়। সে জানে না, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে জীবিত রহিয়াছে। ক্ষুধার উত্তেজনায় ব্যাঘ্র ছাগশিশুর উপর লম্ফ দিয়া পড়ে; স্বভাবের উত্তেজনায় প্রকৃতির তাড়নায় সে এমন করে; এমন না করিয়া তাহার উপায় নাই। সে

প্রকৃতির দাস; প্রকৃতি কর্তৃক সে অন্ধভাবে ছাগহত্যায় নিয়োজিত। সে ক্রিয়াতে তাহার স্বাধীনতা নাই। তাহার নিজের জীবন এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কেন না, প্রকৃতির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে যতদিন তাহার সন্তান না জন্মে, ততদিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার জন্য তাহার কিছুদিন বাঁচা আবশ্যক। যত দিন সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে ক্ষুধার উত্তেজনায় ছাগশিশু হত্যা করিয়া নিজ জীবন বর্দ্ধন করিতে থাকুক। আবার আততায়ী যখন ব্যাঘ্রশিশুকে আক্রমণ করে, তখন কুপিতা ব্যাঘ্রী তাহার উপর লাফ দেয়; তখন নিজের জীবনের জন্য তাহার মমতা থাকে না। এখানে ব্যাঘ্রীও সেইরূপ স্বাধীনতাবর্জ্জিত ক্রীড়নকমাত্র। প্রকৃতি তাহাকে সন্তানের জীবনের জন্য আত্মজীবনে মমত্বহীন করে; সে স্বার্থান্বেষণে অবসর পায় না। ইহাতেই তাহার সুখ; শিশুর জীবন রাখিবার জন্য আপন জীবন দান করিতে তাহার সুখ; প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহাকে এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন। সে প্রকৃতির অনুজ্ঞা-পালনে বাধ্য।

মনুষ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা। জীবমধ্যে মনুষ্যের স্থান সকলের উপরে; কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা বোধ করি সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। এই অবস্থার শোচনীয়তাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। ইতর জীব জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে; কিন্তু ইতর জীব বোধ-করি জানে না, তাহার সমস্ত চেষ্টার পরিণতি মৃত্যু। মনুষ্যও তাহার মতই জীবনযুদ্ধে নিরত; কিন্তু মনুষ্য জানে যে, মরণ অবশ্যম্ভাবী। ইতর জীব প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু সেই কাজের ফল কি হইবে না হইবে, তাহা সে জানে না ও ভাবে না; তাহার জন্য সে দায়িত্বশূন্য। মনুষ্যও প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু সে আপন কার্য্যের ফল আপন চোখে দেখিতে পায়; এবং সময়ে সময়ে সেই ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া

বিচারশক্তি দ্বারা প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইয়া লয়। ইতর জীবের পথ একটা; মানুষের পথ অনেকগুলি। আপনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া মানুষকে আপনার পথ পছন্দ করিয়া লইতে হয়। সেই দায়িত্ব তাহার স্কন্ধের উপর। মনুষ্য জীব বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচার-পরায়ণ দায়িত্বপূর্ণ জীব।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের আর একটা প্রভেদ আছে। মনুষ্য শারীরিক বলে দুর্ব্বল। মানুষের নখে ও দাঁতে ধার নাই ও মাংসপেশীতে জোর নাই। বুদ্ধিবৃত্তি জীবন-সংগ্রামে মানুষের সহায়; কিন্তু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবন ধারণ সহজ কথা নহে। সেই জন্য মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। মনুষ্য একা যাহা পারে না, দল বাঁধিয়া তাহা পারে। এই জন্য মনুষ্যমধ্যে সমাজের উৎপত্তি। অন্যান্য কোন কোন জীবের মধ্যেও সমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়; কিন্তু অন্যত্র যাহার অঙ্কুর, মনুষ্যে তাহা পল্লবিত বৃক্ষ। মুখ্যতঃ সমাজ বাঁধিয়া মনুষ্য জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার জীবত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু এই সামাজিকত্বের উৎপত্তির সহিত তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরম্ভ।

মনুষ্য জীব, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচারপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীব। অন্য জীবের মতই মনুষ্য স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থাৎ জীবনরক্ষার জন্য নিযুক্ত; অধিকন্তু মনুষ্য সমাজরক্ষণেও বাধ্য; কেন না, সমাজরক্ষা না হইলে তাহার জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটা দ্বন্দ্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এইখানে আর একটা নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব। কেন না, ব্যক্তির রক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন; তথাপি ব্যক্তির স্বার্থ সর্ব্বদা সমাজের স্বার্থের সহিত এক হয় না। সমাজ রাখিতে হইলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কতকটা সংহার করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আপনার দিকে চাহিলে চলিবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন ছিল, যখন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের তেমন ভেদ ছিল না; মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ জীবমধ্যে গণ্য হয় নাই, তখন তাহার আপনার সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিলেই চলিত; তজ্জন্য প্রকৃতি তাহাকে যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তির আদেশে চলিলেই তাহার জীবনের কাজ সম্পাদিত হইত। কিন্তু একবার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মানুষের আর ঠিক্ সে অবস্থা থাকে না। মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তিগুলি তাহাকে সমাজের বাহিরে আনিতে চায়; কিন্তু সমগ্র সামাজিক শক্তি তাহাকে সমাজের ভিতরে ধরিয়া রাখে। একটা বল তাহার আত্মজীবনকে কেন্দ্রে রাখিয়া কাজ করে; আর একটা বল তাহাকে সেই কেন্দ্র হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া অপরের দিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত ভাবের সহিত সামাজিকত্বের এইরূপ দ্বন্দ্ব। দুইটার মধ্যে এক রকম সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষকে চলিতে হয়। তাহার পা দুই নৌকায়; এবং দুই নৌকায় যতক্ষণ পা থাকে, জীবনও ততক্ষণ বড় সুখের হয় না।

এই সামঞ্জস্যরক্ষা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোটি-পুরুষ-পরম্পরায় বিকাশপ্রাপ্ত জীবসাধারণ জৈবপ্রবৃত্তিসমুদয় মানুষকে আত্মমুখে ও স্বার্থমুখে প্রেরিত করে; সামাজিক শক্তিসকল তাহাকে অপরের দিকে ও পরার্থমুখে টানিয়া ধরে। জৈব প্রবৃত্তিগুলি প্রবল ও বেগবান্; কোটি কোটি বৎসরে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারা মানুষের প্রাণের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে; তাহাদের প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া চলা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। এই প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক সংস্কার-স্বরূপে জন্মাবধি মানুষকে চালিত করে; মানুষের ক্ষমতা নাই যে, ইহাদিগকে সকল সময়ে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে। অথচ সমাজের জীবন ব্যক্তিজীবনের অপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সমাজের জন্য ব্যক্তিজীবনে স্বার্থসংহার নিতান্তই আবশ্যক। মানুষের জীবত্ব কতকাল হইল স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; তাহার

তুলনায় তাহার সামাজিকত্ব আধুনিক ব্যাপার। এখনও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার সামাজিকত্বের অভিব্যক্তিতে হাত খেলাইবার তেমন অবসর পায় নাই। সামাজিকত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ ও স্ফূর্ত্তি-লাভ করে নাই। এইখানেই মনুষ্যজীবনের প্রধান সমস্যা। এইখানে মনুষ্যত্বের দায়িত্বের সূত্রপাত। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের ভিত্তি-স্থাপন। ব্যক্তিভাব ও সামাজিকত্ব, individualism ও socialism, লইয়া যে ঘোর কোলাহল মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে, এই খানেই তাহার আরম্ভ।

মনুষ্য কি পরিমাণে স্বতন্ত্র থাকিবে ও কি পরিমাণে পরতন্ত্র থাকিবে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক, অথচ মীমাংসার কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতির সর্ব্বত্র যেমন বিধান, এখানেও সেইরূপ। দুই দিকে টানাটানি; বলে বলে, শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ; এক পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত জিতিয়া যায়। জীবনসমরে বাঘের জয় কি ছাগলের জয়, প্রকৃতি এক-বারে মীমাংসা করিয়া দেন না। তিনি জগতে বাঘকে ও ছাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা পুরুষপরম্পরায় মারামারি করিয়া মরুক। শেষ পর্য্যন্ত একের জয় হইবে, অথবা উভয়েই লোপ পাইবে, অথবা উভয়ের রক্তবীজ হইতে উন্নততর জীবের উদ্ভব হইবে। সেইরূপ মানুষের সামাজিক দ্বন্দ্বে ব্যক্তির জয় কি সমাজের জয় হইবে, প্রকৃতি কিছুই বলেন না। মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। ব্যক্তি সামাজিকত্বের সহিত চিরকাল দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকুক; দ্বন্দ্বে ক্রমে উভয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করুক, পুষ্টিলাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক। প্রকৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এইরূপ।

জীবের স্বার্থমূলক প্রবৃত্তিসমূহ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত; মনুষ্য সেই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় চলে, অন্যান্য জীবের মতই চলে।

তাহাদের প্ররোচনাতে চলিয়াই মনুষ্যের সুখ; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের অসুখ। অথচ স্বার্থসংহার আবশ্যক। নতুবা সমাজ থাকে না। সমাজ না থাকিলে আবার দুর্ব্বল মনুষ্যের জীবনও সবল ইতর জীবের সহিত দুরন্ত সমরে ক্ষণেকের বেশী টিকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বার্থসংহার আবশ্যক; কিন্তু স্বার্থসংহার মনুষ্যের জৈব-প্রবৃত্তির বিরোধী; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের সুখ নাই। মানুষকে জোর করিয়া স্বার্থ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। অঙ্কুশাঘাতে ও কশাঘাতে মনুষ্যকে তাহার প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। এই নিবর্ত্তনপ্রণালীর নাম শাসন। রাজ-শাসন, লোক-শাসন, নীতির শাসন, ধর্ম্ম-শাসন, বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা, মানুষকে শাসনে রাখিতে হইবে। কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার; কখন প্রলোভনের উত্তেজনা, কখন বা বিভীষিকার নির্য্যাতনা। রাজদণ্ড হস্তে রাজা বলিতেছেন, আমার আদেশে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত কর, নতুবা বেত্রাঘাত, কারাবাস, প্রাণদণ্ড। সমাজপতি বলিতেছেন, আমার নিষেধ মানিয়া জীবনবৃত্তি নিয়মিত কর, নতুবা সামাজিক নির্য্যাতন, সমাজ হইতে নির্ব্বাসন। ধর্ম্ম-প্রচারক বলিতেছেন, আমার কথা অনুসারে জীবনপ্রণালী সাজাইয়া লও, নতুবা ইহলোকে বা পরলোকে মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজক থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন, আমার আদেশের সম্মান সকলের আগে; নতুবা কুম্ভীপাক তোমার জন্য প্রস্তুত। প্রবৃত্তির উত্তেজনা স্বাভাবিক, তাহা না মানিলে নয়; সমাজের শাসন কৃত্রিম, কিন্তু তাহা না মানিলে সমাজে স্থান হয় না। মানুষের মত দুঃখী জীব কোথায়?

স্বভাবের সহিত কৃত্রিমতার এইরূপ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মনুষ্যজীবন সুখে দুঃখে একরূপ চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতিও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকেন না। ব্যক্তির অভিব্যক্তি যেমন জাতিরক্ষার জন্য আবশ্যক, সামাজিকত্বের বিকাশও সেইরূপ জাতিরক্ষার জন্যই ততোধিক আবশ্যক। সেই

জন্য কতকগুলা কৃত্রিম শক্তির হস্তে সামাজিকত্বের অভিব্যক্তির ভার দিয়া প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী ও বিচার-পরায়ণ জীব। সে অতীতের স্মৃতি রাখে, ভবিষ্যৎ গণিতে পারে। এক পার্শ্বে অতীতের অভিজ্ঞতা, অপর পার্শ্বে ভবিষ্যতের পুরোদর্শন। উভয়ের সাহায্য পাইয়া সে কর্ত্তব্যবিচার করিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানিয়া চলিলে আশু সুখলাভ নিশ্চিত; কিন্তু সমাজের শাসন না মানিলে ভবিষ্যতে বিপদ্। ভবিষ্যতের ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনায় প্রতিফলিত হইয়া আশু সুখের প্রলোভনকে আচ্ছাদিত করে। মনুষ্য তখন প্রবৃত্তির পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গে চলিতে থাকে। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলে? প্রবৃত্তির বেগ উৎকট বেগ; বর্ত্তমান সুখের প্রলোভন তীব্র। মনুষ্যকে পদে পদে পথভ্রান্ত হইয়া সমাজের নিকট তিরস্কৃত হইতে হয়, এবং আপন সর্ব্বনাশের সহকারে সমাজের সর্ব্বনাশও আসিয়া পড়ে। এরূপ বন্দোবস্ত চিরকাল চলে না। স্বভাবের সম্মুখে কৃত্রিমতাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া চিরকাল প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি ধীরে ধীরে কাজ করেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ; যে সমাজে ব্যক্তি যত উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। জীবে জীবে যেমন দ্বন্দ্ব, মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমনি দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিগত পুষ্টি। আবার সমাজের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের সহব্যাপী। ভিতরে যেমন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহিরে তেমনি দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। কোন্ সমাজ দুর্ব্বল? যাহার মধ্যে ব্যক্তির প্রভাব অধিক, সামাজিকত্ব যেখানে জমে নাই। কোন্ সমাজ সবল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত সমাজশক্তির করায়ত্ত। কাহার পরাজয়?

যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজ-জীবনের প্রতিকূল, যেখানে ব্যক্তিজীবন আপনাকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কাহার জয়? যেখানে ব্যক্তি-জীবন সমাজজীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত রাখে। কালে স্বার্থপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সংযত হইতে থাকে; জীবনের পরিধি প্রসরলাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। নিবৃত্তি আসিয়া প্রবৃত্তির বেগ কমাইয়া দেয়। নিবৃত্তিই ক্রমশঃ প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে নিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়; কেন না ব্যক্তিগত নিবৃত্তি ও সংযমের বলে যে সমাজ দৃঢ় হয়, সেই সমাজেরই জয় হয়। নিবৃত্তি ক্রমশঃ কৃত্রিম সমাজশাসনের মুখাপেক্ষা পরিহার করিয়া স্বভাবের বলে বলীয়ান্ হয়। মনুষ্যের অন্তরমধ্যে প্রবৃত্তির পার্শ্বে নিবৃত্তি আসিয়া দেখা দেয়। যাহা আত্মমুখ হইতে নিবৃত্তি, তাহাই পরমুখে প্রবৃত্তি। আত্মমুখী প্রবৃত্তির পার্শ্বে এই নবোদ্গত পরমুখী প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নূতন বলের সঞ্চার হয়। এতদিন মনুষ্যের ইতিহাস জীবের ইতিহাস; আজ হইতে মনুষ্যের ইতিহাস মনুষ্যের ইতিহাস। জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা; জগতের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ।

মনুষ্যের জৈবপ্রবৃত্তি এতদিন তাহাকে স্বার্থসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল; তাহাতেই তাহার সুখ ছিল, তাহাতেই তাহার শান্তি ছিল। সমাজের কৃত্রিম শাসন জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, তাহাকে শাসনে রাখিত, তাহার জীবনের গতি কতকটা পরমুখে লওয়াইত। আজ হইতে তাহার স্বভাবই তাহাকে পরমুখে চলিতে বলে। নূতন একটা প্রবৃত্তি তাহাকে পরের মুখে চালিত করিতে থাকে। এই নূতন প্রবৃত্তি, সমাজ-রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কালসহকারে যাহার বিকাশ, ইহা-কেই মানবিক প্রবৃত্তি বলিতে পার; কেন না, মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবে ইহার অস্তিত্ব নাই। মনুষ্যের ইহাই বিশিষ্টতা। মনুষ্যত্বের ইহাই প্রধানতম

লক্ষণ। ইহারই নাম স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইংরেজিতে বলে, conscience। ইনিই অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ। মনুষ্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে আসিয়া নবাগত অপরিচিতের মত দেখা দেয়, মানুষ তাহাকে ভাল করিয়া যেন চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নূতন। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর হইতে কথা কয়, মনুষ্য তখন স্তম্ভিত হয়; মনুষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তাহার আদেশবাণী মানিয়া চলে। জৈব প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যখন আত্মসুখে চালাইতে যায়, তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্‌গা ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার বেগ সংযত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূন্য; স্বভাব হইতে তাহার উৎপত্তি; পৃথিবীর মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মনুষ্য তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে ভক্তি করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে। মানবের প্রিয়তম সখা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন তোমার অদর্শনে মানব যেন ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আসন গ্রহণ কর। মানবাত্মার সহিত তোমার প্রীতির বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়। জীবনের সমরক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, তুমি দুর্ব্বল মানবরূপী জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞাপালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত, ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত মানব এতদিন মিথ্যা প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা, তাহাকে মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। আজ সে জীবনে শান্তিলাভ করিবে। আজ তাহার জীবনে দুঃখের রজনী পোহাইবে।

রাজশাসন ও লোকশাসন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, মনুষ্যসমাজে কতকাল আধিপত্য করিয়াছে; জীবধর্ম্মা মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে

সংযত রাখিবার জন্য এতদিন তাহাদের আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও মনুষ্যসমাজ এমন অভিব্যক্ত হয় নাই, এখনও মনুষ্য-প্রকৃতি এমন পুষ্টিলাভ করে নাই যে, সেই সকল কৃত্রিম শাসনের কাল্পনিক আশার ও কাল্পনিক বিভীষিকার প্রভুত্বের আর প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি মনুষ্যের প্রতি দয়াপরা; ব্যক্তির জীবনের প্রতি না হউক, জাতীয় জীবনের প্রতি সদয়া। কৃত্রিমতার স্থানে স্বভাবের প্রভুত্ব স্থান পাইবে। কল্পনার স্থানে সত্য আসিয়া শোভা পাইবে। জৈব প্রবৃত্তি এতকাল মানুষকে চালাইয়াছে, এখন মানবিক প্রবৃত্তি মানুষকে চালাইবে। অন্তরমধ্যে—উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুদিন ধরিয়া অনিবার্য্য। ততদিন ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ, পাপের সহিত পুণ্যের সমর। প্রকৃতির খেলায় এই দ্বন্দ্বের ফলে মানবিক প্রবৃত্তির বিকাশ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভ্যুদয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ। প্রবৃত্তির আদেশপালনে সুখ। জৈব প্রবৃত্তির আদেশপালনে এতকাল মনুষ্যরূপী জীবেরও সুখ ছিল; কিন্তু মানবিক প্রবৃত্তির আদেশ পালনেই কি সুখ জন্মিবে না? এই মানবিক প্রবৃত্তি পরার্থমুখী; এই প্রবৃত্তির আদেশে পরার্থপালনেই মানব সুখ পাইবে। মনুষ্য সুখান্বেষী রহুক, ক্ষতি নাই; এতদিন স্বার্থসাধনে তাহার সুখ ছিল, এখন পরার্থসাধনেই তাহার আনন্দ জন্মিবে।

এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবে; উভয়ে যখন মিশিয়া এক হইয়া যাইবে? স্বার্থসাধনে যখন পরার্থে ব্যাঘাত পড়িবে না, পরার্থসাধনে যখন স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে। মানুষ এখন যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বভাবের অঙ্কুশ তাড়নায় আত্ম-সুখান্বেষণে রত থাকে, তখনও সেইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। ব্যাঘ্রী যেমন স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ

সমর্পণ করিয়া সুখলাভ করে, মানুষও তখন কেবল আপন শিশুর জন্য নহে, আপন পিতা বা ভ্রাতা বা বান্ধবের জন্য নহে, দূরস্থিত অপরিচিত মনুষ্যের হিতের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিবে। পরই তখন আপন হইবে, আত্মপরে তখন বিভেদ থাকিবে না। সন্তান পিতামাতার অঙ্গীভূত, ফল যেমন বৃক্ষের অঙ্গীভূত। সন্তান পিতামাতার পক্ষে পর নহে, শাখাও যেমন বৃক্ষের অনাত্মীয় নহে। মনুষ্য-সমাজে ছোট বড় যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলেই এক প্রকার মানব জাতিরূপ মহা অশ্বত্থের শাখাভূত অঙ্গমাত্র। আপন পর কোনও বিভেদ নাই। পরার্থে ও স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ; পরার্থান্বেষণে কেনই বা সুখ না হইবে?

যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গল কোন্ কাজে? কে বলিয়া দিবে কোন্ কাজে? এখানে মনুষ্যের বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস নাই। ক্ষতিলাভগণনা সহজ কাজ নহে; সামাজিক গণিতশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে এখনও অনেক সময় আবশ্যক। সমাজের মঙ্গলে ধর্ম্ম; এবং সমাজের মঙ্গলের অর্থ greatest good of the greatest number, অধিক লোকের অধিক হিত। ইউটিলিটি তত্ত্ব এই অর্থে ঠিক্। কিন্তু কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত, কে গণনা করিয়া নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে? বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস করিও না; বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিও না। সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর কর, সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। তাহার নির্দ্দেশে অন্তঃশরীর স্বাস্থ্যলাভ করিবে; জীবন বললাভ করিবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে প্রকৃতি তোমার প্রতি নিষ্ঠুর; কিন্তু তিনি তোমার যশঃ-

শরীরে দয়ালু। প্রকৃতি তোমার যশঃশরীর রক্ষা করিবেন। তুমি তাঁহার আদেশ পালন কর।

রাজা দিলীপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলেন; ইউলিটিতত্ত্বে নির্ভর করিয়া ক্ষতিলাভগণনায় তিনি সাহসী হয়েন নাই। মায়াসিংহের নিকট তিনি বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু মনুষ্যের সমাজজীবন যতদিন অভিব্যক্তির অভিমুখ, ততদিন সুস্থ সবল মানবাত্মা এইরূপ বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইবে না।

আচার।

মনুষ্যসমাজের, বিশেষতঃ ভদ্রসমাজের ও সভ্যসমাজের, নিয়ম অতি বিচিত্র; এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার উপায় নাই। যে কাজে ইচ্ছা নাই, তাহা করিতে হইবে; আর যাহাতে ইচ্ছা আছে, তাহার সম্পাদন নিন্দনীয় হইবে। বিবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন্ধনে আমাদিগকে সর্ব্বদা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। এই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামাজিক বন্ধনের সাধারণ নাম আচার। বাঙ্গলা কথা ইংরেজিতে ব'ললে আমরা অনেক সময় ভাল বুঝি। আচারের ইংরেজি নাম ceremony.

সভ্যসমাজে এই সকল আচারের সংখ্যা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে না, ও ইহাদের বৈচিত্র্যেরও ইয়ত্তা নাই। জীবনের মধ্যে যে সকল কার্য্য প্রকৃতির আদেশে বা প্রয়োজনের অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদান করিতে হয়, আর যে সকল কার্য্য সমাজের আদেশে কৃত্রিম অভাব পূরণের জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাকে পাশাপাশি তুলনা করিলে কোন্ দিক্‌টা গুরুত্বে অধিক হইয়া পড়ে, তাহা বলা খুবই কঠিন।

এই সকল আচারের প্রধান লক্ষণ যুক্তিহীনতা। এ পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিতে সামাজিক আচারের সমর্থনের জন্য বিবিধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন যুক্তিটাই কাজের বলিয়া বোধ হয় না।

মনে কর ভদ্র সমাজের একটা নিয়ম আছে যে, কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিতে হইবে। এই স্থলে নমস্কার একটা আচার এবং ইহা দ্বারা নিয়ম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মবশে অনেক সময়ে মানসিক ভাব বাহ্য ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। আনন্দে আমাদের হাসি পায়,

দুঃখে কান্না আসে, রাগে শরীর কাঁপে, ইত্যাদি উদাহরণ। কিন্তু এই সকল শারীরিক বিকার স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। এই সকল শারীরিক বিকৃতির উপর আমাদের ততটা কর্তৃত্ব নাই। বৃক্ষস্থিত ফলের ভূতলে পতনের প্রবৃত্তি যেমন স্বভাবের নিয়মের অনুযায়ী, ঐ ফল সম্মুখস্থ হইলে উহার রসনেন্দ্রিয়কে আর্দ্রীকরণের শক্তিও ঠিক সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সুতরাং উভয় ব্যাপারই বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য ও বিচার্য্য। কিন্তু নমস্কার প্রথার সহিত বিনয় ও শ্রদ্ধা নামক মানসিক ব্যাপারের ঐরূপ কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেন না আমরা সম্পূর্ণ বিসদৃশ উপায়েও শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও বিনয়প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকি এবং ইহাও অপ্রসিদ্ধ নহে, যে বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত অতিভক্তি অনেক সময় চোরের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ফল কথা, ললাট ও অঙ্গুলিপ্রান্তের মধ্যগত ব্যবধানের সহিত কোনরূপ আন্তরিক মানসিক ভাবের নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে, তাহা কোন বিজ্ঞানই স্বীকার করিতে চাহিবে, এরূপ ভরসা হয় না।

প্রথাটা স্বাভাবিক নহে, এবং উহাতে কোনরূপ লাভ বা উপকারও নাই। কি ইহকালে, কি পরকালে। তবে করাঙ্গুলির স্পর্শে ললাটমধ্যে কোনরূপে ইলেক্‌ট্রিসিটি সঞ্চারের সাহায্য হয় কি না, তাহা জানি না।

আমরা এই সামাজিক প্রথাকে একটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক যুক্তিহীন অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়াই গ্রহণ করিব। ইহাতে লাভ নাই; পরন্তু প্রভূত লোকসান আছে। কলিকালে ইংরেজিনবিশদের নিকট বিনয়প্রকাশের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে তত অসুবিধা নাই বটে; কিন্তু সত্যকালের অনুমোদিত দণ্ডবৎ প্রণাম বা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ব্যাপারটা বস্তুতই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মেরুদণ্ডের পক্ষে স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। আবার সমাজের অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর দাঁড়াইয়াছে যে এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানের সম্পাদনে অভ্যাগতের তৃপ্তিসাধন যতটা না হউক, অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি অনেক

সময় অতৃপ্তি ও অশান্তি, মনোভঙ্গ ও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এ কথাটা আপাততঃ সামান্য মনে হইলেও ফেলিবার নহে। সংসারতাপক্লিষ্ট ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে রোগশোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসন কিছুরই ত অভাব নাই; তাহার উপর আর কতকগুলি বন্ধনের ও পরিতাপের কারণ সৃষ্টি করিয়া সংসার-যাতনা বাড়াইলে, বিশেষ কি লাভ হইল, বুঝি না।

আরও একটা গুরুতর দোষ আছে। শ্রদ্ধা, বিনয়, প্রীতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি মনুষ্যহৃদয়ের অতি আদরের সম্পত্তি। সংসারমধ্যে বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও বাহ্য সম্পদের ততটা অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু এই সকল আন্তরিক সম্পত্তির প্রকৃতই বড় অভাব। এত অভাব যে ইহাদের অযথাস্থলে ও অপাত্রে বিতরণ নিতান্তই স্পৃহণীয় নহে। আবার ইহ-সংসারে খাঁটি অপেক্ষা মেকির প্রচলন এত অধিক যে, যে কোন স্থানে খাঁটি জিনিষের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সংসারের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সেইখানেই যেন লক্ষ্মী আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্যহৃদয়ে পরম আদরের মহার্ঘ সম্পত্তির অপাত্রে বিন্যাস যেমন কষ্টের কারণ, সেইরূপ খাঁটির জায়গায় মেকির প্রচলন আরও যাতনাপ্রদ। আবার অকৃত্রিম জিনিষকে কৃত্রিম অলঙ্কারে শোভিত করিয়া যদি অবিশুদ্ধ কৃত্রিমের পাশে স্থান দিতে হয়, এবং উভয়েরই যদি সমানদরে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। এই কারণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রীতি, অকৃত্রিম বিনয় সর্ব্বদা আত্মগোপনই অভ্যাস করে, আপনাকে জনসমাজে জাহির করিতে চাহে না; বাহ্য কৃত্রিম অস্বাভাবিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে আপনাকে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে ও অবমাননা বোধ করে। যক্ষের ধনের মত চিরকাল জনসমাজের চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে নিহিত থাকিতেও বরং সম্মত হয়, কিন্তু বিপণি সাজাইয়া লোক ভুলাইতে একান্তই কুণ্ঠিত থাকে।

ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, যে সংসারে যেখানে যতটা প্রেম, সেখানে

ততটাই কৃত্রিম আড়ম্বরের অভাব, এবং যেখানে আড়ম্বরের মাত্রাধিক্য, সেইখানেই চাতুরী ও প্রবঞ্চনা। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার নিকট কৃত্রিম অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। যেখানে কৃত্রিম অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, সেইখানেই ভালবাসার বিশুদ্ধিও সন্দেহজনক।

আন্তরিক ভাবের সূচনা ও প্রকাশ বাহ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইলেও ফলে তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। ভাবগোপনের জন্যই যেন আচারের সৃষ্টি ও ব্যবহার প্রচলিত। তোমাকে আমি দুটি চক্ষে দেখিতে পারি না; অথচ সামাজিক নিয়মের খাতিরে পত্র লিখিবার সময় আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য সাজি। তোমার প্রতি আমার বিজাতীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা মনে থাকিলেও আমি তাহা লৌকিক আচারের আবরণ মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লোকের চোখে ধূলা দিই।

এই একটা সামান্য উদাহরণেই আচারের স্বভাব কতকটা বোঝা গেল। আচার অর্থশূন্য, যুক্তিহীন; ইহাতে উপকার নাই, ক্ষতি আছে; ইহা অকারণে স্বাধীনতা সংহার করে ও বন্ধনস্বরূপ হয়; ইহা অকারণে সংসার-যাতনা বাড়ায়; ইহা সত্যগোপন ও প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়; এবং কৃত্রিম হইয়াও অকৃত্রিমের সমান আসন লইতে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সহস্র উদাহরণের সংগ্রহ চলিতে পারে। সর্ব্বত্রই এক ভাব; আচারমাত্রই বুঝি অস্বাভাবিক, অর্থহীন ও কৃত্রিম, অপিচ সহস্র স্থানে ছলনার ও প্রবঞ্চনার অনুকূল। অথচ মনুষ্যজীবনে, বিশেষতঃ উন্নত মানবজীবনে, আচারের শাসন বোধ হয় প্রকৃতির শাসনকেও পরাজয় করে। বরং দুইদিন অনাহারে থাকিতে পারি, অথচ সমাজের কৃত্রিম নিয়ম লঙ্ঘন করিবার যো নাই। এমনি দুরন্ত শাসন। আর সেই শাসনের এলাকাই বা কত বিস্তৃত। মনুষ্যজীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার, যখন সাধারণের চোখের আড়ালে থাকিয়া নিজের ইচ্ছামত দুটা কাজ

করি বা দুটা কথা কহি। সমাজ তাহা দিবে না। একদণ্ড নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া আপনাকে আপনার নিকট খুলিয়া দেখিতে অবকাশ পাই না। অষ্টপ্রহর মুখোস পরিয়া কোটি লোকের সমক্ষে নৃত্য করিতে হইবে। আবার নর্ত্তনের সময় চরণ দুখানি শিকলে বাঁধা থাকিবে। কি সুন্দর বন্দোবস্ত !

আপনার আহারনিদ্রাদি নিত্যানুষ্ঠেয় ব্যাপার সম্পাদনের সময়ও সমাজের হুকুম বাহির হয়—এমনি করিয়া খাও, এমনি করিয়া শয্যা রচনা কর। অথচ আমাকে অন্নাভাবে উপবাসী থাকিতে হইলে পৃথিবীর দেড়শত কোটী লোকের মধ্যে একজনেরও মাথাব্যথা হয় না; এবং আমাকে শয়নের জন্য হট্টমন্দির অনুসন্ধান করিতে হইলেও আমার কোন প্রতিবেশীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। শুধু শারীরিক ব্যাপারে নহে; আমার জীবনের যে সকল ঘটনা আমার নিকট অত্যন্ত পবিত্র, নিঃসম্পর্ক জনসমাজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, বরং তাহাদের হস্তার্পণে আমার আত্মা ব্যথিত ও ম্রিয়মাণ হয়, সেখানেও জনসমাজ আমাকে ছাড়িবে না। পত্নী পতির জন্য, পুত্র পিতার জন্য, মাতা সন্তানের জন্য শোক করিবে; সমাজ শোকসম্বন্ধে কতকগুলি রেগুলেশন বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রণয়ী আপনার বাঞ্ছিতের সহিত জীবনব্যাপী সম্বন্ধে মিলিত হইবে; সমাজ তখনি চাপরাস ও ইউনিফর্ম লাগাইয়া খাতাপত্র বগলে লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। সংসার-যাতনায় আকুল হইয়া একবার বিজনে বিধাতাকে ডাকিতে চাহিব; সমাজ অমনি প্রার্থনার ফারম্ পূরণের জন্য কালীকলম লইয়া হাজির। এও কি সহ্য হয় ?

মনুষ্য কাজেই বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না। জরামরণের ন্যায় বিকট সত্য সম্মুখে থাকিতে মিথ্যা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে, প্রকৃতি-বিহিত বিবিধ শৃঙ্খল বর্ত্তমান থাকিতে অকারণে নূতন শিকল গড়াইতে,

মনুষ্য সকল সময়ে চাহে না। শাসন দুরন্ত; কাজেই বিদ্রোহে সাহস আবশ্যক। কিন্তু এই অধম মনুষ্যসমাজেও এমন এক একটা মানুষ সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করে, যাহার মেরুদণ্ড সমাজপ্রেরিত লৌহমুদ্গারে ভাঙ্গিতে পারে না, যে সমাজের রচিত শৃঙ্খল জোরের সহিত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, কৃত্রিম মুখোস ঘৃণার সহিত নিক্ষেপ করিয়া, স্পর্দ্ধার সহিত নির্ভীকচিত্তে নিরাবরণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ঋজুপথে চলিতে চাহে। কবির ভাষায় তিনি পুরাতন অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিয়া মুক্ত হয়েন ও অপর সাধারণকে মুক্তি দেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির অনুকরণে সাহসী হই না; প্রকাশ্যে বিদ্রূপবাদের ও নিন্দাবাদের দ্বারা তাঁহার পুরোগমনে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া শার্দ্দূলের পশ্চাদ্বর্ত্তী জম্বুকের বৃত্তি অনুকরণ করি ও অন্তরে ভয়ের সহিত তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকি।

সবই সত্য। আমরা দুর্ব্বল ও ভীরু ও হীনজীবী, অতএব দয়ার যোগ্য। মহৎ ব্যক্তির অনুকরণেও আমরা সর্ব্বদা অসমর্থ। কিন্তু সংসারের সকল মনুষ্যই কি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রেণীরই অন্তর্গত; এবং দুর্ব্বলের পক্ষে কি দুটা কথা খুঁজিয়া বাহির করা একেবারেই অসম্ভব? আমরা সমাজভয়ে মিথ্যাচারী ও কৃত্রিমাচারী। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই কৃত্রিমতার পক্ষে দুটা কি বলিতে পারা যায় না?

উপরে বলিয়াছি যে সামাজিক প্রথাসমূহ অর্থশূন্য। উদাহরণস্বরূপ দেখান গিয়াছে যে, যে একটা নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ইঙ্গিত অভ্যাগতের সম্ভাষণকালে বিনয়প্রকাশের জন্য বর্ত্তমানকালে ব্যবহৃত হয়, সেই ইঙ্গিতের সহিত সেই মানসিক বৃত্তির কোনরূপ নৈসর্গিক সম্বন্ধ খুজিয়া পাওয়া যায় না। মস্তক নামাইলেই বিনয় প্রকাশ হইবে, এ কিরূপ বিধান? উভয়ের মধ্যে যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে, তাহা কল্পিত সম্বন্ধ বা আরোপিত সম্বন্ধ। দশে মিলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে, এইরূপ আচরণ ঐরূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; মাথা নোয়াইলেই বিনয়প্রকাশ হইবে। তাই

আমরা দশের নির্দ্ধারিত আচার মানিয়া চলি; দশের কথা না মানিলে সমাজের নির্য্যাতন ভুগিতে হয়।

কথাটা সত্য বটে, আবার সম্পূর্ণ সত্যও নহে। কেন না ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া এমন দিন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় না, যেদিন দশজনে একত্র পরামর্শ আঁটিয়া এই অপরূপ অস্বাভাবিক প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রত্যুত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানব-সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থায় এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তখন ইহা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য বা নিষ্প্রয়োজন ছিল না।

দুর্ব্বলের পৃষ্ঠের প্রতি সবলের চরণযুগলের বেগে পতনপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান-কালেও না আছে তাহা নহে, তবে মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থায়, যখন পুলিশের ও আইনের এতটা আঁটাআঁটি ছিল না, তখন এই পতনের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই ঘটিত। সবলের চরণ দুর্ব্বলের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ বেগের সহিত প্রযুক্ত হইলে দুর্ব্বলের শরীরের ভারকেন্দ্র আপনা হইতেই ভূতল অন্বেষণে তৎপর হয়, ইহা পদার্থবিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই শরীরের ভারকেন্দ্রের অবনতির সহিত দৌর্ব্বল্যের ও অধীনতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে নিতান্ত অর্থশূন্য বা অনৈসর্গিক বলিতে পারা যায় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি সবলের দর্শনমাত্রেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভারকেন্দ্রটাকে নামাইয়া যদি গোঁড়াতেই অবনতি স্বীকার করিয়া লয়, তাহার এই কার্য্যটা জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব প্রণিপাত আচরণ এককালে স্বাভাবিক ও সার্থক ও আবশ্যক ছিল। কালের কুটিল চক্রে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। একালে দুর্ব্বলের প্রতি এরূপ আচরণ প্রয়োগ করিতে গেলে পাহারাওয়ালা আসিয়া বিসংবাদী হয়। বলা বাহুল্য, সেকালের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের বর্ত্তমানকালোচিত কৃত্রিম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নমস্কার।

অতএব স্বীকার্য্য যে কৃত্রিম সামাজিক প্রথারও একটা ঐতিহাসিক স্বাভাবিক মূল আছে। একালের সমাজ-তাত্বিকগণ মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সামাজিক প্রথার মূলে বিবিধ বিচিত্র তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন। এইরূপ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আবিষ্কৃত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই লোমহর্ষক। পরস্পর অধরোষ্ঠের সম্মিলন প্রণয়াস্পদের প্রতি অনুরাগপ্রকাশের প্রধান উপায় বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কবিকুল শুনিয়া শিহরিবেন যে কোন কোন আধুনিক সমাজতাত্বিকের মতে এই অনুরাগপ্রকাশের প্রথাটা মনুষ্যের পুরাকালের নরমাংসপ্রিয়তার অর্থাৎ রাক্ষসভাবের শেষ নিদর্শন মাত্র। অর্থাৎ একের ফুল্লরক্তবিম্বাধর যখন অপরের ফুল্লরক্তবিম্বাধরে সানুরাগে অর্পিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ইনি উঁহাকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন, আহা, তোমার কাঁচা মাংস না জানি কেমন কোমল ও স্নিগ্ধ, কেবল পুলিশের ভয়ে চিবাইতে পারিতেছি না।

সামাজিক আচারগুলি বর্ত্তমানকালে যতই অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক হউক না কেন, এককালে হয় ত উহারা অর্থযুক্ত ও অত্যাবশ্যক ছিল। তবে একালে সে অর্থও নাই, সে প্রয়োজনও নাই।

বস্তুতঃ মানবপ্রকৃতিতে স্থিতিপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল মাত্রায় বিদ্যমান আছে। মনুষ্য পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; নবীনের যতই প্রলোভন ও যতই আকর্ষণ থাক্, মানুষ পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিত নূতনকে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত আশঙ্কা করিয়া থাকে। ইহা মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্ব্বলের জীবনরক্ষার জন্য এইরূপ সাবধানতা নিতান্ত আবশ্যক। অরণ্যমধ্যে সিংহশার্দ্দূল নির্ভয়ে বিহার করে, কিন্তু দুর্ব্বল মৃগশিশু সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকে। প্রকৃতি তাহাকে শার্দ্দূলমুখরোচক কোমল ললিত বপুখানি যেদিন দিয়াছেন, সেই দিনই তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল চরণ ও সচকিত অন্তঃকরণ

প্রদান করিয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মনুষ্য স্বভাবতই দুর্ব্বল। অপরিচিতের সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতিতে সে সহসা সাহসী হয় না। কাজেই সে পরিচিত পুরাতনকেই চিরকাল জড়াইয়া থাকিতে চাহে। সেই জন্য মনুষ্যপ্রকৃতিতে একটা স্থিতিপ্রবণতা বিদ্যমান; সেই জন্যই মানুষের নিকট প্রাচীনের এত আদর। মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাস মনুষ্যকে গঠিত করিয়া বর্ত্তমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মনুষ্য সেই ইতিহাসের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় মাত্র, স্বয়ং বলপ্রকাশ পূর্ব্বক স্রোতকে ঠেলিয়া অগ্রগামী হইতে সাহসী হয় না। তাহাকে দুর্ব্বল বল, ক্ষতি নাই; কেননা তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাকে দয়া করিও।

কাজেই আবহমান কাল হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমানকালে তাহার উপযোগিতা আছে কি না, তাহা মানুষে ভাল করিয়া দেখিতে চাহে না; অথবা অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন হইলেও তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া নূতনের আশ্রয়গ্রহণে সর্ব্বদা সাহসী হয় না।

যে সকল পুরাতন অনুষ্ঠান আবহমান কাল হইতে সমাজমধ্যে আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সমাজশরীরের রক্তমাংসের, অস্থিমজ্জার এরূপ একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরাতনে মন্দ হইতে পারে, কিন্তু নূতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাতনে অর্থ দেখিতে পাইতেছি না; উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষতি নাই,—এত কাল ত একরকমে চলিয়া আসিতেছে, এখনও চলিতে দাও।

সামাজিক আচার, যুক্তিহীন ও অর্থশূন্য, তাহা স্বীকার করা গেল, এবং দুর্ব্বল মনুষ্য তাহার জীবন রক্ষার অনুরোধে আশঙ্কাবশে সেই পুরাতন আচার ছাড়িতে চায় না, তাহাও স্বীকার করা গেল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি

কৃত্রিম পদার্থকেও মানুষ কোন কাজেই লাগাইতে পারে না ? একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

মনে হইতেছে হার্বর্ট স্পেনসার এক স্থলে বলিয়াছেন, মানুষের এককালে যাহা জীবনমরণের সামগ্রী থাকে, পরবর্ত্তীকালে তাহা খেলার জন্য ব্যবহৃত হয় ; যাহা এককালে আতঙ্কের বিষয় থাকে, পরবর্ত্তী কালে তাহার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য বিনিয়োগ ঘটে। এককালে নেপোলিয়নের জীবন্ত মূর্ত্তি ইউরোপবাসীর আতঙ্কজনক ছিল, কিন্তু ভাস্কর ও চিত্রকর মৃত নেপোলিয়নের মূর্ত্তি আপন আপন সুকুমার কলার বিষয় করিয়া ইউরোপবাসীর আনন্দবর্দ্ধনে নিযুক্ত আছে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে একদা ইউরোপের সভ্যতার নিয়তি পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের চিত্রপট বৈঠকখানার দেওয়াল সাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমাজতত্ত্বের গবেষণাদ্বারা আধুনিক সামাজিক প্রথার ও আচার অনুষ্ঠানের সেকালের পক্ষে সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইতে পারে ; এককালে হয় ত সমাজ-রক্ষার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান নিতান্তই আবশ্যক ছিল, কিন্তু একালে সে আবশ্যকতা নাই। আমার বোধ হয় আধুনিক কালে তাহাদের প্রধান উপযোগিতা জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য ও আনন্দের বর্দ্ধন। একালে তাহা অর্থশূন্য ; কিন্তু এই অর্থশূন্যতাতেই উহার আনন্দবর্দ্ধনে ক্ষমতা। একটা মোটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক।

বস্ত্রব্যবহারের সহিত মনুষ্যের স্বাস্থ্যের তেমন নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই, ইহা আণ্ডামানের আদিম অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। সরলচিত্ত লোকে নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, আমাদের দেশের দারুণ গ্রীষ্মের সময় এই সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অর্থশূন্য আচারের কতকটা শৈথিল্য হইলে নিতান্ত মন্দ হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য না হউক, লজ্জা নামক একটা মনোবৃত্তির অনুরোধে এই আচার আমাদিগকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু এই লজ্জাটাই কি নিতান্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি

নহে ? এবং এই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বৃত্তির অনুরোধে যে প্রথার প্রচলন ঘটিয়াছে, তাহাও কি একবারে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যুক্তিবিবর্জ্জিত নহে ? অন্ততঃ খ্রীষ্টানেরা মানিবেন, যে সৃষ্টির দিনে বিধাতা মানবদম্পতীকে এই লজ্জাবৃত্তি দেন নাই।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে নিতান্ত অনাবশ্যক বস্ত্র নিতান্ত আবশ্যক অন্নের সহিত এক শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ; বরং অন্ন বিনা চলে, কিন্তু বস্ত্র বিনা অচল হয়। এই হতভাগ্য অন্নহীন দেশের অধিবাসীদের জঠরজ্বালা চিরদিনই জ্বলিতেছে, অথচ এই যুক্তিহীন আচারের অনুরোধে নিত্যদুর্ভিক্ষপীড়িতের অন্নরাশি বস্ত্রের বিনিময়ে মাঞ্চেষ্টারের উদরপোষণে ব্যয়িত হইতেছে। কথাটা নিতান্ত তামাসার নহে।

বস্ত্রব্যবহার প্রথার ঔচিত্যসম্বন্ধে কোন সমাজসংস্কারক কোনরূপ প্রস্তাব করিবেন কি না জানি না ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সম্প্রতি এই প্রথা উঠাইবার প্রস্তাব করিলে স্থিতিপ্রবণ মনুষ্যসমাজে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইবে। কেন হইবে ? উত্তরে বলিব যে, যে কারণেই হউক, নিরাবরণ নরদেহ আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির প্রতি নিতান্ত নির্ম্মমভাবে আঘাত দেয় ; এবং মনুষ্যের এই সৌন্দর্য্যবোধের খাতিরে যে জঠরজ্বালাকেও পরাজিত হইতে হয়, মনুষ্যত্বের সহিত পশুত্বের এইখানেই বিভেদ। মনুষ্য যদি আপনার মনুষ্যত্ব রাখিতে চায়, তাহা হইলে এই সৌন্দর্য্যবোধকে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না।

জ্ঞানের চক্ষে সুন্দরে ও কুৎসিতে কোন ভেদ নাই ; এবং এমন কোন স্বাভাবিক লক্ষণ নাই, যাহাদ্বারা এইটা সুন্দর এবং স্পৃহণীয় ও এইটা কুৎসিত ও পরিত্যাজ্য, বিচার দ্বারা এইরূপ শ্রেণিবিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন একটা জিনিষ সুন্দর কি কুৎসিত, তাহা সেই জিনিষের স্বভাবের উপর যতটা নির্ভর করে, দর্শকের মানসিক প্রকৃতির উপর তদপেক্ষা অধিক নির্ভর করে। আমি চেষ্টা দ্বারা কুৎসিতকে সুন্দর

করিয়া লইতে পারি। রসায়ন শাস্ত্র এপর্য্যন্ত লোহাকে সোণায় পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু মানবচিত্ত অবলীলাক্রমে কুৎসিতের কদর্য্যতা দূর করিতে সমর্থ হয়। এই আধ্যাত্মিক রসায়নের প্রয়োগে যে যত পটু, মনুষ্যপদবীতে সেই তত উন্নত। এইখানেই মনুষ্য ও মনুষ্য পশুর মধ্যে প্রভেদ। মনুষ্য-জীবনের প্রধান কার্য্যই জগৎকে সুন্দর করিয়া লওয়া। যে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়ে, তাহার শিল্পচাতুরীর প্রশংসা করি না; এবং যে বিরাগীর দল জগতের বিরূপতা ও বীভৎসতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে মানব-জাতির শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিব।

কালিদাস হিমালয়ের সৌন্দর্য্যবর্ণনা লইয়া তাঁহার মহাকাব্যের আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি যুক্তি দ্বারা এই সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার মহাকাব্যের অবস্থা শোচনীয় হইত সংশয় নাই। অমুক জিনিষটা আমাকে ভাল লাগিতেছে; তোমার ভাল লাগে না, ইহা তোমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু যুক্তিদ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য প্রতিপাদন আমার ক্ষমতার অতীত। সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র যুক্তিহীন। ভূতত্ত্ববিদের নিকট হিমালয় ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত শতধা বিদীর্ণ ও জীর্ণ পাষাণরাশির কঙ্কালমাত্র; পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে হিমালয়কে ব্যবহার করিতে তাঁহার আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু গোরূপী ধরিত্রীর বৎসরূপে হিমালয়কে কল্পনা করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিবেন। ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য।

নরদেহকে অনাবশ্যক বসনভূষণে সজ্জিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে; কেন বাড়ে তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না।

মনুষ্যসমাজের যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক আচার ও অনুষ্ঠান এক্ষণে সমাজের হিতকল্পে আবশ্যকতারহিত হইয়াও বর্ত্তমান আছে, তাহাদেরও পক্ষে কোন যুক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। এখন তাহাদের প্রধান কাজ জীবনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন। মনুষ্যের দুর্ভাগ্য এই যে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে গেলে অনেক সময়ে কৃত্রিম ছদ্মবেশের ছলনা আসিয়া উপস্থিত হয়

এবং অলঙ্কারের শোভার সহিত অলঙ্কারের ভার দুর্বহ হইয়া পড়ে। সংসারের বন্ধুর পথে কৃত্রিম ভার ও কৃত্রিম বন্ধন মনুষ্যের গতিকে পদে পদে ঠেকাইয়া দেয়। এই সকল কৃত্রিম বন্ধন সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীন গতিকে সময়ে সময়ে এমন ব্যাহত করে, যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সমস্ত সমাজবিধান চূর্ণ করিয়া মানবিকতাকে নিরাবরণ পাশবিকতায় পরিণত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন।

বাস্তবিক পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্যসমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোনরূপ কৃত্রিম আচারের দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা প্রশংসা-পত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুটিনাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্তই এই মনুষ্যসমাজেই বর্ত্তমান।

কিন্তু এই সকল খুটিনাটি, এই সকল বন্ধন যতই কষ্টের কারণ হউক না, ঐ শ্রেণীর সমাজতাত্ত্বিকের উপদেশমতে ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে একবারে সেই প্রাচীন সত্যযুগ আসিয়া পড়িবে, যখন মানবের আদিম বৃদ্ধপিতামহগণ সচ্ছন্দমনে বনস্পতির শাখায় শাখায় লম্ফ প্রদান করিয়া অনুপম হর্ষানুভব করিতেন। কিন্তু হায়, প্রকৃতির যুগব্যাপী চেষ্টার ফলে পুচ্ছদেশবিলম্বী সুদীর্ঘ কর্ম্মেন্দ্রিয়টির সহকারে সেই আদিম হর্ষানুভবও লোপ পাইয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগের বিধানে মানবের স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা বিবিধ কৃত্রিম বন্ধন দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমরা এই সকল কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনেক কষ্ট ও অনেক মনোহানি সত্ত্বেও এই কৃত্রিমতাই আমাদের মনুষ্যত্বের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার উঠাইয়া দিলে মানবসমাজ একেবারে পশুসমাজে পরিণত হইবে। স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে।

আমার বোধ হয় এই কারণেই সমাজের সর্ব্বত্রই কৃত্রিমতার এত বন্ধন। প্রতিবেশীর সহিত, নিতান্ত অন্তরঙ্গের সহিত, এমন কি নিজের প্রতি ব্যবহারেও প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য সমাজকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসারে সংযত করিয়া লইতে হয়; নতুবা শোভন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন আপন রুচি ও ইচ্ছানুসারে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহে, তাহাতে শৃঙ্খলা থাকে না, শোভা থাকে না, সমস্তই বিপর্য্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি আবশ্যক, ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে চলে না। মানবপ্রকৃতির স্থিতি-প্রবণতা বিনায়াসে এই সকল নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। আবহমান কাল হইলে আচরিত প্রথার প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক ভক্তি মনুষ্যকে কোথায় কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দেয়।

এই দীর্ঘ সন্দর্ভে পল্লবিত বাক্যের আড়ম্বর দ্বারা আমি কেবল একটা মোটা কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, সে কথাটা সংক্ষেপে বলিলে এই দাঁড়ায়। সামাজিক আচারের প্রধান উপযোগিতা সামাজিক মানব-জীবনের শোভাবর্দ্ধন। আচারের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে, আরম্ভেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখনও আমি বলিতে চাহি না যে, সে সকল যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতই আচারানুষ্ঠান অনেক সময়ে স্বাধীনতা সংহার করিয়া জীবনের ভারস্বরূপ হয়; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অলঙ্কারমাত্রই এক হিসাবে ভারস্বরূপ। অলঙ্কারব্যবহারে স্বাস্থ্যের কোন উপকার নাই, পরন্তু বোঝা বহিবার ক্লেশ আছে। আচারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আচারের অনুরোধে কৃত্রিমতার বৃদ্ধি হয়; কৃত্রিমতায় সত্যগোপন ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অলঙ্কারের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছলনা ও সত্য গোপন। আমার দেহে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই, সেই সৌন্দর্য্য, লোকনয়নে দেখাইবার জন্য আমি কৃত্রিম

অলঙ্কারের আশ্রয় লই। আমার শরীরে যে বিকৃতি ও বিরূপতা বর্ত্তমান, তাহাই গোপনের জন্য বসনভূষণের আশ্রয় লইয়া থাকি। অলঙ্কার মাত্রেরই এই অপবাদ দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি মনুষ্যদেহের বিরূপত্ব আমাদিগকে আচ্ছাদন না করিলে চলে না; কৃত্রিম অলঙ্কার দ্বারা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনও আবশ্যক হয়। স্বাভাবিক বলে বলীয়ান্ ব্যক্তি অলঙ্কারের বোঝা বহিতে ঘৃণা করিতে পারে, তাহা সঙ্গত কথা; সেইরূপ যে মহাত্মার জীবন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তিনিও আচারের দাসত্ব অঙ্গীকারে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। কিন্তু ইতর সাধারণের পক্ষে সেই আদর্শকে একটু খাট করিতে হইবে। প্রকৃতি ঠাকুরাণী জগৎকে মনুষ্যের নিকট সম্পূর্ণভাবে সুন্দর ও সুখময় করিয়া গড়েন নাই; মনুষ্যের হাতে সেই কাজটা অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই মনুষ্যকেও অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দিতে হয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়। ইহাতে যদি পাপ হয়, তাহার জন্য মানুষকে সম্পূর্ণ দায়ী করিলে চলিবে না।

আর একটা কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বৈরাগ্য নামক ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম সমাজবিহিত আচারানুষ্ঠানের প্রতিকূল হইবে ইহা অসঙ্গত নহে। পাঠক খড়গহস্ত হইবেন না, আমি নিষ্কামতা অর্থে বৈরাগ্য শব্দ ব্যবহার করি নাই। যে বৈরাগ্যের উপদেশে মনুষ্য দারাসুতপরিবারকে নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক শক্তির কৃপায় সমর্পণ করিয়া জীবনসমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন দ্বারা নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করে, সেই স্বার্থপর সমাজদ্রোহী বৈরাগ্যের কথা আমি বলিতেছি। এই বৈরাগ্য সংসারকে শয়তানের কর্ম্মভূমি ভাবে, দারাসুতকে লোহার শিকল বোধ করে, এমন কি প্রকৃতির যুগান্তব্যাপী প্রয়াসফলে নির্ম্মিত নরদেহকে কদর্য্য মাংসপিণ্ডের সহিত তুলনা করে। এই বৈরাগ্য জগৎ হইতে যাহা সুন্দর তাহার লোপের জন্য সচেষ্ট থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

বৌদ্ধবিপ্লবের সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বৈরাগ্যের উৎকট প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ নামক যে মনুষ্যসমাজকে গালি দিয়া আমরা পরম হর্ষ অনুভব করি, সেই মনুষ্যসমাজ স্থূলতঃ এই বৈরাগ্যের বিরোধী ছিলেন। বেদশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরাশরপ্রণীত শাস্ত্র পর্য্যন্ত, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্ততঃ একটা কথা প্রতিপন্ন করে, যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমকে একবারে তুচ্ছ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পারমার্থিক হিসাবে ব্রাহ্মণ জগৎকে একবারে অলীক বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু ব্যবহারতঃ এই জগৎকে ও এই জীবনকে বিবিধ আচারপালন দ্বারা সৌষ্ঠবশালী করিয়া তুলিবার জন্য ব্রাহ্মণের আত্যন্তিক ব্যগ্রতা ছিল। আমার ধারণা এই যে অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তোলাই, অকাব্যকে কাব্যে পরিণত করাই, মনুষ্যের প্রধান কার্য্য ও মনুষ্যত্বের গৌরবময় বিশেষণ। যে উপায়ে এই পরিণতি সংঘটিত হয়, তাহা স্বভাবতই কৃত্রিম। আমার বিশ্বাস এই যে, ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক অশোভন অসুন্দর স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে মহত্তর সমাজজীবনের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম বেশে ও কৃত্রিম ভূষায় সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত, শোভন ও সুন্দর করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মণপ্রণীত শাস্ত্রের বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র ফললাভ করিয়াছে কি না সে পৃথক্ কথা; কোন বিধানের দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে পারে, সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় হইতে পারে, এ সকলও আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু এই জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল পদার্থের দুইটা পিঠ আছে; দুই দিক্ হইতে প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমার ভয় হয়, যেন একটা পিঠের দিকে সুবোধ লোকেও তেমন দৃষ্টি করেন না; একটা দিক্ হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতে তাঁহারা অবহেলা

করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে যদি সেই অবজ্ঞাত পৃষ্ঠের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট মনে করিব। সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবপ্রবণতার একান্ত বশীভূত হইয়া অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠেন, সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণের প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত, তাহা এখনও বোধ করি সুধীজনের বিবেচ্য।

ধর্ম্মের প্রমাণ

জীবনসংগ্রামের তাড়নায় বিড়াল তপস্বিব্রত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সে এই নিমিত্ত চিরদিন ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গৃহীত হইবে।

হিতোপদেশে গলিতনখদন্ত ব্যাঘ্র হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ দ্বারা অনেক গোমানুষভোজনরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাঘ্রসমাজের কোন ধর্ম্মসংহিতা হবিষ্যভোজনের ঔচিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয় নাই।

ঈসপের কথামালায় বঞ্চনাপরতার জন্য জম্বুক পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছে; কিন্তু বঞ্চনাবৃত্তি নিন্দা বা প্রশংসার বিষয় হইতে পারে, জম্বুক সমাজমধ্যে বোধ হয় এই প্রশ্ন লইয়া কোন তর্কই আজি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই।

পুনশ্চ প্রভুভক্তির জন্য কুকুরের সমাধির উপর মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ ইতিহাসে লেখে; কিন্তু চিত্রগুপ্ত তাঁহার পাপপুণ্যের খাতায় কোন সারমেয়ের এই প্রভুভক্তি পুণ্যের অঙ্কে জমা করেন নাই।

এক নিশ্বাসে বলা যাইতে পারে, মনুষ্যেতর জীবের জীবনে পাপ পুণ্যের কোন কথা উঠিতে পারে না; কুকুর অন্নদাতার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পুণ্যশীল হয় না। ব্যাঘ্র সারাজীবন ধরিয়া জীবহিংসা করিয়াও পাপী হয় না। প্রকৃতি প্রত্যেক ইতর জীবের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; কোন পাঠশালায় বা গির্জ্জায় কর্ত্তব্যবিচার শিখিবার জন্য ইতর জীবকে অপেক্ষা করিতে হয় না। সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান লইয়া জীবলীলা আরম্ভ করে;

তাহার স্বভাবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সে কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিহার করে; এ কাজটা ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, এরূপ দ্বিধা-বোধ বা সংশয় তাহার মনের মধ্যে কখনই উদিত হয় না।

ইতর জীবের চেষ্টা তাহার স্বভাবকর্তৃক নিয়মিত হয়; তাহার স্বভাবের এই অংশের ইংরেজি নাম instinct; বাঙ্গালা নাম সংস্কার। 'সহজাত' বা 'সহজ' এইরূপ একটা বিশেষণ দিলে সংস্কারের অর্থ টা আরও পরিষ্কার হয়। তাহার সংস্কার সহজাত অর্থাৎ জন্মসহকারে লব্ধ; তাহা শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয় না; প্রকৃতি যেমন তাহাকে হাত, পা, দাঁত, রক্ত, মাংস দিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সংস্কার-সমেত ভবলীলায় প্রেরণ করিয়াছেন। এক জোড়া শিং ও চারিজোড়া খুর উপার্জ্জন করিতে যেমন বলীবর্দ্দের কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, ধারাল নখর ও তীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি লাভ করিয়া বাঘের যেমন কোনই ব্যক্তিগত বাহাদুরি নাই, সেইরূপ সমুদয় মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের প্রতি অনুরাগের জন্য গরুকে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় নাই, এবং হরিণমাংস ও মেষমাংসের উপকারিতা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্য ব্যাঘ্র-শিশুও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। আপনার সহজসংস্কার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলদ চিরকাল যথানিয়মে ঘাস খাইয়া আসিতেছে এবং বাঘ চিরকাল মেষমাংসে স্পৃহা দেখাইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত তত্তৎসমাজে কোন রিফর্ম্মার জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের আচারসংশোধনের চেষ্টা করেন নাই।

এই সহজাত সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি এই সংস্কারের বশীভূত, তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই; সে সর্ব্বতোভাবেই এই সংস্কারের অধীন; এই সংস্কারের অধীনভাবে না চলিয়া তাহার উপায়ই নাই; এই সংস্কারের বশে চলা না যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে কখনও স্থান পায় না। গরুর ঘাস না খাইলে এবং রোমন্থন না করিলে উপায় নাই; বাঘের পক্ষে হিংসাপরিত্যাগ ও

হবিষ্যভোজন একেবারে অসম্ভব; মৌমাছিকে ফুলের আকর্ষণে উড়িতেই হইবে ও মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাক নির্ম্মাণ করিতেই হইবে; পিপীলিকাকে অজ্ঞাতসারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হইবে; সে হয়ত জানেই না যে, কি উদ্দেশ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল প্রাণী নিতান্ত অন্ধভাবে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট জীবনপ্রণালীর অনুসরণ করিতেছে। কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, না করিলে কি হইত, এই সকল তত্ত্বকথা তাহাদের মনে উদিত হয় না। প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে তাহারা বিচরণ করে ও বিচরণ করিতে বাধ্য; রেখামাত্রমপি সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাহাদের উপায় নাই। এই জন্য বলা হয়, তাহাদের সংস্কার অন্ধ অর্থাৎ বিচারবর্জ্জিত; তাহাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; এবং তাহাদের জবাবদিহি নাই; তাহাদের চেষ্টা যন্ত্রের মত নিয়মবদ্ধ। কাজেই তাহাদের জীবন-সমালোচনায় পাপ পুণ্যের কথা উঠিতে পারে না পশুজীবনে ধর্ম্মবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রয়োগ নাই।

হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন এইরূপ দায়িত্ববর্জ্জিত যন্ত্রের মত হইলে মনুষ্যজীবনে ক্লেশের ভার অনেকটা লঘু হইত সন্দেহ নাই। প্রকৃতি-দেবী তাঁহার পশু সন্তানগুলির প্রতি যতটা মমত্ব দেখাইয়াছেন, মনুষ্য-সন্তানগুলির প্রতি ততটা দেখান নাই। আধিব্যাধি, জরামরণ, নৈসর্গিক বিপৎপাত হইতে ক্লেশ প্রভৃতি পশু ও মনুষ্য তুল্যরূপে ভোগ করে; হয়ত পশুজীবনে ঐ সকল অত্যাচারের মাত্রা মনুষ্যজীবনের অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু স্বকৃত কার্য্যের জন্য মনুষ্যের যে জবাবদিহি আছে, পশুর জীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। মানবজীবন আধ্যাত্মিক ক্লেশের ভারে প্রপীড়িত ও অবসন্ন হইয়া আছে, পশুজীবনে তাহার একেবারে তুলনা নাই। প্রকৃতি পশুজীবনের বল্‌গা নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরাইতেছেন; কিন্তু মনুষ্যকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ও যথেচ্ছভাবে বিচরণের ক্ষমতা দিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন।

মনুষ্য সংস্কারের বশ নহে, এরূপ নহে; জীবনরক্ষার্থ ও সন্তানোৎপাদনার্থ যে সকল প্রবৃত্তির প্রয়োজন, সেগুলি মনুষ্য অন্যান্য জীবের মতই প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছে; এইগুলি তাহার সংস্কার। মানুষ সংস্কারবশে ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় প্রেরিত হয়; পথ্যাপথ্যবিচার অনেক স্থলে সংস্কারবলেই সম্পাদিত হয়; সংস্কারবলেই মানুষ শত্রুর আক্রমণে ভীত হয়, শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, বংশরক্ষায় ও অপত্যপালনে প্রবৃত্ত হয়। অপত্যের প্রতি জননীর স্নেহ, যাহা অনেক ইতর জীবের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহাও সংস্কার হইতে উৎপন্ন। জীবনরক্ষা ও বংশ-রক্ষা বিষয়ে এই সকল সংস্কারের এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি এবিষয়ে মনুষ্যকে স্বাতন্ত্র্য দিতে সাহস করেন নাই। মৃত্যুর প্রতি যদি স্বাভাবিক ভয় না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি এতদিন সংসারমধ্যে দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ; যৌবনসঙ্গলিপ্সা যদি স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন ও তীব্রতাবিশিষ্ট না হইত, তাহা হইলে এই ঘোর জীবনসংগ্রামে মনুষ্য বংশবৃদ্ধিতে সম্মত হইত কি না, সন্দেহের বিষয়। কাজেই এই সকল স্থলে মনুষ্যের সহজাত সংস্কারই প্রবল; মনুষ্য এই সকল স্থলে ইতর জীবের সহিত এক প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের এই সকল ধর্ম্মকে পাশব ধর্ম্ম ও এই সকল বৃত্তিকে পাশব বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। আহারনিদ্রাভয়াদি কতিপয় জৈব ব্যাপারে পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিভেদ নাই। এই সকল স্থলে মনুষ্য সংস্কারের অধীন ও প্রবৃত্তির অধীন; তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই।

সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু কতকটা আছে ইহা স্বীকার না করিলে চলে না। ইতরজীবে কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই; মনুষ্যে কতকটা আছে এবং তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং তাহাতেই পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিশেষ। অন্তঃকরণের যে বৃত্তি লইয়া এই বিভেদ, তাহার ইংরেজি নাম Reason; বাঙ্গালায় মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পরিভাষামতে

ইহাকে প্রজ্ঞা বলিব। প্রজ্ঞা ও সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ, এমন কি বিরোধ, বর্ত্তমান। প্রজ্ঞা ভূয়োদর্শন বা অতীতকালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎকালের ভরসার উপর স্থিরভাবে বর্ত্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতের অভিজ্ঞতার ও ভবিষ্যতের ভরসার সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণভাবে অন্ধ, কিন্তু প্রজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় চক্ষুষ্মতী। গরু মাংস পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের আঁটির দিকে চলে ও বাঘ ঘাসের আঁটি ফেলিয়া গরুর প্রতি দৌড়ায়; উভয়েই প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপ করে; কেহই খাদ্যবিশেষের ইষ্টানিষ্টবিচার করিতে বসে না। মানুষ প্রকৃতির প্রেরণায় মাংস ও মিষ্টান্ন উভয়ের প্রতি সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সময়ক্রমে আবার প্রকৃতির প্রেরণার বিরুদ্ধাচারী হইয়া মাংস ও মিষ্টান্ন উভয়ই পরিহার করিয়া কুইনীন গলাধঃকরণেও সম্মত হয়। কেন না, মানুষের অতীতকালের অভিজ্ঞতা তাহাকে শিখাইয়াছে, পীড়ার অবস্থায় কুইনীনই তাহার উপযোগী, এবং ভবিষ্যতের ভরসা যে কুইনীনই তাহাকে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ করিবে। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ বিচার করিতে সামর্থ্য দেয় যাহা, তাহাই প্রজ্ঞা। কুইনীন ভোজনের সমকালে মানুষ মনের মধ্যে তর্ক-শাস্ত্রের বিতণ্ডা বাঁধিয়া ফেলে; এবং তর্কশাস্ত্রের ইন্‌ডক্‌শন ও ডিডক্‌শন—আরোহ ও অবরোহ—উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ সমাধান করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দার্শনিক পণ্ডিত সাজিয়া উঠে। আরোহ প্রক্রিয়া তাহাকে বলে, কুইনীন বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী; অবরোহ প্রক্রিয়া বলে, তুমিও কুইনীনে ফল পাইবে। তখন প্রজ্ঞা সবলে তিক্তদ্রব্যের বিরাগরূপ সংস্কারকে পরাভূত করিয়া সেই তিক্তান্নকেই উদরসাৎ করিতে পরামর্শ দেয়।

এরূপ বলিতেছি না যে, ইতরজীবেরা পীড়ার সময় পথ্য ও ঔষধ চিনিয়া লইতে পারে না, অথবা তাহারা সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই

একই নিয়মে জীবনযাত্রা চালায়। অনেক পশুর গল্পে জানা যায়, তাহারা আপনাদের পীড়ার সময় ঔষধ চিনিয়া বাহির করে ও অসুস্থ অবস্থায় এমন সকল নিয়ম পালন করে, যাহা সকল ডাক্তারের মাথায় আসে না। কিন্তু পশুর পক্ষে এই সকল শক্তিও স্বাভাবিক ও সহজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন; কাহারও নিকটে এই বিদ্যা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই; কোন ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয় নাই। অথচ সংস্কারের নির্দ্দেশ একবারে অব্যর্থ ও অভ্রান্ত; সংস্কার ইতর জীবকে যে পথ্য ও ঔষধ দেখাইয়া দেয়, তাহা অমোঘ। মনুষ্য ডাক্তারের ব্যবস্থায় বা নিজের বিদ্যায় যে ঔষধ সেবন করে, অধিকাংশ স্থলে তাহা ব্যারাম বাড়াইয়া দেয়। পশুতে ও মনুষ্যে এইখানে বিভেদ; সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যে এইখানে বিশেষ।

কথাটা শুনিতে যেমনই হউক, সংস্কারে ও প্রজ্ঞায় এই একটা সনাতন বিরোধ। সংস্কার একেবারে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে; তাহার এদিক্ ওদিক্ থাকেনা; তাহাতে ভ্রান্তি থাকেনা; তাহাতে শিখিবার ও ঠেকিবার কিছুই থাকেনা; তাহাতে উন্নতির অবনতির কোন আশা থাকেনা। প্রজ্ঞা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বহু যত্নে ও বহু কষ্টে শিখিতে হয়, শিখিয়াও আবার প্রয়োগকালে পুনঃ পুনঃ ঠেকিতে ও ঠকিতে হয়, এইরূপ ঠেকিয়া, শিখিয়া ও পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ও উন্নতি করিতে হয়। সংস্কার কেবল একটা রাস্তা দেখায়, অন্য পথে চলিতে স্বাধীনতা দেয় না; প্রজ্ঞা হাজার দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, সকলগুলিই অবারিত ও নিরর্গল; যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও; স্বর্গের বা নরকের মুখে চলিতেছ, তাহা ঠেকিয়া ও ঠকিয়া আবিষ্কার কর।

প্রকৃতি মনুষ্যেতর জীবকে জীবনযাত্রায় স্বাতন্ত্র্য দেন নাই; আহার নিদ্রাদি অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনুষ্যেরও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যত্র মনুষ্য স্বতন্ত্র। মানুষকে গন্তব্যপথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়;

সংস্কার কোন কথা বলে না। প্রজ্ঞার সাহায্যে পথ খুঁজিতে হয়; কিন্তু প্রজ্ঞাও একবারে নিঃসন্দেহে পথ দেখাইয়া দেয় না। পাঁচটা পথে চলিতেই মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য থাকে; কিন্তু কোনটায় চলিলে ঠকিতে হয়, কোনটায় চলিলে জিতিতে হয়; এইরূপে অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞাও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া পুষ্টিলাভ করে। সংস্কার স্থিতিশীল—কনস্নারবেটিব; চিরকাল তাঁহার এক দশা। প্রজ্ঞা উন্নতিশীল—লিবেরাল; তিনি ক্রমেই সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ও বিকশিত হইতেছেন। সংস্কার বাদশাহের সংক্ষিপ্ত হুকুম, না মানিলে নিষ্কৃতি নাই; প্রজ্ঞা প্রজাতন্ত্র পার্লেমেণ্টের বিতণ্ডার কচকচি; ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সংশোধনসাপেক্ষ, বিরোধসাপেক্ষ, এবং সর্ব্বদা বিরোধে রত।

পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কারকর্ত্তৃক চালিত; জীবনরক্ষায় নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় জৈবব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মনুষ্যজীবন মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক শাসিত। পশুজীবনে স্বাতন্ত্র্যের অত্যন্ত অভাব; মনুষ্যজীবনে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্টপরিমাণে বর্ত্তমান। পশু যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলে উপায় নাই; মনুষ্য অনেক স্থলে যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলেও চলিত। পশুর কোন জবাবদিহি নাই; মনুষ্য স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী। পশুর সংস্কার সম্পূর্ণ অপ্রতিহত; মনুষ্যের প্রজ্ঞা সংস্কারকে সংযত করিয়া চলিতে পারে। পশু কোন কার্য্যের জন্য নিন্দিত বা প্রশংসিত হয় না; মনুষ্য বহুস্থলে নিন্দিত বা প্রশংসিত হয়। প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রজ্ঞা যদি মনুষ্যকে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করে, অথচ মনুষ্য প্রবৃত্তির প্রেরণায় সেই কাজ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে নিন্দিত হইতে হয়। পশুর পক্ষে শিখিবার বিষয় অধিক কিছু নাই; সে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত শিক্ষা জন্মকালেই প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের জন্মলাভের পর শিক্ষার আরম্ভ হয়; পিতামাতার নিকট হইতে যে স্বাভাবিক সংস্কার পাওয়া

যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মানুষের চলে না। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে নূতন নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। সমস্ত বিশ্বজগৎই তাহার বিদ্যালয়; জাতমাত্রই সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

পাপপুণ্যের কথা পশুজীবনের সমালোচনায় উঠে না; মানবজীবনের সমালোচনায় উঠে। পশু পাপপুণ্যবর্জ্জিত; মনুষ্যের পক্ষে এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, এ কাজটা পাপ, ও কাজটা পুণ্য।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, গোড়ায় দেখা যায়, প্রজ্ঞা ও সংস্কারের এই বিরোধী ভাব হইতে পাপ পুণ্যের উৎপত্তি। প্রথম কথা, সংস্কার মানুষকে যে পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা সময় সময় সে পথ দেখায় না, সে পথে চলিতে নিষেধ করে। পশুদিগের জীবনে প্রজ্ঞার কার্য্যকারিতা আছে কি না, সহজে উত্তর দেওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ একটা দুরূহ সমস্যা। অনেক বলেন, পশুজীবনে প্রজ্ঞার প্রভুত্ব আদৌ নাই, মনুষ্যেতর জীব প্রজ্ঞা-বর্জ্জিত। প্রজ্ঞার শাসন থাকিলে পশুজীবনে কতকটা স্বাতন্ত্র্য থাকিত, এবং কালসহকারে পশুজীবনে উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু পশুজীবনে সে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং পশুজীবনে উন্নতির পরিচয়ও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তথাপি পশুমাত্রই একবারে প্রজ্ঞাবর্জ্জিত, এরূপ স্বীকার নিতান্ত দুঃসাহসের কথা। উন্নত জীবশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়, এমন এক একটা কাজ করিয়া ফেলে, এমন কি সময়ে সময়ে নূতন বিষয়ে শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার এরূপ পরিচয় দেয় যে, সেখানে প্রজ্ঞার কর্তৃত্ব একবারে নাই, তাহা বলিতে সাহস হয় না। কুকুরের গল্প, বানরের গল্প, হাতীর গল্প, ইহার প্রমাণ। যাহাই হউক, প্রজ্ঞার শাসন থাকিলেও সে শাসন এত ক্ষীণ যে, পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কারাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না। সংস্কারই তাহার জীবনের শাসক ও উপদেষ্টা ও শ্রেয়ঃসাধক।

মনুষ্যের পক্ষে অন্যবিধ অবস্থা। মনুষ্যজীবনে প্রজ্ঞা সংস্কারকে দমন করিয়া রাখে, সংস্কারকে পরাভব করিয়া নিজপ্রভুত্ব রাখিবার চেষ্টা করে। সংস্কারগুলিকে যদি পাশবধর্ম্ম বলা যায়, তাহার বিরোধী ধর্ম্মগুলি, যাহা লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং পশুতে ও মনুষ্যপশুতে বিশেষ, সেইগুলিকে মানবধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এই খানে একটা সমস্যা আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই নিয়ম যে জীবনরক্ষার পক্ষে ও বংশরক্ষার পক্ষে, ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবন-রক্ষার পক্ষে, যাহা অনুকূল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সেই সকল ধর্ম্মই অভিব্যক্ত হয় ও ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। পশুগণের সংস্কারগুলি সর্ব্বত্রই তাহাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের অনুকূল; কাজেই তাহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। হিংসাবৃত্তি ব্যাঘ্রজীবনের অনুকূল, তাই ব্যাঘ্র হিংস্রক; বঞ্চনাপরতা জম্বুকজীবনের অনুকূল, তাই জম্বুক বঞ্চক; ভণ্ডামি মার্জ্জারজীবনের অনুকূল, তাই বিড়াল সময়ে সময়ে তপস্বী হয়েন। হবিষ্যাশী ব্যাঘ্র বা ঋজুস্বভাব শৃগালের ধরাতলে স্থান নাই। অভিব্যক্তির নিয়ম মনুষ্যমধ্যে ও পশুমধ্যে বিভিন্ন নহে। তবে প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে মানবজীবনে বিরোধ কেন? প্রজ্ঞা ও সংস্কার উভয়ই যদি জীবনরক্ষার অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যের সংস্কারগুলি মনুষ্যজীবনের প্রতিকূল হইলে এতদিন তাহারা লোপ পাইত, আবার প্রজ্ঞা অথবা সংস্কারবিরোধী ধর্ম্মগুলি জীবনের অন্তরায় হইলে তাহারাও অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। উভয়ই যদি অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ কেন?

এই বিরোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে একবারে জীবসমূহের নিম্নতম স্তরে যাইতে হয়। জীবন পদার্থটাই একটা সনাতন বিরোধ; জীবনের সংজ্ঞাই একটা চিরন্তন বিরোধ। মানুষই বল, আর পিঁপীড়াই বল, আর একটা নগণ্য কীটাণুই বল, তাহার সমস্ত জীবনই একটা

বিরোধের ও সংগ্রামের ইতিহাস। জীব যে জগতের মধ্যে বাস করে, সে জগৎ দয়ামায়াবর্জ্জিত, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বহিঃস্থ জগৎ সর্ব্বদা জীবমাত্রকেই সংহার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া নির্জীব পদার্থে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছে। জল, বায়ু, শীতাতপ পাঁচটা ভূতই, একত্র জোট বাঁধিয়া জীবকে নির্জীব পঞ্চত্বে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে। বিশ্বজগতের সমগ্র বাহ্যশক্তি জীবের জীবনের অন্তরায়। জীবের আভ্যন্তরীণ শক্তি ক্রমাগত এই বহিঃস্থ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। জড় চারিদিক্ হইতে জীবকে আক্রমণ করিয়া জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; জীব জড়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সেই তুমুল সমরে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁচটা নির্জ্জীব মহাভূত যেমন একযোগে জীবকে পরাভূত করিয়া তাহার জীবত্বলোপে উদ্যত, জীবও তেমনি সেই পাঁচটা মহাভূতের উপর প্রভুত্ব চালাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনার জীবত্ব অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। জল, বায়ু, শীতাতপ, ক্ষিতি, ব্যোম এক দিকে জীবকে সংহার করিতে ব্যস্ত; জীব অন্য দিকে সেই জলবায়ু, সেই শীতাতপ, সেই ক্ষিতিব্যোমকে আপন কাজে লাগাইয়া তাহাদের নিকট হইতে হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বলসঞ্চয় করিয়া, তাহাদিগকে পরাভব করিয়া, আপন অস্তিত্ব স্থির রাখিতেছে। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিরাম নাই। যতদিন উভয়ের মধ্যে এই সংগ্রাম, এই অবিশ্রাম বিরোধ, ঠিক ততদিন ধরিয়াই জীবের জীবন। যে দিন এই সংগ্রামের শেষ, এই বিরোধের বিরাম, সে দিন জীবনেরও শেষ দিন, সেই দিন মৃত্যু। অথবা এই অবিরত প্রবর্ত্তমান সংগ্রামের নামান্তরই জীবন। জড় পদার্থে, ইটে পাথরে, জলে হাওয়ায়, এই সংগ্রাম নাই; তাই তাহারা নির্জীব। মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই সংগ্রাম বর্ত্তমান, তাই তাহারা সজীব। সংগ্রামের অবসানের নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর জীবদেহে

ও জড়দেহে কোন প্রভেদ থাকে না। এই বিরোধের ও সংগ্রামের তীব্রতা যেখানে যত অধিক, জীবনও সেইখানে ততটা অভিব্যক্ত ও পরিণতিপ্রাপ্ত।

জীবনের আরম্ভ এই সংগ্রাম ও বিরোধ লইয়া এবং জীবনের অভিব্যক্তি ও উন্নতি এই সংগ্রামে। জীবপর্য্যায়ে বিবিধ শ্রেণীর উৎপত্তি, বিবিধ বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি, এই সংগ্রামের ফলে। জীবের সহিত সমগ্র জড়জগতের সংগ্রাম, এবং একটু উপরে উঠিলেই জীবের সহিত অবশিষ্ট জীবসমূহের সংগ্রাম। প্রত্যেক জীব তাহার বহিঃস্থিত সমগ্র জীবজগৎ ও জড়জগতের সহিত সংগ্রামে নিরত, সমগ্র জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। এই আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ; জীবপদবীতে তাহার উন্নতিলাভ। যে বিকাশ লাভ করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, সেই টিকিয়া যায়; যে টিকিতে পারে না, সে লোপ পায়। কেহ থাকে, কেহ যায়। যাহারা থাকে, তাহারা যোগ্য, সমর্থ, প্রকৃতির স্বহস্তে বাছাই করা জীব—জীবনসংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত জীব।

জীবনের মূলে ও জীবনের আরম্ভে যে বিরোধ, যে বিরোধে জীবনের উন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেই বিরোধের পরিচয় জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ায়, জীবের প্রত্যেক চেষ্টায়, পাওয়া যায়। বিরোধ সনাতন, চিরস্থায়ী; ইহার নিবৃত্তি নাই বা পূর্ণতা নাই; তাই জীবনপ্রণালীটা একটা রফা বন্দোবস্ত। বিরোধী বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে কেবলই সন্ধিস্থাপনের ও সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা। এই চেষ্টা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী চেষ্টামাত্র। উভয়ে পরস্পরকে হঠাইবার ও ঠকাইবার চেষ্টায় অবস্থিত; যখন আপাততঃ সংগ্রামের বিশ্রাম হয়, তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে শ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য উভয়েই বলসংগ্রহে প্রস্তুত হইতেছে মাত্র।

এরূপ সন্ধিবন্ধনে, এরূপ রফাবন্দোবস্তে কখনই স্থায়ী শান্তি হয় না;

ভবিষ্যতের ভরসায় বর্ত্তমানকালে কতকটা ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতদিন বিরোধ চলে, ততদিনই জীবন; বিরোধের অবসানের নামই মৃত্যু। কিন্তু বিরোধের অবসান কখনও ঘটে কি? জীবের মৃত্যু কখনও ঘটে কি? একপুরুষে কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া অবসর গ্রহণ করিলে পরপুরুষে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। পিতা আপন জীবন ব্যাপিয়া সংগ্রাম চালাইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করেন; পুত্র নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করেন। পিতার রক্তমাংস পুত্রের শরীরে বর্ত্তমান; পুত্রের শরীর পিতার শরীরের অংশমাত্র। পিতা নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হন মাত্র। জরাজীর্ণ ক্লান্ত ক্লিষ্ট কলেবরটা বা আবরণটা পরিত্যাগ করিয়া উদ্যমপূর্ণ নূতন আবরণ আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে নিযুক্ত হন মাত্র। ওয়াইসমান দেখাইয়াছেন, জীবের নিম্নতম পর্য্যায়ে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে। যে জীব সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, সে জীব স্বভাবতঃ মরে না। কেবল মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড হইয়া রক্তবীজের মত সংখ্যায় বাড়ে মাত্র। সেখানে চিরদিন একই মূর্ত্তি ধরিয়া সংগ্রাম; মূর্ত্ত্যন্তরগ্রহণের অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের নিয়ম নাই। উচ্চতর পর্য্যায়ে উঠিয়া ব্যক্তিগত মৃত্যু আছে, কিন্তু জাতিগত মৃত্যু নাই। একব্যক্তি কিছু দিন ধরিয়া লড়াই চালাইয়া পরাভূত হইয়া অবসন্ন হয় ও তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাহার নিজ শরীরের একটা অংশ রণস্থলে রাখিয়া যায়; সেই অংশটা নূতন বলে সংগ্রামে নিযুক্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম, এই ঘটনার নাম, বংশরক্ষা বা সন্তোনোৎপাদন; অপত্যের হস্তে কার্য্যভার দিয়া পিতার অবসরগ্রহণ। কিন্তু সেই অপত্য পৃথক্ বীজ নহে; পিতারই মূর্ত্ত্যন্তরমাত্র। এই অর্থে মৃত্যু জীবনসংগ্রামে জীবের পরাভব নহে, নূতন করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবর্ত্তনমাত্র। ব্যক্তির পক্ষে যেটা ক্ষতি, জাতির পক্ষে তাহা লাভ। উন্নত শ্রেণীর জীব এই মৃত্যুরূপ কৌশল বা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বহির্জগতের সহিত বিরোধটা

চিরস্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং যখন মৃত্যু উদ্ভাবিত হয় নাই, তখন যে সকল শক্তি সঞ্চিত হয় নাই, মৃত্যুর আবিষ্কারের পর হইতে সেই সকল শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে। এককালে ধরাপৃষ্ঠে সামান্য কীটাণু বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব অবস্থিত ছিল; আজ ধরাপৃষ্ঠ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদি বিবিধ উন্নত শ্রেণীর বিবিধশক্তিশালী জীবজাতিতে পূর্ণ হইয়া শোভান্বিত হইয়াছে। জীবজগতে এই অদ্ভুত অভিব্যক্তির, এই আশ্চর্য্য পরিণতির, এই বিস্ময়কর বিকাশের মূলে, মৃত্যু। জীব যদি মৃত্যু স্বীকার না করিত, তাহা হইলে জীবনে এত বৈচিত্র্যের উদ্ভবও ঘটিত না।

ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু একটা ত্যাগস্বীকার। বহির্জগতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আপন অস্তিত্বলোপের অঙ্গীকার; কিন্তু এই ত্যাগস্বীকার একটা অস্থায়ী সন্ধি-বন্ধন-মাত্র। আমি পরাস্ত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলাম মাত্র; কিন্তু যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম, যাহাদের জন্ম দিয়া গেলাম, তাহারা আমা অপেক্ষাও যোগ্যতর; তাহারা বীরের মত লড়াই চালাইবে। জীবের ঝাড় রক্তবীজের ঝাড়; রক্তবীজ মরিয়াও মরে না; তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু মূর্তিগ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে উত্থিত হয়। একজন যায়, দশ জনকে রাখিয়া যায়; দশ জন যায়, শত জনকে রাখিয়া যায়; শত জনের স্থল সহস্র জনে পূর্ণ হয়। সংগ্রামের ভীষণতা বাড়ে মাত্র; জীবনযুদ্ধ যুগের পর যুগ ধরিয়া ভীষণতর হয়; জীব নূতন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হয়। সমস্ত জড়জগৎ জীবনকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, জীবন লুপ্ত হইতে চায় না; ব্যক্তিজীবন লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় জীবন লুপ্ত হইতে চাহে না। ব্যক্তিজীবন জাতীয় জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যু অঙ্গীকার করে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু জাতি বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তিজীবনের সহিত জাতীয়-জীবনের কাজেই বিরোধ; বংশরক্ষার

জন্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-অঙ্গীকার; পুত্রের অভ্যুদয়ের জন্য পিতার মৃত্যু-স্বীকার; সুতরাং পিতাপুত্রে বিরোধ।

প্রকৃতিতে জীবনের ব্যাপার বিরোধময়। জীবের সহিত জড়ের মূলগত বিরোধ; অন্নের জন্য জীবের সহিত জীবের বিরোধ। জীবের অন্ন জীব; এক জীবকে খাইয়া অন্য জীব বাঁচে। আত্মরক্ষাই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন জীবে জীবে প্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? ইহারই ফলে মৃত্যুর উৎপত্তি; মৃত্যুর তাৎপর্য্য জগতের সহিত সংগ্রামটা ভাল করিয়া চালাইবার জন্য ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ-স্বীকার ও মৃত্যুর অঙ্গীকার এবং পুত্রের উপরে আপনার কার্য্যের ভারার্পণ; ইহার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতিগত জীবনে বিরোধ অর্থাৎ পিতাপুত্রেও বিরোধ। বিরোধের ফলে জাতীয় উন্নতি, জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টি; জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির সহিত আবার ব্যক্তিগত জীবনে বৈচিত্র্যবিকাশ, ব্যক্তির শক্তিসঞ্চয় ও উন্নতিলাভ।

জীবনের দুঃখ কি? আধিব্যাধি, জরামরণ। জীবনের আনন্দ কি? জীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ; ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ। আধিব্যাধি, জরামরণ ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির অন্তরায়, এই জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে একে অন্যের সহায়, একের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের অনুকূল। আধিব্যাধি, জরামরণ না থাকিলে ব্যক্তি-জীবনে স্ফূর্ত্তিলাভ, বিকাশলাভ, আনন্দলাভ ঘটিত না। মৃত্যু না থাকিলে জৈবিক অভিব্যক্তি ঘটিত না। অভিব্যক্তির মুখ্যতম সাধন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। যে ভাল, যে সমর্থ, যে উন্নত, প্রকৃতি তাহাকেই বাছাই করিয়া বজায় রাখেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একমাত্র অবলম্বন মৃত্যু। যে মন্দ, যে অসমর্থ, যে অবনত, প্রকৃতি তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া সরাইয়া দেন। জীবজগৎ হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দাও; প্রকৃতি নির্ব্বাচন-কার্য্যে বিমুখ ও উদাসীন হইবেন। ধরাধামে নূতন নূতন জীবের উদ্ভব ঘটিবে না।

জীবশ্রেণীমধ্যে অহিনকুলের বিরোধ, মূষিকমার্জ্জারের বিরোধ, ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের বিরোধ, নিষ্ঠুর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী; কেন না, পুরাকালের এই বিরোধ হইতেই অহি ও নকুল, মূষিক ও মার্জ্জার, ব্যাঘ্র ও মেষশাবক উভয়েরই বর্ত্তমান পরিণতি ও ভবিষ্যতে উন্নতি। বিরোধ লইয়াই জীবন; যেখানে বিরোধ অস্তিত্বহীন, সেখানে জীবন নাই। আশ্চর্য্য হইও না; জলের সহিত বায়ুর কোন বিরোধ নাই, উভয়েই নির্জ্জীব, উভয়েই জড়। জড়ের অপেক্ষা জীবকে আমরা উন্নত বলিয়া থাকি। কিন্তু জীবের জীবত্ব এই বিরোধ লইয়া।

জীবশ্রেণীর উচ্চতম পর্য্যায় মনুষ্যজাতিতে পৌঁছিলে একটা নূতন ধরণের বিরোধের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে; এই বিরোধ সংস্কার ও প্রজ্ঞার মধ্যে বিরোধ। মনুষ্যের সংস্কার মনুষ্যকে এক পথে ঠেলিয়া দেয়, মনুষ্যের প্রজ্ঞা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য পথে চলিতে বলে। মনুষ্য উভয়ের শাসনে থাকিয়া একটা পন্থা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়; হয় ঠকে, নয় জিতে; এবং চরমে প্রজ্ঞার শাসন আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়ে। মনুষ্যজীবনের এই অভিনব ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্য-জীবনের সহিত পশুজীবনের একটা প্রধান পার্থক্য বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

সেই পার্থক্য এই যে, মনুষ্য জীব, অপিচ সমাজবদ্ধ জীব। মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল বাঁধিয়া থাকার মূল কারণ মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য। জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল মোটা হাতিয়ারের দরকার, মানুষের সে সকল কিছুই নাই; না আছে ধারাল দাঁত, না আছে ধারাল নখ, না আছে গায়ে বল। প্রকৃতি মানুষকে দুইটা শিং পর্য্যন্ত দিতে কৃপণতা করিয়াছেন। গণ্ডারের মত মোটা চামড়াও নাই; হরিণ বা শশকের মত দ্রুতপলায়ন-সমর্থ চরণেরও অভাব; তাহা থাকিলেও পলায়ন-

দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় থাকিত। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও তীক্ষ্ণতায় ও কার্য্যপটুতায় অনেক ইতরজীবের নিকট হারি মানে। বস্তুতঃ জীব-সমাজে মনুষ্য বড়ই দুর্ব্বল। অপরকে আক্রমণ করা দূরের কথা, আপনাকে বাঁচানই মানুষের পক্ষে দুষ্কর। তবে মানুষের প্রকাণ্ড মাথার ভিতরে এক রাশি মস্তিষ্ক রহিয়াছে; সেই মস্তিষ্কের ভাঁজের পরদায় পরদায় বহুকালের বহু অতীত ঘটনা বিবরণ সাঙ্কেতিক চিহ্নে অঙ্কিত থাকে; এবং প্রয়োজন মত মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় সেই ভাঁজগুলা ও পরদাগুলা উদঘাটিত করিয়া সেই চিহ্নগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়া সেই বিবরণগুলি মানসপটে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; এবং সেইগুলি বাছিয়া গুছিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আপনার ভবিষ্যতের প্রয়োজনসাধনার্থ তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে চায়। ইতর জীবের পক্ষে এই শক্তিটার অত্যন্ত অভাব; মনুষ্যের এই শক্তির অদ্যাপি ইয়ত্তা হয় নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীতকালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা; ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর লইয়া কেবল আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াও চলে না; অপরের প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; একজন মানুষের অভিজ্ঞতা অপরের জীবনযাত্রার আনুকূল্যে প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইবার জন্য মানুষ একটা বিস্ময়কর কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে; তাহার নাম ভাষা। সকলে মিলিয়া একযোগে কয়েকটা ধ্বনির সহিত কয়েকটা ভাবের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। মনুষ্য দল বাঁধিবার পর ভাষার উদ্ভাবন দ্বারা দল বাঁধিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ এক এক দুর্ব্বল; কিন্তু এইরূপে দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ মনুষ্য প্রচণ্ড বলে বলীয়ান্। জীবমধ্যে কোন জীবই সমাজবদ্ধ মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না; মনুষ্য জীবজগতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

এইখানে একটা কথা আসিয়া পড়ে। মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবের

মধ্যেও সমাজের উদাহরণ আছে। পিঁপীড়া ও মৌমাছির সমাজপ্রণালী তন্মধ্যে বিস্ময়করত্বে প্রধান। পিঁপীড়ার ও মৌমাছির সমাজ পিঁপীড়া বংশকে ও মৌমাছি বংশকে জীবনসংগ্রামে রক্ষা করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এ বিষয়ে মানব-সমাজের সহিত তাহাদের ঐক্য আছে। কিন্তু মৌমাছি-সমাজের ও পিঁপীড়া-সমাজের মেম্বারগণ· প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন না। স্বাভাবিক সহজাত সংস্কারই তাঁহাদের সমাজবন্ধনের মূল। যে অন্ধ সংস্কার মৌমাছিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মধুপূর্ণ পুষ্পের সমীপে উপস্থিত করায় ও সেই পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া আপন চাকের মধ্যে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, সেই অন্ধ সংস্কারই তাহাকে দল বাঁধিতে বাধ্য করে, এবং দলবলে জুটিয়া মধুখের মশলায় বিচিত্র চক্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত করে। শুনা যায়, মৌমাছি-সমাজে অদ্ভুত রকমের শ্রমবিভাগের বা কর্ম্মবিভাগের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে কেহ বা রাণী, কেহ বা মিস্ত্রী, কেহ বা মজুর, কেহ বা সৈনিক; বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়, যে মনুষ্যসমাজ তাহার নিকট চিরদিন হারি মানিবে ও লজ্জা পাইবে। সমাজের প্রত্যেক সভ্যের নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে; কেহ মধু আনেন, কেহ চাক বানান, কেহ পাহারা দেন, কেহ শত্রুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন, কেহ বা কেবল সন্তানপ্রসবস্বরূপ বিরাট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মৌমাছি বংশ রক্ষা করেন। সকলেই আপন আপন কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করেন; কেহ কাহাকে বাধা দেন না, কেহ কাহারও সঙ্গে বিবাদ করেন না। অথচ এতবড় সমাজমধ্যে একটা ইস্কুল নাই, একটা আদালত নাই, একটা উকীল নাই, একটা ধর্ম্মপ্রচারক নাই, একটা রিফর্মার নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; অথচ কেহই জানে না, কেন সে ব্যস্ত; তাহাকে কাজ করিতে হয়, তাই সে করে; আমাদের যেমন খাইতে হয়, ঘুমাইতে হয়, জন্মিতে হয়, মরিতে হয়, তাহাদেরও সেইরূপ পাহারা দিতে হয়, চাক বানাইতে হয়, সন্তান

প্রসব করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক না রাখিয়া যেমন আমাদের দাড়ি গজায়, দাঁত ভাঙ্গে ও চুল পাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজের সহিত ইচ্ছার অনিচ্ছার কোনও সম্পর্ক থাকে না। সমস্তই সংস্কারের প্ররোচনায়; কুত্রাপি প্রজ্ঞার শাসন নাই, কুত্রাপি স্বাতন্ত্র্য নাই। মৌমাছি জানে না যে, চাকনির্ম্মাণরূপ বিস্ময়কর কারিকরির কাজে সে ব্যাপৃত রহিয়াছে, মানুষের মত প্রকাণ্ড জন্তু যাহা দেখিয়া কখন বিস্মিত, কখন লজ্জিত হয়। মৌচাকের এক একটা কুঠরির কারু-কার্য্য দেখিয়া বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় গণিতবিৎ, বিহ্বল হন। মৌমাছি জানে না যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী পাঠশালায় নীতিকথায় ও পদ্যপাঠে বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রশংসিত হইতেছে। ইস্কুলমাষ্টারের সাহায্যমাত্র না লইয়া তাহারা এতটা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু সহস্র মাষ্টার মহোদয় অবিশ্রাম বেত্র চালাইয়া মনুষ্যশিশুকে তাহাদের উদাহরণের অনুবর্ত্তী করিতে আজ পর্য্যন্ত সমর্থ হইলেন না।

মানবসমাজে ও মৌমাছিসমাজে এই স্থানেই পার্থক্য। মৌমাছির সমাজে সংস্কারের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব, মনুষ্যসমাজে প্রজ্ঞার শাসন। মৌমাছি সমাজে ভুল ভ্রান্তি নাই, সকলেই বিনা শিক্ষায় ওস্তাদ, সকলেই বিনা পুলিশে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; মনুষ্যসমাজে ভুলভ্রান্তি পদে পদে; নৈপুণ্য শিখাইবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তনার জন্য পাদরির দরকার। তথাপি মৌমাছিসমাজে উন্নতি নাই; ঐ সমাজ চিরদিনই সমানভাবে চলিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে মৌমাছির যদি কখন উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে তাহার চক্রনির্ম্মাণ-নৈপুণ্যেরও উন্নতি হইতে পারিবে, কিন্তু মৌমাছির জ্ঞাতসারে তাহাদের আপন চেষ্টায় বা ইচ্ছায় উন্নতি ঘটিবে না। মনুষ্যের সমাজ উন্নতিশীল; মনুষ্যের নৈপুণ্য ক্রমশই মনুষ্যের জ্ঞাতসারে মনুষ্যের চেষ্টায় প্রকর্ষ লাভ করিতেছে ও ক্রমে করিবে। এক স্থানে অন্ধ সংস্কার; অন্যত্র চক্ষুষ্মতী প্রজ্ঞা। একে জানে না, সে কি

করিতেছে, কেন করিতেছে, না করিলে দোষ কি, ক্ষতি কি। অন্যে জানে, সে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, অকরণে ক্ষতি কি। একত্র পূর্ণ অধীনতা ; অন্যত্র যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য।

মনুষ্য তাহার জাতীয় জীবনের প্রত্যুষকাল হইতে, সম্ভবতঃ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পূর্ব্ব হইতেই, সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে, এবং সে জানে যে সমাজে অবস্থিতিই তাহার পক্ষে জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রধানতম উপায়। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার তাহার ক্ষমতা আছে ; মৌমাছির মত সে এবিষয়ে অন্ধ সংস্কারের দাস নহে। কিন্তু এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাস তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল নহে, তাহা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। সেই জন্য মনুষ্যের সামাজিকত্ব প্রায় মনুষ্যত্বের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যকে পূর্ণ মনুষ্য আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ হয়। মনুষ্যের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক সামর্থ্য হইতে এই সমাজবন্ধনের প্রবৃত্তি। সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য আত্মজীবনরক্ষা ও জাতীয়জীবনরক্ষা ; সমাজবদ্ধ না হইলে মানববংশ এতদিন ইতর জীবের আক্রমণে ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইত। মানুষের পক্ষে এই আর একটা রফা বন্দোবস্ত। সমাজ বাঁধিয়া যেমন কতকটা সুবিধালাভ ঘটে, তেমনি কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতেও হয়। প্রকৃতিবিহিত স্বাতন্ত্র্যকে কতকটা সংযত ও নিয়মিত করিয়া চলিতে হয়।

জীবের জীবনে এই রফা বন্দোবস্তের উদাহরণ পদে পদে ; মনুষ্যের সামাজিক বন্ধন স্বীকার তাহার অন্যতম একটা উদাহরণ মাত্র। সমাজের অধীন হইয়া অবধি মনুষ্য আর আপন ইচ্ছামত স্বতন্ত্রভাবে বিহার ও বিচরণ করিতে পারেন না। যে স্বতন্ত্র বিহার আত্মজীবনের পক্ষে অনুকূল, তাহা অনেক স্থলে সামাজিক জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানবজীবনের একটা ভাগের

সহিত আর একটা ভাগের তুমুল যুদ্ধ। মনুষ্যের আপনার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং এই বিরোধ হইতে পাপপুণ্যের উৎপত্তি। মানুষ যদি বাঘভালুকের মত সমাজ না বাঁধিয়া বাস করিত, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে কেহ থাকিত না; তাহার জীবনে পাপপুণ্যের বিচার উপস্থিত হইত না। আপন সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে কখনও সংস্কারের বশে, কখনও বা প্রজ্ঞার বশে চালিত হইত; কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে অনুকূল হইত; কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইত। নিজ কর্ম্মের ফল সে স্বয়ং ভোগ করিত; একের কর্ম্মফল অপরকে স্পর্শ করিত না। নিজ কর্ম্মের জন্য অপরের নিকট তাহাকে দায়ী হইতে হইত না। কোন কর্ম্মের জন্য সে নিন্দাভাগী বা প্রশংসাভাগী হইত না। আবার তাহার সমাজতন্ত্র যদি মৌমাছির সমাজতন্ত্রের মত সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক সংস্কারের অধীন হইত, নিজ-কর্ম্মে যদি তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারে না থাকিত, অন্ধভাবে যদি সে প্রকৃতির নির্দ্দেশ ও প্রকৃতির প্রেরণা অনুসরণে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিত, তাহা হইলেও তাহার জীবনে পাপপুণ্যের বিচার উঠিত না; এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া কেহ তাহার প্রশংসা করিত না; এ কাজটা মন্দ কাজ বলিয়াও কেহ তাহার নিন্দা করিত না। মনুষ্যজীবন দুইয়ের বাহির; মনুষ্য সমাজমধ্যে বাস করে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত করিতে বাধ্য হয়। আবার মনুষ্যের জীবন সহজাত সংস্কারের সর্ব্বতোভাবে অধীন নহে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে প্রজ্ঞার উপদেশে শিখিতে পারে। তবে প্রজ্ঞা তাহাকে সরলভাবে একটামাত্র পথ দেখাইয়া দেন না। পাঁচটা পথ দেখাইয়া দিয়া কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা গ্রাহ্য, আর কোন্‌টা পরিহর্ত্তব্য, তাহার পরীক্ষা দ্বারা ঠেকিয়া শিখিতে বলেন। এই স্থানে মনুষ্যজীবনে ও ইতরজীবের জীবনে বিভেদ; এই স্থানে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এইখানেই মানবজীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব।

উপরে যতগুলা কথা বলা হইল, তাহা সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে অনুবৃত্তি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।

১। ইতর জীবের জীবন মুখ্যতঃ সহজাত সংস্কারের অধীন। ইতর জীব যেখানে সমাজ বাঁধিয়া বাস করে, সেখানেও সংস্কারের সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব। ইতর জীব প্রাকৃতিক অন্ধশক্তিকর্ত্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হয়; তাহাদের মধ্যে পাপপুণ্যের কথা উঠিতে পারে না।

২। মনুষ্য আহারনিদ্রাদি কতিপয় বিষয়ে সংস্কারের বশবর্ত্তী; কিন্তু অন্যত্র প্রজ্ঞা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। মানবজীবন কোন কোন বিষয়ে প্রাকৃত শক্তির অধীন; কিন্তু অপরত্র মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান; প্রজ্ঞা যে পাঁচটা পথ দেখাইয়া দেয়, মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার কোন একটা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ অনেক সময়ে সংস্কারনির্দ্দিষ্ট পথের বিরোধী হয়। একটা পথ নির্ব্বাচন করিয়া সেই পথে চলিলে যে ফললাভ হয়, মনুষ্য সেই ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে, ও তদ্দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সাবধান হইতে শিক্ষা পায়। প্রজ্ঞা এইরূপে জীবনকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও বলবান্ করে।

৩। মনুষ্য আত্মরক্ষার্থ সমাজ বাঁধিয়া বাস করে; এই সমাজবন্ধন তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন উভয়েরই রক্ষণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনেক সময় বিরোধ ঘটে; যাহা একের অনুকূল, তাহা অন্যের প্রতিকূল হয়। সামাজিক জীবনে মনুষ্যকে আপনার স্বাতন্ত্র্য সংযত করিতে হয়। মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের অনুরোধে, গৌণতঃ ব্যক্তিগত জীবনের অনুরোধে, এই ত্যাগস্বীকার। এই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত না হইলে সমাজ তাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকে শাসন করে, তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা পায়। মানুষের কার্য্যের ফলভোগী সে একা নহে, সমগ্র সমাজ তাহার ফলভোগী; সেই জন্য ব্যক্তির শাসনার্থ সমাজের প্রয়াস। আবার

ব্যক্তিজীবন সমাজের মধ্যে রক্ষিত হয়; সেইজন্য ব্যক্তিজীবনের উপর সমাজের এতটা আবদার। মানুষের এমন কাজই হয়ত নাই, যাহার ফল কেবল তাহার আপনার উপর দিয়াই যায়, সমাজকে কিছু না কিছু তাহার ফলভোগ করিতে হয় না। কাজেই মানুষের প্রত্যেক কাজের উপরেই সমাজের শাসন-বিস্তারে যত্ন; ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক চেষ্টার উপর সমাজের প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা; নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা, দণ্ডবিধান ও পুরস্কারপ্রদান দ্বারা, ভয়প্রদর্শন ও প্রলোভন দ্বারা সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যকেই শাসনে আনিতে চেষ্টা করে। যে সকল কর্ম্ম নিন্দিত ও গর্হিত হয়, সেইগুলা পাপ, যেগুলা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়, সেইগুলি পুণ্য। সমাজের বাহিরে সামাজিক জীবনের বাহিরে পাপপুণ্যের অস্তিত্ব নাই। সমাজজীবনের রক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিগত কার্য্যের এই শ্রেণিবিভাগ। স্থূলতঃ, যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল, তাহার নাম পুণ্য; যাহা সামাজিক জীবনের প্রতিকূল, তাহার নাম পাপ; পাপপুণ্যের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ামক মানবসমাজরূপী বিরাট্ পুরুষ।

৪। ইতরজীবের ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে বা সামাজিক জীবনে কোন্ কার্য্য অনুকূল, সহজাত সংস্কার তাহা অভ্রান্তভাবে দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতি স্বয়ং এই সংস্কারের উৎপত্তির ও বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; সমগ্র জীবনব্যাপার চালনার ভার আপনার হাতে রাখিয়াছেন; ইতরজীবের সমগ্র জীবন যন্ত্রের মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলে। মনুষ্যজীবনে প্রকৃতি এতটা প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখেন নাই। জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহার, নিদ্রা, যৌন-সম্বন্ধাদি কতিপয় ব্যাপারে প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখিয়া মানুষকে প্রজ্ঞা-বশে যথেচ্ছভাবে চলিবার ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কতকটা লোকসান; কেন না, এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেক জায়গায় ঠকিতে হয় ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; কেন না প্রজ্ঞা সংস্কারের

মত কেবল একটামাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করে না। আবার অনেকটা লাভ; কেন না, এই শিক্ষার ফলে প্রজ্ঞার পুষ্টিলাভ ও তৎসহ মনুষ্যজীবনে ক্রমিক উন্নতি। ইতর জীবের জীবন স্থিতিশীল, মনুষ্যজীবন উন্নতিশীল; এবং সেই উন্নতিশীলতা অনেকাংশে আপনার ইচ্ছাধীন ও চেষ্টাসাধ্য।

৫। আত্মরক্ষার জন্য ও বংশরক্ষার জন্য সহজাত সংস্কার মনুষ্যকে এই এই পথে চলিতে বলে; মনুষ্যের প্রজ্ঞা অতীতের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তন্মধ্যে গন্তব্যনির্দ্দেশে সাহায্য করে। অনেক সময় সংস্কার যে পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা সে পথে চলিতে নিষেধ করে। মনুষ্যের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাতন্ত্র্য তাহাকে একটা না একটা পথনির্ব্বাচনে অধিকার দিয়া তাহাকে তাহার ফলাফলের ভাগী করে। প্রজ্ঞা ও সংস্কারে এই একটা বিরোধ মানবজীবনের অঙ্গীভূত। মানবজীবনে আর একটা বিরোধ ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক-জীবন মধ্যে। যে কার্য্য একের অনুকূল, তাহা হয়ত অন্যের প্রতিকূল। সংস্কার বা প্রজ্ঞা, অথবা সংস্কার ও প্রজ্ঞা, উভয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির জন্য যে পথ দেখায়, তাহা কখনও কখনও সামাজিক জীবনের অন্তরায় হয়। তাই সমাজ জোর করিয়া তাহাকে সামাজিক জীবনের অনুকূল পথে, ব্যক্তিজীবনের প্রতিকূল পথে, প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই আর একটা বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানব-জীবনে পাপপুণ্যের উৎপত্তি। দুইটা বিরোধ লইয়া মনুষ্য-জীবন। মনুষ্য-জীবন কেবল বিরোধময়। পাপে ও পুণ্যে সে সনাতন বিরোধ, এইখানে এইরূপে তাহার উৎপত্তি।

৬। মনুষ্য-জীবনে এই বিরোধের অস্তিত্ব দেখিয়া, পাপপুণ্যের চিরন্তন বিরোধ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না শুধু মনুষ্য-জীবন কেন, জীবনমাত্রই কেবল বিরোধ। প্রতিকূল শক্তিসমূহের পরস্পর সংগ্রামই জীবনের সংজ্ঞা। এই বিরোধের, এই সংগ্রামের, নামান্তরই জীবন। এই বিরোধেই জীবনের পরিপুষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই

বিরোধেই জীবে ও জড়ে প্রভেদ। মানব-জীবনে এই সনাতন বিরোধ যে নূতন আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাই মানবজীবনের লক্ষণ, তাহার ফলেই মানবজীবনের উন্নতি ও পরিণতি। তাহাতেই মানব-জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব। এই বিরোধের তীব্রতাসহকারে মানবজীবনের পরিপুষ্টি। পাপের অস্তিত্ব দেখিয়া ভীত হইও না; জগতের বিধাতার ও সৃষ্টিকর্ত্তার উপর, সেই বিধাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন তাঁহার উপর, বৃথা নিন্দাভার অর্পণে প্রয়াস করিও না। আঁধার ও আলোকের সমবায়ে পরিদৃশ্যমান জগৎ; সেইরূপ পাপ ও পুণ্যের সমবায়ে মানবের জীবন। জগৎ হইতে আঁধার সরাইয়া ফেল, আলোকের শেষরশ্মি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইবে; পরিদৃশ্যমান জগৎ সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ পাইবে। মানবজীবন হইতে পাপের অস্তিত্ব সরাইয়া ফেল, পুণ্য বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু থাকিবে না। পাপ ও পুণ্যের বিলোপে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার জীবন নাম দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহা মানবজীবন এই গৌরবময় আখ্যার অধিকারী হইবে না।

পাপপুণ্যের উৎপত্তি, কিরূপে হইল, কতকটা বোঝা গেল; কিন্তু একটা সমস্যার আলোচনা এখনও আবশ্যক। কোন্ কাজটা পাপ? কোন্ কাজটা পুণ্য? ইহার মীমাংসা করিবে কে? যাঁহারা এই মীমাংসার নিমিত্ত এক কাল্পনিক বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা এক নিশ্বাসে প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাঁহাদের কৌশল প্রশংসনীয়, কিন্তু ফলপ্রদ নহে। সেই বিধাতা পুরুষ একদিন অকস্মাৎ বলিয়া দিলেন, এই এই কাজ ভাল, এই এই কাজ মন্দ। সেই দিন সেই শুভক্ষণে পাপপুণ্যের তপশীল বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। কোন সৌভাগ্যশালী মানব কোনরূপে সেই তপশীলটা হস্তগত করিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই খাতাটা খুলিয়া দেখ; আর কোন চিন্তা থাকিবে না।

একখানা পাকা খাতায় পাপপুণ্যের তপশীলটা লিপিবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানব-সমাজে এইরূপ অনেকগুলি তপশীল বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা যায়; কোন্‌টা প্রকৃত ও কোন্‌টা জাল তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। আপন আপন দলের খাতার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন দলমধ্যে ঘোর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং বিতণ্ডা ক্রমে তীব্র হইয়া শোণিতপাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন্ খাতাখানা জাল ও কোন্‌খানা অকৃত্রিম, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে।

পাপ কি? না, যাহা সমাজজীবনের প্রতিকূল। পুণ্য কি? না, যাহা সমাজজীবনের অনুকূল। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে ইউটিলিটি বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে হিতবাদ বলা হয়, অনেকটা সেই ভাব আসে বটে, কিন্তু ঠিক্ সেই ভাবই আসে না। ইউটিলিটির তাৎপর্য্য যদি greatest good of the greatest number হয়, অধিক সংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃসাধনমাত্র হয়, তাহা হইলে ইউটিলিটির দ্বারা পাপপুণ্যের বিচার সর্ব্বত্র চলিবে না। কেননা, প্রথমতঃ অধিকসংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃসাধনই যে সর্ব্বত্র সামাজিক জীবনের শ্রেয়ঃসাধন, তাহা বলা যায় না; দ্বিতীয়তঃ যাহা বর্ত্তমানকালে শ্রেয়ঃসাধন, তাহা ভবিষ্যতে হিতকর না হইতেও পারে, এবং সমাজজীবনে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের হিসাবই অধিক গ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ শ্রেয়ঃ শব্দের অর্থ কি, তাহা লইয়াই অনেক বিতণ্ডা চলিতে পারে, উহার সংজ্ঞানির্দ্দেশ অনেক সময় অসম্ভব। সচরাচর পণ্ডিতেরা যাহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রেয়ঃ না হইতেও পারে; শ্রেয়ঃ শব্দের ব্যবহারেই নানা আপত্তি আসে। যাহাই হউক, ইউটিলিটির কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত অর্থ গ্রহণ

করিলে অনেকটা আপত্তি কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মূলের কথা এখনও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। সমাজজীবনের যাহা অনুকূল, তাহাই যেন পুণ্য হইল; কিন্তু সমাজজীবনের অনুকূল কি, তাহা স্থির করিবে কে? এই কাজটা অনুকূল কি প্রতিকূল, এইরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে? এই মীমাংসার জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? মনুষ্যজাতির যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা বলিতেছে, যে পারা যায় না। প্রকৃতি মনুষ্যকে এমন কোন সংস্কার দেন নাই, যাহার সাহায্যে এই মীমাংসা অভ্রান্তভাবে চলিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সঙ্কীর্ণ, তাহার দূরদৃষ্টি এত অল্পপ্রসর, তাহার নির্দ্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধাভাবযুক্ত, যে তাহার উপরও নির্ভর করা চলে না। ফলেন পরিচীয়তে, এই ব্যবস্থার উপর অনেক সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা চলে। কোন্ কার্য্যটা সমাজজীবনের অনুকূল? না, যাহা এত কাল পর্য্যন্ত, মানবজীবনের অতীত ইতিহাস ব্যাপিয়া, সুফল প্রদান করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যসমাজ যুগযুগান্তরের শিক্ষালাভে যাহাকে ভাল বলিয়া শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিয়াছে; যাহা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নহে, যাহা সমগ্র মানবজাতির, সমগ্র মানবসমাজের কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জ্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। এই অভিজ্ঞতার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। কোন্ দিন কোন্ ক্ষণে মানবজাতির এই জ্ঞানলাভ আরব্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা জানে না। পুরুষপরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে মাত্র। পুরুষের স্থান পুরুষান্তরে গ্রহণ করিতেছে। শত কোটি পিতার স্থান শত কোটি পুত্রে গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের মুখ হইতে পরপুরুষ সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু কবে কোথায় বাণীর আরম্ভ, তাহা

কেহ জানে না। চিরকাল সকলেই শুনিয়া আসিতেছে; প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহা কে জানে? প্রথমে সেই বাণীর কে রচনা করিয়াছিল, তাহা কে জানে? মানবের জাতীয় জীবনের যে দিন আরম্ভ, সেই দিনই বুঝি তাহার আরম্ভ। অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে সেই বাণী প্রচলিত আছে, সেই কথার সূত্র আরম্ভ হইয়া আছে। মানব-জীবন বিশ্বমধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই; সহসা একদিন ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বহুযুগের তপস্যার ফলে, বহুযুগের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ও যৌন নির্ব্বাচনে ও অপরবিধ নির্ব্বাচনে পুরাকালের অমানুষ অদ্যকার মানুষে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্যত্বের আরম্ভ কবে, কেহ বলিতে পারে না; মানুষের জাতীয় অভিজ্ঞতারও আরম্ভ কবে তাহা কেহ জানে না। এই পুরাণ কথার আদি অনুসন্ধান করিতে গেলে অতীতের মহান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়; সেখানে মনুষ্যত্ব অবিকশিত অস্ফুট জীবত্বে বিলীন। জীবত্বেরই বা আদি কোথায়? আদি যদি কোথাও অনুমান করিতে পারা যায়, সেখানে জীবত্ব জড়ত্বে লীন হইয়া রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে বিভেদ দেখা যায় না। জগতের যিনি আদি পুরুষ, যিনি আদি মানব, যিনি আদি জীব, যিনি আদি জড়, তিনিই বুঝি সেই পুরাণ কথার আদি কথক; তদবধি সেই কথা জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ঐতিহাসিককালে মানবসমাজে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইতেন; প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে তাঁহারা অন্যে যাহা দেখিতে পায় না তাহা দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম ঋষি; তাঁহারা যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি। তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরা, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাম স্মৃতি।

বর্ত্তমান কালে সেই পুরাতনী বাণীর, মানবজাতির সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার, শ্রুতি স্মৃতি যাহার ব্যবস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে তাহার, তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া কে দিবে ? ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করা চলে না; মনুষ্যমাত্র একদেশদর্শী; মনুষ্যমাত্রেই পাশবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উদ্ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে এক পথ দেখাইতেছে, সহজাত প্রাকৃতির সংস্কার তাহাকে অন্য পথে চালাইতেছে। মনুষ্যের জীবনতরী কর্ম্মসাগরে ভাসিতেছে; কোন্ পথে যাইতে হইবে, মানুষ ঠাহর পায় না। তবে মনুষ্যের মধ্যেও আবার ইতরবিশেষ আছে; মনুষ্যসমাজ একবাক্যে যাঁহাদিগকে কাণ্ডারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অগত্যা তাঁহাদিগের আশ্রয় লইতে হয়। সাধুসম্মত মার্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাহা হেঁয়ালির মত ঠেকে, তখন মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সংশয়সমাকুল মানবের নিকট শ্রুতি যখন নানারূপে কথা বলে, স্মৃতি যখন স্পষ্ট উপদেশ দেয় না, ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন আঁধার গুহায় নিহিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মহাজন-সেবিত মার্গ অবলম্বন করিতে হয়। মহাজনের পন্থাই তখন পন্থা, সাধুসম্মত সদাচার তখন ধর্ম্মের প্রমাণ।

তবে তোমাকে আমাকে কি চিরদিন পরের হাত ধরিয়াই চলিতে হইবে? শ্রুতির অর্থ যখন বুঝিতে পারি না, স্মৃতি যখন হেঁয়ালিতে কথা কহে, তখন কি তোমার আমার মত প্রজ্ঞাবলহীন ব্যক্তিকে কেবল সাধুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের অভ্যন্তরে শক্তি কি কিছুই নাই? আমরা কি কেবল অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব? আমাদের মেরুদণ্ড কি এতই দুর্ব্বল যে, আমরা অপরের আশ্রয় না পাইলে সংসারের সমাজক্ষেত্রে আপনার চরণদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া বিচরণ করিতে পারিব না? যখন অন্যের সাহায্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে,

তখন কি এই মহাহবে আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দলিত পীড়িত পিষ্ট হইতে হইবে? জগতের এই কি বিধান? জীবজগতের উন্নততম পদবীতে অবস্থিত মনুষ্যের পক্ষে এই কি ব্যবস্থা? প্রকৃতি আমাদিগকে প্রবল সংস্কার ও দুর্ব্বল প্রজ্ঞা দিয়া এই সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন; আমরা কি তৃণের মত বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইব? আমরা কি নিজ যত্নে গন্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ হইব না? যে ধর্ম্মমীমাংসার সহিত আমাদের জীবন-যাত্রার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্ম-মীমাংসায় আমরা স্বয়ং কি একেবারে অক্ষম?, অন্যে না চিনাইয়া দিলে আমরা ধর্ম্মকে চিনিতে পারিব না; অন্যে না বলিয়া দিলে কি আমরা অধর্ম্মকে পরিহার করিতে পারিব না? মনুষ্যের অবস্থা কি এমনই শোচনীয়?

প্রত্যেক সুস্থ মনুষ্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবে—না আমাদের প্রত্যেকের অন্তস্তলে একজন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্য-মার্গের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেখানে উপদেশ দেয় না, অথবা তাহাদের উপদেশ যেখানে আমরা বুঝিতে পারি না, সেখানে তাঁহার সেই নীরব বাণী নিঃশব্দে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ দেখাইয়া দেয়। সেই নীরব বাণী কাহার? আমাদের হৃদিস্থলে কোন্ হৃষী-কেশ অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিতেছেন? কোন্ কর্ণধার সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়া আমাদের জীবনতরীকে পথভ্রষ্ট হইতে দিতেছেন না? ইংরেজি ভাষায় যাহাকে বলে conscience—বাঙ্গালায় যাহার নাম দিতে পারি সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইহাই সেই অন্তর্য্যামীর প্রেরণা।

মানবের হৃদি স্থিত সেই অন্তর্য্যামীর প্রেরণা অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ করে। মনুষ্য জন্মমাত্রই এই অন্তর্য্যামীর অধীনতা আশ্রয় করে। সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র; এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেইরূপ কারণ দেখায় না, একবারে বাদশাহের মত হুকুম চালায়। বলে—এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ;

কেন ভাল, কেন মন্দ, তাহার কোন কৈফিয়ত দেয় না; ইউটিলিটির হিসাব বা অন্য কোন হিসাব দিতে চায় না, কোনরূপ পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয়, কিছুই দেখায় না। একবারে বলিয়া ফেলে, এই পথটা ভাল, এই পথে চল; এই পথটা মন্দ, এই পথে চলিও না। মনুষ্য যদি মন্দ পথে চলিতে যায়, তখন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরে; মনুষ্য যখন ভাল পথে চলে, তখন নীরব উৎসাহধ্বনি দ্বারা তাহার পুরোগতির বেগ বাড়াইয়া দেয়। এই অদ্ভুত মানবধর্ম্ম, যাহার সহিত পাশব সংস্কারনিচয়ের এই অংশে সাদৃশ্য আছে, অথচ তাহার সহিত পাশবধর্ম্মের সামান্যমাত্র নাই, মানবেতর পশু যাহাতে পূর্ণমাত্রায় বঞ্চিত, এই বিশিষ্ট মানবধর্ম্মের বর্ত্তমান বিকাশ কিরূপে হইল, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা চিরকাল কোলাহল করিয়া আসিতেছেন; সেই কোলাহলে সম্প্রতি প্রবেশে আমার প্রবৃত্তিমাত্র নাই। আমি এই বলিয়াই নিরস্ত হইব যে, মানবের সামাজিক জীবনে ব্যক্তিসমষ্টির সহিত ব্যক্তিসমষ্টির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের, সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘের, বর্ণের সহিত বর্ণের, জাতির সহিত জাতির, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের যে ভীষণ দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই ভীষণ দ্বন্দ্বের পরিণামফলে, সেই ভীষণ দ্বন্দ্বে যোগ্যের জয়ে ও অযোগ্যের পরাজয়ে, এই বিশিষ্ট মানবধর্ম্মের অভিব্যক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে কিঞ্চিৎ উত্তর মিলিতে পারে। যে সনাতন বিরোধ জীবের জীবনের মূলস্থলে বর্ত্তমান, যে বিরোধে জীবের অভিব্যক্তি ও জীবনের উন্নতি, যে বিরোধে জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব, মনুষ্যসমাজে সেই সনাতন বিরোধের আকারভেদ হইতেই মনুষ্যের এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্ভব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পূর্ণ উত্তর পাইতে হইলে সম্ভবতঃ এই বিশ্বব্যাপারের —এই বিশ্ব-সৃষ্টির—মূলতত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে বিরোধ, যে ত্যাগ, যে যজ্ঞ, যে মায়া, যে লীলা, এই বিশ্বব্যাপারের হেতু, সেই

হেতুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; সময়ান্তরে এই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

সে যাহাই হউক, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর পরিতোষ সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। আর পঞ্চম প্রমাণের কল্পনা বোধ করি অনাবশ্যক।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয় এবং সকলে মিলিয়া চোরকে পুলিশে দেয়। ইহার অর্থ কতকটা বুঝা যায়। কেননা চুরি ব্যাপারে এক পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ হইলেও অপর পক্ষের সম্পূর্ণ হানি। অতএব চোরের কৃত কর্ম্ম অপর পক্ষের আপত্তিজনক হইবেই, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

আমার আর এক শ্রেণির কর্ম্ম আছে, তাহাতে কেন যে আমার প্রতি-বেশিবর্গের চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং আমার শাসনের জন্য তাঁহাদের একটা বলবতী স্পৃহা জন্মে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। মনে কর আমার প্রতিবেশিবর্গ কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদের পরকালে এবং ইহকালে নানাবিধ শ্রেয়ঃ সংসাধিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। আমি তাঁহাদের বিশ্বাসের কোনরূপ সমালোচনা করিতে চাহিনা এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠানেও কোনরূপ বাধা প্রদান করি না। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যোগ দিতে আমাকে উৎসাহিত না করে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেন আমাকে নিগৃহীত করিবেন, আমি তাহা বুঝিতে অসমর্থ। ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য যাহা কিছু প্রত্যবায়, তাহা আমারই ঘটিবে ; আমার প্রতিবেশীদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইবে না ; এবং তাঁহারা যে সকল শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন, আমিই সে সকল শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব। হানি হইবে আমার এবং আমি সেই হানিস্বীকারে প্রস্তুত আছি ; অন্যের তাহাতে মাথাব্যথা ঘটে কেন ?

পীনাল কোডে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে যে সকল মহাপাতকের

উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাই প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিরোধাচরণের মত সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় নহে; চোর ও ব্যভিচারী রাজশাসনে দণ্ডিত হইলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত রাজশাসনে ধর্ম্মবিরোধীর দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা নাই। সে সমাজের নিকট উৎকট পাপে পাতকী; সমগ্র সমাজের শক্তি তাহাকে উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানগত দ্বেষাদ্বেষির উদাহরণ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। শুনা যায় নাকি এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতভেদ লইয়াই প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে ঘোর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই গৃহবিবাদের ফলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইরাণী আর্য্য-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় বৌদ্ধগণের নির্য্যাতনও সম্পূর্ণ উপকথা না হইতে পারে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মবিদ্বেষের ফল যতই কিছু হউক, খ্রীষ্টান ইয়ুরোপ এ বিষয়ে সকলের উপর বাহবা লইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস শোণিতের এবং আগুনের অক্ষরে এই ধর্ম্মবিদ্বেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অথবা এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতভেদের জন্য কত নরহত্যা ঘটিয়াছে, সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া তাহার ধারাবাহিক বিবরণই খ্রীষ্টান ইয়ুরোপের ইতিহাস।

অথচ ইহা সর্ব্বত্রই নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত যে পাষণ্ডের ও নাস্তিকের জন্য চৌষট্টিটা নরককুণ্ডে গন্ধকের আগুন সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। যে পাষণ্ড ও নাস্তিক, সে জানিয়া শুনিয়াই পরকালের এই ভীষণ শাসনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; তবে কেন তোমরা তাহার প্রতি ইহলোকেই যমদণ্ড-প্রয়োগে ব্যস্ত হইতেছে?

তাহার পক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য সে স্বয়ং দায়ী; সে নিজেরই অনিষ্টসাধন করিতেছে। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের অনিষ্ট করে নাই; তাহার অপরাধে অন্যে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না। মাতাল যতক্ষণ ঘরে বসিয়া মদ খায়, পথে দাঁড়াইয়া উৎপাত না করে, ও পরের ছেলেকে প্রলোভিত না করে, ততক্ষণ সে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতে পারে বটে; কিন্তু অপরে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না। এইটুকু স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা জনসমাজ তাহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ না দিয়া আপনারই পরকাল বিপন্ন করে, অপরকে সেই পথে প্রলোভিত করে না, সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রতি সমাজ কেন যে এত নিষ্করুণ, তাহার কারণ বুঝা কঠিন। তাহাকে নিন্দা কর, ঘৃণা কর, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার পরকালের জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন উপস্থিত হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহাকে তাহার কর্ম্মের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে দাও; তোমারই মতে পরকালে তাহার যথোচিত শাস্তি বিহিত রহিয়াছে; ইহকালে তাহার শাসনের জন্য তোমার এত মাথাব্যথার প্রয়োজন কি?

ইংরেজিতে যাহাকে রিলিজন বলে, এই প্রবন্ধে তাহাকেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। দুঃখের বিষয় আমাদের ভাষায় রিলিজনের ঠিক প্রতিশব্দ নাই। আমাদের ধর্ম্ম শব্দটিকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতে এইজন্য বাধ্য হইলাম। সমাজের সহিত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্বন্ধ একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কোন না কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেরই সাধারণ অঙ্গ বুঝিতে হইবে। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বা শক্তি-সমূহে বিশ্বাস ও নিতান্ত অন্ধভাবে তাহার প্রীতিসম্পাদনই প্রচলিত সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য। কাহারও মতে একজন সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্-যন্ত্র চালাইতেছেন; কাহারও মতে হয়ত একজন বিধাতা

কোনরূপ সিণ্ডিকেটের বা কমিটির সাহায্যে জগৎ শাসন করিতেছেন; আবার কাহারও মতে বা বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ব্যক্তি গোলেমালে একরূপে জগতের কলটা চালাইতেছেন। কাহারও মতে জগতের কল একরূপ আপনা হইতেই চলিতেছে, সেই দেবগণ বা অপদেবগণ মাঝে হইতে উপস্থিত হইয়া হস্তক্ষেপ করেন মাত্র; কেহ গোল বাধান, কেহ গোল সারেন; কেহ ভাঙ্গেন, অপরকে তাহা মেরামত করিয়া লইতে হয়। দেবতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই রূপ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত আছে; এবং এক একটা দেবতত্ত্বের অনুবর্ত্তী এক একটা নির্দ্দিষ্টরূপ উপাসনাপদ্ধতিও প্রচলিত আছে। দেবতত্ত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সমষ্টিকে ধর্ম্মের প্রাণ, এবং উপাসনা-পদ্ধতি ও তদানুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মের শরীর বলা যাইতে পারে। সমাজের মধ্যে কতিপয় বাছাই লোকে ধর্ম্মের প্রাণ অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাগ লইয়া আলোচনা করে; ইতর সাধারণে তাহা শুনে এবং বুঝিয়া বা না বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া চলে। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে ইতরভদ্র ও পণ্ডিতমূর্খ সকলেই সমান ভাবে বাধ্য। এই অনুষ্ঠান কে কতখানি পালন করিয়া চলে, তাহার দ্বারাই সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থার মাত্রা পরিমিত হয়। তেত্রিশ কোটিতে তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক আর নাই থাক, পথপার্শ্বে সিন্দুরচিহ্নিত শিলাখণ্ড দেখিলেই মাথা নোয়াইতে ভুলিও না; তাহার উপর মালা, তিলক ও নামাবলির ব্যবহারে কার্পণ্যহীন হইতে পারিলেই সমাজমধ্যে তোমার যশের আর ইয়ত্তা থাকিবে না; তোমার অন্তরের ভিতরে কোথায় কি আছে, অনুসন্ধান করিয়া কেহ তোমার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে না। আর তোমার অন্তরে গভীর ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকিলেও যদি প্রচলিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসাধনে কোন ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলে পরকালে ধর্ম্ম-রাজ তোমাকে ছাড়িয়া দিতেও পারেন; কিন্তু ইহকালে তোমার নিস্তারের কোন আশাই বর্ত্তমান নাই।

এমন কেন হয়? খুজিলে কি ইহার উত্তর মিলে না? ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ এত কাতর কেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমাজদ্রোহেরই প্রকারভেদ বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার কারণ কি? চোরের ও হত্যাকারীর ক্ষমা আছে; স্বধর্ম্মত্যাগীর ক্ষমা নাই কি জন্য?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও ইংরেজি রিলিজন অর্থে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করিতে এই প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বাধ্য হইতেছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মশব্দে মনুষ্যের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে বুঝায়। ইংরেজি রিলিজন শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইংরেজিতে 'মরালিটি' বলিয়া আর একটা শব্দ আছে, সে শব্দটাও আমাদের ধর্ম্মের ভিতরে আসিয়া পড়ে। স্থূলতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, অতিপ্রাকৃতের সহিত মানুষের কারবার লইয়া রিলিজন এবং মানুষের সহিত কারবার লইয়া মরালিটি। মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে বহুস্থলে মেশামিশি হইয়া গিয়া রিলিজন ও মরালিটির একটা সম্পর্ক জন্মিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করিলে অনেক কূট বিতণ্ডার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় রিলিজন এবং মরালিটির জন্য পৃথক্ শব্দের ব্যবহার নাই। অগত্যা আমরা রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম ও মরালিটি অর্থে নীতি শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম।

ধর্ম্মের অর্থাৎ রিলিজনের আবশ্যকতা লইয়া বহুকাল হইতে দুইটা দলে ঘোর বিসংবাদ চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে এরূপ কোন বিসংবাদ নাই। নীতি না থাকিলে সমাজের স্থিতি ও গতি একেবারে অসম্ভব হইত, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ধর্ম্মের সম্বন্ধে এইরূপ একমত দেখা যায় না। এক দল ধর্ম্মকেই মনুষ্য জাতির প্রধানতম সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যত্বের কোন গৌরব নাই, এইরূপ বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম হইতেই

নীতির উৎপত্তি, যেখানে ধর্ম্ম নাই সেখানে নীতি ভিত্তিহীন, এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস। অপর এক দল আছেন, তাঁহারা অতিপ্রাকৃতে শ্রদ্ধাহীন, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য। স্থানবিশেষে ধর্ম্ম নীতির সাহায্য করিয়া মানুষের উপকার করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ধর্ম্ম হইতে মানুষের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি, মানুষের ইতিবৃত্তের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস জ্ঞানের এবং সন্নীতির প্রবল অন্তরায় স্বরূপে মনুষ্যজাতির শত্রুস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে। আর ধর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠান, দেবতাপ্রসাদনার্থ যে সকল কৌশল বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের মূলে যুক্তিও নাই, নীতিও নাই। বালকের চপলতা, বাতুলের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষের ভীরুতা হইতে তাহাদের উদ্ভব। যত শীঘ্র তাহারা লোপ পায়, মনুষ্যের পক্ষে ততই কল্যাণ।

এক দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্ম্ম অনেক স্থলে জ্ঞানের অন্তরায় ও নীতির অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন সাধন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তথাপি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবসভ্যতার প্রভাতাগম অবধি বিংশ শতাব্দীর উন্নতির কোলাহল মধ্যেও সহস্র দেবমন্দির ও গির্জ্জাঘর ও মসজিদের উন্নত চূড়ার নিম্ন দেশে কোটি কোটি নরনারী হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতার ও শ্রদ্ধার সহিত অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করিলে ঐতিহাসিক সত্যের নিকট অপরাধী হইতে হয়। মানবেতিহাসের বিস্তীর্ণ কাহিনী হইতে তাড়িত যন্ত্র ও বাষ্পীয় যান, আরিষ্টটল ও নিউটনকে বর্জ্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই মন্দির ও মসজিদগুলির বিবরণ বর্জ্জন করিলে ইতিহাস জীর্ণ শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে যুক্তি থাক্ আর নাই থাক্, ইহার মত সত্য ঘটনা মনুষ্যের ইতিহাসে অস্তিত্বহীন।

মনুষ্যের ইতিহাসে বোধ হয় এমন দিন ছিল, যখন নীতির শাসনের

উদ্ভব হয় নাই, যখন রাজশাসনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। ধর্ম্মানুষ্ঠানই তখন মনুষ্যসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখনও পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য সমাজ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পর্য্যালোচনা হইতে এইরূপ অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়।

মনুষ্যেতর জীব সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যে নৈতিক শাসন ও ধর্ম্মশাসন ও রাজশাসন, লোকাচার ও দেশাচার, সকলই অস্তিত্বহীন। জীবনসংগ্রামে তাহারা আপন আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত নিরত আছে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে সেখানে সবলের ও সমর্থেরই জয়।

মনুষ্যনামধেয় জীব ব্যাঘ্রের দংষ্ট্রা ও সর্পের হলাহল লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয় নাই। অথচ তাহার দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় ও ভঙ্গুর শরীর লইয়া বলবত্তর ইতরজীবগণের সহিত জীবনসমরে সে প্রকৃতিকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল।

অথচ সে জীবজগতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কতকটা তাহার বুদ্ধির বলে, কতকটা তাহার দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যবশে।

এইরূপে মনুষ্যের সমাজের উৎপত্তি হয়। ইতর বলবত্তর জীবের সহিত সংগ্রামে জয়লাভের জন্য মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছিল।

মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; ইতর জীব তাহাতে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু সমাজমধ্যেও মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সমর তখনও চলিয়াছিল; অদ্যাপি ক্ষান্ত হয় নাই।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় সিংহ, ভল্লুক ও বৃকের সহিত, ম্যামথ ও মাষ্টোডনের সহিত তাহাকে যেমন নিয়ত সংগ্রাম করিতে হইত, মনুষ্যের প্রাথমিক সমাজের অভ্যন্তরেও মানুষের সহিত মানুষের জীবনসংগ্রাম কোন অংশে তীব্রতায় তদপেক্ষা হীন ছিল না।

এবং সেই প্রাথমিক সমাজের প্রাথমিক মনুষ্য যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নৈতিক অংশে ইতর জীবের মানসিক প্রকৃতি অপেক্ষা বড় অধিক উন্নত ছিল না; কেন না সেই মানসিক প্রকৃতি জীবন সমরে তাহার অনুকূল ছিল; এবং বলা বাহুল্য যে এ জগতে নিরীহ নীতিপরায়ণ জীবের সর্ব্বদা আহার লাভ ঘটে না। দুঃখের বিষয়, কিন্তু সত্য কথা।

অর্থাৎ অন্যান্য ইতর জীবের ন্যায় মুষ্টিমিত আহারের ভাগের জন্য মনুষ্যও আপনাদের মধ্যে নখানখি, দন্তাদন্তি ও রক্তারক্তি করিত; এ বিষয়ে ভল্লুক ও বাঘের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল না; এবং এই পাশবিক জীবনদ্বন্দ্বে নখানখি ও রক্তারক্তি আজিও যে থামে নাই, প্রাত্যহিক সংবাদপত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি হইতে দুইটা প্রতিকূল শক্তি সেই সমাজকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ রাখিয়াছে। প্রথমতঃ, মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য; নতুবা জীবনসংগ্রামে ইতর জীবের নিকট তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া সমাজ বাঁধিয়া থাকিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে আপনার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে সংযত করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পরাধীনতার মূল; এবং দল বাঁধিতে হইলেই অন্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হইবে; স্বভাবদত্ত ছয়টা রিপুর মুখে বল্গা ধরিতে হইবে। ইহাই সর্ব্ববিধ সামাজিক শাসনের মূল। ইহা হইতে মনুষ্যসমাজের স্থিতি; ইহা হইতেই মনুষ্যত্বের মহিমা ও গৌরব।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষকে পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইবে; নতুবা আহার জুটিবে না, নতুবা মানুষের ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি ও বিকাশ ঘটিবে না। পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ অল্প; খাদকের সংখ্যা অধিক। কাড়াকাড়ি করিয়া না খাইলে চলিবে না। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত

উন্নতির মূল; কিন্তু পশুর সহিত মনুষ্যের এইখানে সমতা। ইহা সমাজ বন্ধনের প্রতিকূল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা উন্নতিরও একমাত্র উপায়।

এই দুইটা শক্তি পরস্পর প্রতিকূল, অথচ কোন না কোনরূপে কতকটা সমন্বয়ের ও সামঞ্জস্যের বিধান করিয়া মনুষ্যকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় নীত করিয়াছে।

মনুষ্য বাধ্য হইয়া আপনার পায়ে অধীনতার নিগড় পরাইয়াছে এবং সেই অধীনতার নিগড় পরিয়া কথঞ্চিৎ যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। যেখানে স্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত, সেখানে সমাজবন্ধন ছিন্ন হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হয়। যেখানে স্বাতন্ত্র্য অন্তর্হিত, সেখানে সমাজ উত্থানশক্তি রহিত হয়; উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়।

এই অধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যগত সীমারেখা কোথায়? কে বলিয়া দিবে কোথায় কোন্‌খানে রেখা টানিলে উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিবে, স্থিতি বজায় থাকিবে অথচ উন্নতি প্রতিহত হইবে না? অদ্যাপি ইহাই রাষ্ট্রনীতির ও ধর্ম্মনীতির প্রধানতম সমস্যা।

মনুষ্যের সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বাতন্ত্র্যমুখে; সেই প্রবৃত্তিকে দমন ও নিরোধ করিতে হয়। নহিলে সমাজ টিকে না। নতুবা মানবিকত্ব পাশবিকতার নিকট জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও অবসন্ন হয়। এই সমস্যা মনুষ্যের জীবন-মরণঘটিত।

স্বাভাবিক সংস্কারগুলি মানুষের আত্মরক্ষার অনুকূল; পরকে অভিভূত করিয়া আপনাকে বাড়াইবার জন্য তাহাদের উৎপত্তি। কিন্তু তাহারা সমাজ-শক্তির প্রতিকূল; সমাজশক্তি তাহাদিগকে রিপু আখ্যা দেয় এবং মানুষের ছয়টা রিপুকে শাসনে রাখিতে চায়।

দেশভেদে ও কালভেদে মনুষ্য নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে; নানা দেশে নানা সমাজ বাঁধিয়াছে। সমাজে সমাজে জীবনযুদ্ধ চলিয়াছে। যে

সমাজে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যত নিয়মিত, সে সমাজ তত সংহত, সমর্থ ও জীবনযুদ্ধে বলীয়ান্।

সমাজরক্ষার নিমিত্ত, অর্থাৎ সমাজের আশ্রয়ে গৌণভাবে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, সামাজিক মনুষ্য প্রথমে যে শিকল গড়াইয়াছিল, সামাজিক মনুষ্যমাত্রই যে শিকলে আপনাকে বাঁধা রাখিতে অদ্যাপি বাধ্য, তাহার নাম করিতে হয়ত অনেকের লোমহর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহার নাম পরতন্ত্রতা বা বশ্যতা। সামাজিক জীবের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। যেখানে এই ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সমাজের অবস্থা ভয়াবহ।

শাদা কথায় ইহার অর্থ বড় ভয়ঙ্কর। তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা তুমি পাইবে না; তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে যে দিকে টানিতেছে, সে দিকে তোমার গতি রুদ্ধ; তোমার বুদ্ধি, তোমার যুক্তি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে, সে পন্থা তোমার নিকট নিরুদ্ধ। সমাজের প্রবৃত্তি তোমার প্রবৃত্তিকে চালিত করিবে; সমাজ যাহাকে নীতিমার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, তোমার নৈতিক প্রবৃত্তি তাহার বিপরীত মুখে তোমাকে লইতে পারিবে না। তোমার প্রবৃত্তি, তোমার নৈতিক বৃত্তি, যদি তোমাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি সমাজদ্রোহী পাতকী; অন্যত্র তোমার মার্জ্জনা থাকিতে পারে, সমাজের নিকট তোমার ক্ষমা নাই। নীতিবিৎ, তুমি চকিত হইও না, বশ্যতাই সামাজিক মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মের স্থান তাহার পরে। সামাজিক জীব সমাজের বেতনভোগী সৈনিকমাত্র; সৈনিকের পক্ষে বশ্যতা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই।

সমাজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট আপন ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিদান দিবে; সমাজের নীতির নিকট আপন নীতিকে বলিদান দিবে। হইতে পারে তোমার মার্জ্জিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি প্রচলিত নিকৃষ্ট সামাজিক বুদ্ধির ও নিকৃষ্ট সামাজিক নীতির অনুমোদন করে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়;

প্রথমে তোমার সামাজিকতা, পরে তোমার ব্যক্তিগত ভাব। সমাজধর্ম্মের সমীপে ব্যক্তির ধর্ম্মের আসন নাই।

সামাজিক জীবের এই বশ্যতা স্থানভেদে ও পাত্রভেদে নানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোথাও ইহা পিতৃভক্তি বা গুরুভক্তি, কোথাও রাজভক্তি, স্বদেশভক্তি বা স্বজাতিভক্তি নাম ধারণ করিয়াছে। এই ভক্তি সর্ব্বত্র মনুষ্যহৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্ছ্বলিত না হইতে পারে; সেখানে ইহার স্বতঃ উচ্ছ্বাস ও স্বতঃ বিকাশ নাই, সমাজ যেখানে বলপ্রয়োগে ও দণ্ডপ্রয়োগে আপন দাওয়া ষোল আনা বুঝিয়া লয়।

জীবনসমরে নিরত পশুধর্ম্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাকে চুরি করিতে ও মিছা কথা কহিতে প্রলোভিত করে। কিন্তু সমাজ যে দিন তাহাকে চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না ইত্যাদি নঞ্‌যুক্ত আদেশবাণী শুনাইতে আরম্ভ করে, সেই দিন নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। যেখানে ব্যক্তিগণ আপন স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এই নীতিশাস্ত্রের আদেশ মানিতে চাহে, সেই খানেই সমাজের বলবৃদ্ধি হয়; অথবা যে যে সমাজে সামাজিকগণের প্রকৃতি এই নীতিশাস্ত্রের বশীভূত হয়, সেই সেই সমাজই জীবনযুদ্ধে টিকিয়া যায়; যে সমাজে এই আদেশ পদে পদে লঙ্ঘিত হয়, সে সমাজ অন্য সমাজের নিকট জীবনযুদ্ধে ধ্বংস পায়।

কিন্তু মনুষ্যের পশুপ্রকৃতি সহজে মানুষকে এই নীতিশাস্ত্রের ব্যবস্থায় কর্ণপাত করিতে দেয় না। সামাজিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে পশুর ভাব পরিহার করিয়া সামাজিক ভাব লাভ করিতে মানবপ্রকৃতি বহুদিন অপেক্ষা করে। নির্ব্বাচনের ফল বহুদিনে ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়। এই জন্য অর্থাৎ সমাজরক্ষার্থ উদ্ধত সামাজিক জীবকে বশে রাখিবার জন্য অন্যবিধ বলের প্রয়োজন, অন্যবিধ প্রভুশক্তির আবশ্যকতা। যেখানে

এই প্রভুশক্তি বর্ত্তমান, এই শক্তি কার্য্যকরী, সেইখানে সমাজের অবস্থা আশাপ্রদ।

এই শক্তির মধ্যে একটা রাজশাসন; আর একটা ধর্ম্মশাসন। মানুষ নীতিমার্গে থাকিতে চায় না; তাহাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিতে হয়। মানুষ আপনা হইতে ছয়টা রিপুকে বশ করিতে চাহে না বা পারে না। সমাজশক্তি রাষ্ট্রশাসনের বা ধর্ম্মশাসনের মূর্ত্তি ধরিয়া উদ্যত দণ্ডপ্রয়োগে রিপু কয়টার শাসনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবল শক্তির নিকট স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অবনত থাকিতে হয়।

পরের দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে হইবে; সাধারণ মনুষ্যের চরিত্র আজিও এত উন্নত হয় নাই যে শুধু নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ তাহাকে দুই চারিবার শুনাইলেই চলিবে। অন্যবিধ শাসনের প্রয়োজন। যে এই স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে পারে না, তাহাকে জোর করিয়া শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত কর, অথবা তাহার কল্পনার সমক্ষে কুম্ভীপাকের বিভীষিকার সৃষ্টি কর। সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য দুর্ব্বল ও ভয়ালু জীব। নীতির অনুশাসন যাহার দমনে অক্ষম, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন তাহাকে দমন করিবে। তাহার স্বভাবের শোধন করিবে, এরূপ ভরসা করিও না; নীতিশিক্ষা মনুষ্যের স্বভাব সংশোধন করিতে পারে কি না, তাহা উৎকট সংশয়ের বিষয়। তাহার স্বভাবের উৎকর্ষ না ঘটিতে পারে; তবে তাহাকে সমাজের ক্ষতিসাধন হইতে ক্ষান্ত রাখিতে পারিবে।

ফলে উদ্ধত মনুষ্যকে সংযত ও সমাজ-বদ্ধ রাখিবার জন্য, সমাজের স্থিতি অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, রাজশাসনের ও ধর্ম্মশাসনের মত প্রকৃষ্ট উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হয় ত মানুষের অদৃষ্টে এমন দিন আসিতে পারে, যখন সামাজিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে মনুষ্যের নৈতিক স্বভাব এমন বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিবে যে, উক্ত

দ্বিবিধ শাসনের একটাও আবশ্যক হইবে না। সেদিন এখনও মানুষের ইতিহাসে আসে নাই। এখন বোধ করি কারাগার ও গির্জ্জাঘর, পুলিশ ও পুরোহিত, উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

মনুষ্যের ইতিহাসও অন্য কথা বলে না। প্রথমে রাষ্ট্রশাসন লইয়া দেখ। অরাজকতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু সমাজের পক্ষে উহা ভয়াবহ। রাজার ও রাজশক্তির বিবিধ মূর্ত্তি ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে রাজশক্তি বজ্রমুষ্টিতে শাসন দণ্ড চালনা করে না, সেখানে সমাজের অবস্থা শোচনীয়; সমাজ সেখানে দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষণে একেবারে অসমর্থ। অগষ্টস্ সীজারের রোম হইতে বিসমার্কের জর্ম্মনি পর্য্যন্ত সমস্বরে এই বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপচেষ্টা বৃথা। প্রাচীন ভারতবর্ষে আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত মহাদেশকে কেহ চিরদিন এক ছত্রের অধীন করিয়া রাখিতে পারেন নাই; সেই জন্য ভারতবর্ষের অদ্য এই দশা। সমাজবন্ধনের জন্য রাজপ্রযুক্ত পাশব শক্তির প্রয়োজন। পুনশ্চ প্রার্থনা—নীতিবিৎ ক্ষুব্ধ হইও না; ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন দুয়ের মধ্যে কোন্ শাসনটা সমাজবন্ধনে অধিক সহায়তা করে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুষ্কর নহে। ধর্ম্ম অর্থে পুনরায় রিলিজিন বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, রাজশাসনের ভিত্তি যেমন ঐহিক প্রাকৃতিক বিভীষিকায় প্রতিষ্ঠিত, রিলিজনের মূলেও সেইরূপ অতিপ্রাকৃত বিভীষিকা বর্ত্তমান। মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভয়ালুতা উভয় শাসনেরই ভিত্তিস্থল। রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক একতা সাধনে অসমর্থ, ধর্ম্মশাসন সেখানে সমর্থ হয়; একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করে। প্রত্যক্ষ প্রাকৃত যাহা পারে না, কাল্পনিক অতিপ্রাকৃত তাহা পারে।

কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য ইতিহাস হইতে গোটাকতক চলিত উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রগত একতা কোন কালে ছিল না; তথাপি সর্ব্বত্র হেলেনিকগণের মধ্যে যে একটা জাতিগত বন্ধন ছিল, তাহাতেই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন নগরগুলি পার্শ্ববর্ত্তী বর্ব্বর জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া এক মহিমান্বিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় একতায় সে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তাহার প্রতিষ্ঠার হেতু জীয়স্ দেব ও আপোলো, হোমর ও হীসিয়ড, ডেলফির অরাকল ও অলিম্পিক ক্রীড়াভূমি। অরিস্ত-ফেনিস যখন আথেন্সের রঙ্গমঞ্চে দেবদেবীগণকে বিদ্রূপ করিয়া দর্শকের করতালি পাইলেন, তখন আথীনিয় নাগরিককে পারস্যের রাজ-সভায় উৎকোচগ্রাহী ও স্বদেশদ্রোহী মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট দেখিতে পাই।

প্রাচীন রোম অত্যুগ্র রাষ্ট্রশক্তির বলে পুরাণ-প্রথিত মৎস্যাবতারের মত আপনার ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া সমগ্র ভূভাগ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল; চতুঃপার্শ্বের সমাজসমূহ তাহার বর্দ্ধমান কলেবরে ক্রমশঃ লীন হইয়া আপনাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারাইয়াছিল। গল ও বৃটন, ফিনিক ও গ্রীক্, ইহুদি ও মিশরী, সকলেই এক উৎকট প্রবলপরাক্রম অপ্রতিহত রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই প্রবল রাষ্ট্রশক্তি তাহার অধীন প্রজাপুঞ্জকে এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাসনের অধীন করিতে পারে নাই। লাটিন জুপিতারের সহিত গ্রীক জীয়সদেবের ঐক্যবন্ধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহুদি জেহোবা রোমক জুপিতারের নিকট মাথা নোয়ান নাই; মিশর হইতে আইসিস ও অসিরিস আসিয়া বেকসের ও দায়নীসসের পার্শ্বে নৃত্য করিতেছিলেন; ইরাণীক মিত্রদেব ও নাজারীন খৃষ্টদেব আসিয়া রোমের বিশাল সাম্রাজ্যমধ্যে জনসাধারণের ভক্তি বিভিন্নমুখে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে প্রবল হইতেছিলেন। রোমের সম্রাটেরা সাম্রাজ্যমধ্যে সীজার-পূজার প্রচলনের চেষ্টা করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার চেষ্টা

পাইয়াও সফলকাম হয়েন নাই। রোম সাম্রাজ্যের বিশাল কলেবর অবিচ্ছিন্ন রহিল না; উগ্র রাজশাসন এই কার্য্যে পরাভূত হইল। জর্ম্মনির অরণ্য হইতে বর্ব্বরজাতি দলে দলে প্রবেশ করিয়া রোম সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। রোমসম্রাট্ খৃষ্টান ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া রোম সাম্রাজ্যকে এক রজ্জুতে বাঁধিতে কিছুদিনের জন্য কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন; রাজশাসনে যাহা হয় নাই, ধর্ম্মের শাসনে তাহা ঘটিয়াছিল; জষ্টিনিয়ানের সমাজ-ব্যবস্থা ও বেলিসারিয়াসের তরবারির পক্ষে যাহা অসাধ্য হইয়াছিল, কনষ্টান্টাইনের প্রবর্ত্তিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাসন তাহা কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত করিয়াছিল। উত্তরকালে বর্ব্বর জাতির উপদ্রবে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগত একতা শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহাও সত্য যে, সেই খৃষ্টানধর্ম্মই আবার বর্ব্বরজাতিগুলিকে সভ্যতা প্রদান করিয়া খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে একীভূত করিয়া রোমের সাম্রাজ্যকে অভিনব মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। রোম সাম্রাজ্যের দণ্ডধর রাষ্ট্রপতি রোমীয় প্রজার সর্ব্বময় প্রভুতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াও যে সাম্রাজ্যে একতা রক্ষায় অক্ষম হইয়াছিলেন, খৃষ্টীয় খোদার নিরূপিত ধর্ম্মপালস্বরূপে সেই দুষ্কর কার্য্যের সম্পাদন তাঁহার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাধ্য হইয়াছিল।

রোমের পরবর্ত্তী ইতিহাসও এই কথারই সমর্থন করে। প্রাচ্য রোমের খৃষ্টানেরা আপনাদের মধ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের শাসন ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন শিথিল করিয়া ফেলিল; এরিয়স ও আথানেসিয়স্ খৃষ্টের ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে বিবাদকোলাহলে যে অনৈক্যের বীজ রোপণ করেন, তাহারই অঙ্কুর হইতে শতশাখ প্ররোহ নির্গত হইয়া প্রাচ্য রোমের অট্টালিকা ভিত্তিগাত্র শতধা ভিন্ন করিয়া দেয়। নবোদিত ইসলামের কুঠারাঘাত সেই জীর্ণ অট্টালিকাকে ক্রমশঃ চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রতীচ্য রোমের ইতিহাস অন্যরূপ। প্রতীচ্য

রোমের ধর্ম্মযাজক পোপ সেণ্ট পীটারের ধর্ম্মাসনকে প্রাচ্য রোমের রাষ্ট্রীয় সিংহাসনের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রতীচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপালহীন ছিন্ন খণ্ডগুলিকে একমাত্র ধর্ম্মপালের ধর্ম্মশাসনের অধীন করেন। সর্ব্বগ্রাসী ইসলামের অগ্রগামী বিজয়পতাকা পিরিনীস পার হইয়া যে দিন ফরাসী দলপতি চার্লস মার্টেলের পরাক্রমে রোমবিজয়ে প্রতিহত হয়, তার পর দিন সেই চার্লস মার্টেলের বংশধরের মস্তকে সীজার অগষ্টসের রাজমুকুট স্থাপন করিয়া রোমের পোপ প্রতীচ্য রোমসাম্রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্য রূপে পুনর্গঠিত করেন। সাত শত বৎসর পরে দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রাচ্য রোমে সেণ্ট সোফায়ার খৃষ্টীয় মন্দিরের শিরোদেশে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীয়মান ; কিন্তু অন্যদিকে পশ্চিম-প্রান্তে প্রতীচ্য পোপের অনুগত খৃষ্টানের আদেশে ইস্‌লাম বাহিনী জিব্রাল্টার পার হইয়া হিস্পানি দেশ হইতে পলায়মান।

আর এক উদাহরণ ইহুদি জাতি। এই ক্ষুদ্র জাতি কোন কালে রাষ্ট্রীয় বলে বলীয়ান ছিল না। বাবিলোনিক ও পারসীক, গ্রীক ও রোমক, যখন যে জাতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, তখনই ইহারা তাহার পদানত হইয়াছে। বস্তুতঃ এমন সর্ব্বতোভাবে নির্য্যাতিত জাতির উদাহরণ ইতিহাসে দুর্লভ। কিন্তু এক অদ্বিতীয় জেহোবার উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া যে দৃঢ়শাসন ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের সমাজকে গঠিত ও নিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই বলে ইহারা সহস্রধা ক্লিষ্ট, পীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়াও অদ্যাপি আপনাদের জাতীয়তা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্বদেশ হইতে ইহারা বহুকাল নির্ব্বাসিত ; ভিখারীর ন্যায় ইহারা সমগ্র ভূমণ্ডলে বৈদেশিকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছে ; আশ্রয়দাতা বৈদেশিকের নিষ্করুণ বিশ্বাসঘাতকতায় ইহারা দলিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছে। তথাপি মিসরে ফারাওর আশ্রয় পরিত্যাগের তারিখ হইতে অদ্যপর্য্যন্ত তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহাদের সামাজিক জীবন একই স্রোতে

গিয়াছে। এখনও ইহাদের জাতীয় জীবনের অবসান হয় নাই। ইহুদি যে দেশে যে ভাবে বাস করুক, সে এখনও সেই গর্ব্বিত সনাতন আচারাবলম্বী জোহাবার নির্দ্দিষ্ট অনুগত মনুষ্য—ইহুদি।

অথবা উদাহরণের জন্য অধিক দূর যাওয়ারই বা প্রয়োজন কি? হিন্দুস্তানে রাষ্ট্রগত একতা বোধ হয় কোন কালে ছিল না। কিন্তু এক সনাতন ধর্ম্মানুশাসনই হিন্দুর জাতীয়তাকে সহস্র বিপত্তির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষা কর্ণাটী বুঝেনা; কর্ণাটীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝে না। কিন্তু বাঙ্গালী ও কর্ণাটী মনুপ্রবর্ত্তিত পন্থায় অদ্যাপি বিচরণ করে। গঙ্গা ও যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, সর্ব্বত্রই স্নান কালে বেদপন্থী মানব একই মন্ত্রে একই দেবতার উপাসনা করে; অযোধ্যা, মথুরা, মায়া হইতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা পর্য্যন্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন-ভাষী, বিভিন্নবেশী নরনারী সমবেত হয় এবং বিভিন্নভাষী, বিভিন্নবেশী পরিব্রাজকগণ কামাখ্যা হইতে কন্যাকুমারীতে, কন্যাকুমারী হইতে হিঙ্গলাজে, একই মহাদেবীর ছিন্ন অঙ্গের অন্বেষণে পরিভ্রমণ করে। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে যে কিছু বন্ধন, যে কিছু একতা, যে কিছু জাতীয়তা বর্ত্তমান, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই একতাগত। সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন বাহ্য শক্তির নিকট অদ্যাপি সঙ্কুচিত বা পরাভূত হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান পুরাতন ইরাণিক সাম্রাজ্য ও পারসীক সভ্যতাকে,—আসীরিয়া ও বাবি-লোনের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত, ক্ষত্রিয়ানাং ক্ষত্রিয় দরিয়াবুসের ও ক্ষয়ার্ষের পরাক্রমে প্রসারিত, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত, এবং উত্তরকালে নোশেরোঁয়ার পরাক্রমবলে রোমসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পদবীতে সংস্থাপিত, পারসীক সাম্রাজ্যকে লীলাক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া-ছিল; রোম সম্রাটের হস্ত হইতে সমগ্র এশিয়া ও সমগ্র আফ্রিকা ছিনিয়া লইয়া তত্তৎপ্রদেশে হেলেনিক সভ্যতা ও রোমক সমাজব্যবস্থা ও খ্রীষ্টীয়

ধর্ম্মশাসন শতবর্ষ মধ্যে একেবারে লুপ্ত করিয়াছিল; বসপরস পারে দাঁড়াইয়া প্রাচ্য রোমের ও জিব্রাল্টার পার হইয়া প্রতীচ্য রোমের ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শতাব্দমধ্যে তিন মহাদেশের মানচিত্র একবারে রূপান্তরিত করিয়াছিল; স্বাধিকারমধ্যে প্রচলিত প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন সমাজ একবারে উচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করিয়াছিল; আটশত বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজের সমবেত শক্তির সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছিল এবং পরিশেষে কন্‌ষ্টাণ্টাইনের সিংহাসনে তুর্কিসুলতানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া খ্রীষ্টীয় জগতের আদি রাজধানীকে ইস্‌লাম জগতের কেন্দ্রস্থানে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই লোকভয়ঙ্কর ইস্‌লামের আপতনের ইতিহাস অন্যরূপ। পয়গম্বরের অন্তর্দ্ধানের পর শত বৎসর মধ্যে মুসলমান হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। ছয়শত বৎসর পরে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব মুসলমানের করতলগত হয়, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুর সামাজিক স্বতন্ত্রতা অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। হিন্দুসমাজে সামাজিক জীবনের যে স্রোত চারি হাজার বা ততোধিক কাল একটানে বহিয়া আসিয়াছে, সেই স্রোতের গতিরোধে মুসলমান সমর্থ হয় নাই। জীবনসংগ্রামে হিন্দু সমাজ মুসলমানের নিকট পরাস্ত হয় নাই। রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব কিছুদিনের জন্য গিয়াছিল বটে; কিন্তু সেই বা কয় দিনের জন্য?

প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থে এইরূপ একটা ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, মুসলমান অতি সহজে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। ইস্‌লামের উদগ্র শক্তি ভারতবর্ষবিজয়ে যেমন বাধা পাইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন পায় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান শক্তির উদয় হয়; ঐ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতেই মুসলমান সমস্ত পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। পর শতাব্দীতে মুসলমান হিস্পানি দেশ জয় করিয়া ফ্রান্সের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে চার্লস মার্টেলের প্রদত্ত প্রচণ্ড আঘাতে পুরোগমনে পরাহত হইলেও পর শতাব্দীতে

ইস্লামের বিজয়িনী শক্তি ক্রীট হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত অধিকৃত করিয়া সমস্ত ভূমধ্যসাগর করায়ত্ত করে। সেই সময়েই প্রতীচ্য খ্রীষ্টীয় জগতের রাজধানী রোম নগরে সেণ্ট পীটারের সমাধিমন্দির মুসলমানকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দেখি। একাদশ শতাব্দীতে জেরুসালেমের খ্রীষ্টীয় মন্দির ভূমিসাৎ হয়। সমস্ত খ্রীষ্টীয় জগতের ক্রুসলাঞ্ছিত শক্তিসমষ্টি দুই শত বৎসর ক্রুসেডের পর ক্রুসেড অভিযানে জেরুসালেমের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শক্তি মুসলমানকে হিস্পানি দেশ হইতে বিতাড়িত করে, অন্যদিকে তেমনি অটোমান তুর্কি প্রাচ্য রোমের ধ্বংস সাধন করিয়া প্রাচ্য খ্রীষ্টীয় সমাজের বৃহৎ অংশ করগত করে। তার পর সাড়ে চারি শত বৎসর অতীত হইল; এখনও জেরুসালেম ও আন্তিয়োক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কাইরিণী প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আদি অভ্যুদয়-ভূমি মুসলমানের করায়ত্ত এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বালকান ভূমিতে সমবেত খ্রীষ্টীয়সেনা কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ইস্লামকে সরাইবার জন্য দণ্ডায়মান।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ প্রবেশে সাহসী হন নাই। কাশিমের সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। গজনিপতি মামুদের সময় কিছু দিন ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে উৎপাত চলিয়াছিল মাত্র। যে সময়ে সেলজুক তুর্কের আদেশে খ্রীষ্টীয় যাজক কেশাকৃষ্ট হইয়া জেরুসালেম হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সাহাবউদ্দীন ঘোরী তিরোরীর ক্ষেত্রে ভগ্ন দন্ত রাখিয়া পলায়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের অধিকৃত হয়। চতুর্দ্দশে আল্লাউদ্দীন চিতোরের ভস্মস্তূপে পদ্মিনী দেবীর লাবণ্যপ্রতিমা সমাহিত দেখিয়া ব্যর্থকাম হন। ষোড়শ শতাব্দীতে চিতোরপতি সংগ্রাম সিংহ পতিত পাঠানের সহায় হইয়া হিন্দুস্তানের আধিপত্য লাভের জন্য মোগলের সম্মুখীন হন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবর শাহ হিন্দু সেনানী হিমুর হস্ত হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন ও হিন্দু রাজা মানসিংহের সাহায্যে বঙ্গ, উৎকল ও

কাবুল বিজয় করেন। সেই সময়েই দক্ষিণ দেশে মুসলমানগণ বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ তখনও গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় সিংহবিক্রমে আততায়ীর আক্রমণ পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করিতেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মেবারের রাণা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন। সপ্তদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই রাজপুত জয়সিংহের ও মরাঠা শিবাজীর হস্তে আওরঙ্গজীব বাদসাহকে ব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায়, বর্গীর দল মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লুঠ করিতেছে ও দিল্লীর দরজায় করাঘাত করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহেনশাহ বাদশাহ মরাঠা দলপতির প্রসাদভোগী বন্দী।

মূল প্রস্তাব হইতে আমরা কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। নীতিশাসন, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন তিনেরই উদ্দেশ্য এক। সমাজকে বাঁধিয়া রাখা, সমাজের গায়ে বল দেওয়া, সমাজকে জীবনযুদ্ধে সমর্থ করা তিনেরই একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সামাজিকগণ আপন আপন স্বাতন্ত্র্য কতক পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য। প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। সাধারণের কল্যাণের জন্য নিজ স্বাধীনতার সংযমের প্রয়োজন। মানব প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল নীতির শাসনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। দুর্ব্বল মানব-প্রকৃতিকে বিভীষিকা দেখাইয়া শাসনে রাখিতে হয়। সেই বিভীষিকার কোন যুক্তিযুক্ত মূল না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজজীবন-রক্ষার জন্য সেই বিভীষিকার আবশ্যকতা। এই জন্য রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন আবশ্যক। সমাজের জীবনরক্ষার জন্য উভয়েরই উপযোগিতা। যেখানে রাজশাসন পরাভূত, সেখানেও ধর্ম্মশাসন বিমুখ হয় না। একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই হিসাবে ধর্ম্মশাসনের উপযোগিতা বুঝিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট অধ্যায় স্পষ্ট হয়। অন্ততঃ ইউরোপের খ্রীষ্টানের ইতিহাস এই

হিসাবে না বুঝিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। ক্যাথলিক কর্তৃক প্রোটেষ্টাণ্টের নির্য্যাতন, প্রোটেষ্টাণ্টগণের পরস্পর উৎকট বৈরসাধন, ইউরোপের রাজগণের প্রজাসঙ্ঘ-মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক একতারক্ষার জন্য উৎকট প্রয়াস, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন, বিসংবাদ ও বিরোধ, এই হিসাবে না দেখিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। নীরো হইতে দায়োক্লিশিয়ান পর্য্যন্ত রোম সম্রাড়্গণের অভিনব খ্রীষ্টান সমাজের প্রতি উৎপীড়ন, কনস্তান্তাইনের পরবর্ত্তী সম্রাড়্গণকর্তৃক প্রাচীনপন্থীদের প্রতি ততোধিক অত্যাচার, সম্রাট্ থিয়োদোসিয়সের আদেশে রোমের পুরাতন দেবমন্দিরগুলির ও জস্তিনিয়ানের আদেশে আথেন্সের ভুবনবিখ্যাত চতুষ্পাঠীসমূহের উচ্ছেদসাধন ঠিক এই হিসাবেই বুঝা যায়। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খ্রীষ্টান ইউরোপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র খ্রীষ্টীয় সমাজকে বহু দিন ধরিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের সহিত ও পশুবলে বলীয়ান্ তাতার, মোগল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সহিত জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই খ্রীষ্টীয় সমাজে সমাজরক্ষার্থ রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন উভয়েরই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। প্রাচ্য রোমে সম্রাটের ও প্রতীচ্য রোমে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব ঘটিয়াছিল। যে এই প্রভুত্বের বিরোধী হইত, সে সমাজের শত্রু বলিয়া গণ্য হইত। তাহার বিদ্রোহের মার্জ্জনা হইত না। কুঠারাঘাতে তাহার মুণ্ডপাত কর; তুষানলে তাহাকে দগ্ধ কর। আবার সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা; তাহারা পরস্পর উন্মত্তভাবে জীবনসমরে নিরত। সমাজকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখা দরকার; নতুবা জীবনসমরে সে সমাজের জয়ের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখানে উন্মত্তের প্রলাপ। রাজার নিকট ও যাজকের নিকট সকলকে আজ্ঞাকারী থাকিতে হইবে। রাজাই যাজকমণ্ডলীর প্রধান সহায়; তিনি একাধারে রাজশক্তির ও

ধর্ম্মশক্তির অধিষ্ঠানস্থল। টিউডর রাজাদের রাজত্বকালে ইংরেজ জাতি পোপের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে। বৈদেশিক ধর্ম্মপালের গঠিত নিগড় হইতে স্বাধীনতা লাভ ঘটিলেও স্বদেশের রাষ্ট্রপালের অধীনতাপাশ প্রজাগণকে আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। টিউডর অষ্টম হেনরির সময় হইতে ইংলণ্ডপতি যুগপৎ রাষ্ট্রপাল ও ধর্ম্মপাল। এলিজাবেথের সময়ে প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মগত স্বতন্ত্রতা একেবারে লুপ্ত হয়। ষ্টুয়ার্টগণের সময়ে অধীনতার ভার আরও বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রজাবিদ্রোহ ঘটে। ক্রমোয়েল রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করেন; কিন্তু প্রজাকে কোনরূপ স্বতন্ত্রতা দেন নাই। তাঁহার সময়ে অধীনতার কেবল মূর্ত্তিভেদ ঘটিয়াছিলমাত্র। প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরেজের রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য বা ধর্ম্মগত স্বাধীনতা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংলণ্ডের যে ইতিহাস, অন্যান্য রাজ্যেও সেই ইতিহাস। সর্ব্বত্র রাজা ও পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া প্রজার স্বাধীনতা বিলোপের চেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস এই কাহিনী সর্ব্বত্র গাহিয়াছে। এখনও সেই কাহিনীর উপসংহার হয় নাই।

রাজশাসনের সহিত ধর্ম্মশাসনের এই খানে সম্বন্ধ। রাজা স্বৈরাচার ও দুর্ব্বৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি রাজা, ততক্ষণ তাঁহার আদেশ পালনে তুমি বাধ্য। তাঁহার আদেশ ন্যায়বিগর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদেশলঙ্ঘনে শাস্তিমাত্র তোমার প্রাপ্য। বর্ত্তমান কালে রাজাদেশের সমালোচনায় প্রজার অধিকার জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রথমে রাজার আদেশ পালন কর; নতুবা তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী। রাষ্ট্রের জীবনের কাছে তোমার জীবনের মূল্য নাই।

রাজা তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারেন; সমাজ তোমাকে ছাড়িবে না। সমাজ তোমাকে নির্য্যাতন ও নিপীড়ন করিয়া সাধারণের চিরক্ষুণ্ণ মার্গে তোমাকে ব্যবস্থিত রাখিবে। তোমাকে উন্মার্গগামী হইতে দিবে না। তোমার যুক্তি, তোমার নীতি, তুমি দূরে রাখ। আগে সমাজের আদেশ

পালন করা; নতুবা তুমি সমাজদ্রোহী। রাজা দুশ্চরিত্র; তাঁহার চরিত্রের উপর তোমার শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিতে পারে, তথাপি তিনি তোমার নমস্য। তাঁহার দর্শনলাভ তোমার সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জানু পাতিবে ও শিরোবসন উন্মোচন করিবে। প্রচলিত ধর্ম্মে তোমার আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দাও। না দিলে তুমি সমাজচ্যুত হইবে; সমাজের হস্তে তোমাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। সমাজ নিজের জীবন রাখিতে চাহে। তাহার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ সর্ব্বত্র এক নহে। নীতিবিৎ, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। দ্বন্দ্ব—নির্ম্মম নিষ্ঠুর ধর্ম্ম যেখানে জীবের অভিব্যক্তির ও উন্নতির একমাত্র উপায়, সে জগতে নীতিবিদের প্রিয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বত্র স্থান নাই।

প্রচলিত ধর্ম্মাচারসমূহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে হর্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উল্লিখিত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। অসভ্য সমাজে বলবান্ ব্যক্তি রাজা। তাঁহার আদেশপালন ও তাঁহার প্রসাদন আবশ্যক। তাঁহার বিরাগের ফল প্রাণদণ্ড। অসভ্যসমাজে রাজপূজা প্রচলিত। রাজা মরিয়াও মরেন না। মানুষও মরিয়াও মরে না। তাঁহার প্রেত শরীর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়। প্রেতেরও প্রসাদন আবশ্যক। নতুবা প্রেত আসিয়া উপদ্রব করিবে। এইরূপে প্রেতপূজার উৎপত্তি। প্রেতের শক্তির সীমা নাই। জড়প্রকৃতির উপর প্রেতের ক্ষমতা অনির্দ্দেশ্য। প্রেতকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। জীবন্ত রাজা সামাজিক প্রেতপূজার প্রধান যাজক। রাজাই প্রধান পুরোহিত। রাজার সহিত প্রেতের কথাবার্ত্তা চলে। রাজা প্রেতের প্রতিনিধি। প্রেতপূজা হইতে দেবপূজার উদ্ভব। দেবতার ও উপদেবতার প্রভেদ মর্য্যাদাগত। মূলতঃ উভয়ে একজাতীয়। বিজিত জাতি জেতৃজাতির দেবতা গ্রহণ করে। জেতার দেবতা বিজিতের

দেবতার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। জেতার যিনি উপাস্য, তিনি দেবতা; বিজিতের যিনি উপাস্য, তিনি অপদেবতা। দেবতাগণের মধ্যে ক্ষমতানুসারে পদবী নির্দ্দিষ্ট হয়। দেবতাদের মধ্যে সমাজের সৃষ্টি হয়। দেবে অপদেবে এবং দেবে দেবে বাদবিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। অসুরগণ দেবগণের চিরশত্রু। শয়তান জেহোবার প্রতিদ্বন্দ্বী। এঞ্জেল ও আর্কেঞ্জেল প্রভৃতি জেহোবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। জেহোবা দেবগণের রাজা; তিনি নরগণেরও রাজা; তিনি জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি একাকী পূজা চাহেন; অন্যে পূজা পাইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তাঁহার আদেশে জগৎ চলিতেছে। মর্ত্ত্যে ভূমিপাল তাঁহার প্রতিনিধি; যাজক ও পুরোহিত তাঁহার আদেশপ্রচারে ও সন্তোষসাধনে নিযুক্ত। রাজার আদেশ খোদার আদেশ। এই আদেশের পালন প্রজার প্রথম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধা করিও না। পরকালে কুম্ভীপাক আছে; তাই বলিয়া কি ইহলোকে তুষানল আবশ্যক হইবে না? রাজার রাজত্ব তবে কিসের জন্য?

প্রেতপূজা হইতে পিতৃপূজা, দেবপূজা, জেহোবাপূজার উদ্ভব এইরূপ কতকটা বুঝা যায়। প্রেতের প্রসাদন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি কতকটা বুঝা যায়। অনেক দেবতা প্রাকৃত শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। মনুষ্য পরলোকগত প্রেতের পূজা করে; আবার চন্দ্র সূর্য্য, জল বায়ু, নদী পর্ব্বতেরও উপাসনা করে। প্রেতপূজা হইতে প্রকৃতিপূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল ভাল বুঝা যায় না। হর্বার্ট স্পেন্সর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা সন্তোষজনক নহে। নানা পণ্ডিতে নানা মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

মনুষ্যকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলেও মানিতে হইবে। সামাজিক জীব সমাজের অধীন। এই অধীনতার সীমা কোথায়, তাহার সদুত্তর নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে

তাহার মীমাংসারও প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক দলকে সেই সীমারেখার এক পার্শ্বে রাখে; মনুষ্যের সমাজবশ্যতা অন্য দলকে অন্য পার্শ্বে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল উভয় দলের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা কখনও হয় নাই; কখন হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই সনাতন বিরোধের ফলে সেই সীমারেখা ক্রমশই সরিয়া গিয়াছে। বিরোধের ফলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সমাজগত চরিত্রের ক্রমেই বহুধাভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী। অথবা প্রকৃতির বুঝি ইহাই নিয়ম। বিরোধই বোধ করি উন্নতির ও অভিব্যক্তির একমাত্র বিধাতৃবিহিত উপায়।

—o—

প্রকৃতি-পূজা

মানুষ মানুষের সহিত যুঝিয়া আসিতেছে ও মানুষ প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া আসিতেছে। অতি পুরাকাল হইতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে; অদ্যাপি এই সংগ্রামের অবসান হয় নাই। কবে এই সংগ্রামের অবসান হইবে, তাহা বলা যায় না।

এই জীবনব্যাপী মহাসমরের সহিত মনুষ্যজীবনের যত নিকট সম্পর্ক আছে, অন্য কোন ব্যাপারের সহিত ততদূর আছে কি না জানি না। মানুষ সেই সমরে চিরকাল দলিত, পীড়িত ও বিক্ষত হইয়া ত্রাহিস্বরে ক্রন্দন করিতেছে।

প্রকৃতির পীড়নে মনুষ্যমাত্রই চিরদিন পীড়িত। প্রকৃতি সবল ও মনুষ্য দুর্ব্বল। সবলের পীড়নে মনুষ্য চিরদিন ধরিয়া নিগৃহীত হয়। ইহাই জগতের নিয়ম। দুর্ব্বলের এরূপ ক্ষেত্রে যাহা একমাত্র গতি, সে তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই একমাত্র গতি সবলের উপাসনা। দুর্ব্বল মানুষ বোধ হয় সমাজসংস্থিতির প্রারম্ভ হইতে সবলা প্রকৃতিকে নানা উপায়ে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পূজা দ্বারা প্রসাদলাভ যে একেবারেই ঘটে না এমন নহে। কেবলমাত্র ভ্রূকুটী ও চপেটাঘাত পাইলে এতদিন মনুষ্যজাতির ধরাতলে অবস্থান ঘটিয়া উঠিত না। মনুষ্য যে এখনও ধরাতলে বর্ত্তমান আছে এবং ধরাতল পরিত্যাগ করিবার স্পৃহাও সকলের নাই, তখন প্রকৃতির মন যোগাইয়া পূজা করিতে পারিলে যে কিছুরই প্রত্যাশা চলিবে না, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃতির যখন মেজাজ ভাল থাকে, যখন আমরা প্রাকৃতিক বিধানে ব্যবস্থা দেখি, তখন মন যোগান সুসাধ্য হয় এবং প্রসাদলাভও ঘটে। একালে যাঁহাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা প্রাকৃতিক বিধানের ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করেন এবং তদনুসারে প্রকৃতির মন যোগাইয়া প্রসাদ

লাভ করেন। দুঃখের বিষয় যে প্রকৃতিতে সর্ব্বত্র ব্যবস্থা দেখা যায় না। চিত্তচাপল্যে প্রকৃতির সহিত অন্য কোন প্রভু তুলনীয় নহে। তাঁহার কথন কিরূপ খেয়াল থাকিবে, হিসাব করিয়া গণনা চলে না। তাই সর্ব্বত্র পূজার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

অতএব প্রকৃতিতে যাহা কিছু প্রবল ও শক্তিমান্ বলিয়া বোধ কর, তাহারই পূজা কর। সূর্য্যের পূজা কর, চন্দ্রের পূজা কর, মেঘের পূজা কর, বায়ুর, জলের, আগুনের, সকলেরই পূজা কর। বৃক্ষপর্ব্বত, নদীসমুদ্র কেহই যেন বাদ না যায়। কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে? কাহার শক্তি কিরূপ, তাহা কে জানে? যাহাকে সম্মুখে দেখ, তাহারই পূজা কর। সাপ বাঘ, বিড়াল কুকুর, ইট পাথর, কেহ যেন বাদ না পড়ে। সাবধান ব্যক্তি কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া চলেন; কেহ যেন বাদ না পড়ে। বিশ্বজগৎ জুড়িয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা কর। শস্যশালিনী পৃথিবী নিখিল ভূতের জননীস্বরূপা, তিনি মহাদেবী, তাঁহার পূজা কর। সীমাহীন আকাশ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি মহাদেব পরম পিতা, তাঁহার পূজা কর। দেবতার সংখ্যা কত, তাহা কে জানে? দেবতা তেত্রিশ, কি তেত্রিশ কোটি, কে বলিতে পারে? প্রত্যক্ষ না পোষায়, কল্পনার আশ্রয় লও। অলিম্পস বা কৈলাস, স্বর্গ বা পাতাল, কোথায় কে আছেন, কে বলিতে পারে?

জগতের কারখানা সবই বিচিত্র। কোথা হইতে কি হয়, মানুষের গণনার অতীত। সূর্য্যদেব কোথা হইতে একচক্র রথে হরিদশ্ব যোজনা করিয়া অরুণ সারথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জগতের তিমিররাশি ভেদ করিয়া উপস্থিত হয়েন, অগ্রে চারুহাসিনী ঊষা বনের ফুল ফুটাইয়া, মন্দমারুতে বনস্থলী প্রকম্পিত করিয়া সুপ্ত জীবকুলকে প্রবোধিত করেন। এই বা কি আশ্চর্য্য! নৃত্যপরা ঊষাসুন্দরী বর্ণকান্তিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া চঞ্চলচরণে উপস্থিত হইতেছেন; উঠ উঠ সুপ্ত মানব, অর্ঘ্যপাত্র

হাতে লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কর; তাঁহার চরণতলে শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাঁহার নিশ্বাস-সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে, তাঁহার অনাবৃত বক্ষোদেশ হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে। উঠ, আর সময় নাই; ঐ দেখ উষাদেবীর রূপরাগে আকৃষ্ট হইয়া রথারূঢ় দিবাকর তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রূপমুগ্ধ দিবাকর তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন, সমুদয় আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃপ্রভায় দিগন্তর আলোকিত করিয়া চলিলেন। দেখ, পশ্চিমাকাশে যখন সন্ধ্যার রক্তিম রাগে জগৎ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে, তখন দিবাকর উষার সহিত সঙ্গত হইলেন। সন্ধ্যা ত উষারই অন্য মূর্ত্তি! কিন্তু হায় এ কি হইল। দিবাকর প্রজাপতি; উষাদেবী যে তাঁহার দুহিতা। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধারণ করিয়া রোহিতরূপিণী রক্তবর্ণা উষাদেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবগণ লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। ভূতপতি রুদ্রদেব ক্রোধভরে প্রজাপতির হত্যাসাধনার্থ শরক্ষেপ করিলেন। দিবাকর পশ্চিমাকাশে দেবীর সহিত মিলিত হইলেন। ফুলশয্যা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হায় সেই ফুলশয্যাই অন্তিমের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইবে, কে জানিত! উহা সন্ধ্যার রক্তরাগ নহে; দিবাকরের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছে মাত্র; পরক্ষণেই বসুন্ধরা গভীর শ্বাস ফেলিয়া বিষাদের কালিমা ধারণ করিবে। সবিতা উষাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছেন। রঘুবীর সীতাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছেন; রাক্ষসী সেনা ধ্বংস করিয়া তিনি সীতাদেবীর সন্ধান পাইলেন; কিন্তু রাবণের চিতা না নিবাইতেই সীতাদেবীর জন্য চিতা সজ্জিত হইল। বানরী সেনা চিতানলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। গ্রীক্ বীরগণ হেলেনা সুন্দরীর অন্বেষণে সাগরপারে চলিয়াছিলেন; হেলেনার উদ্ধার হইল, ট্রয় নগরী গভীর নিশীথে অগ্নি-কুণ্ডে পরিণত হইল। দীপ্ত অগ্নি সাগরকূল আলোকিত করিল। মহাবীর হীরাক্লীস বিজয়ান্তে প্রণয়িনীর নিকট আসিলেন। প্রণয়িনী তাঁহাকে

অঙ্গরাখা কবচ পরিতে দিলেন। কে জানে সে কবচ প্রাণঘাতক হইবে। হীরাক্লীস কবচ পরিধান করিয়া চিতারোহণ করিলেন। ঈজীয় সাগরের পশ্চিম কূলে তাঁহার চিতা জ্বলিল। সমুদ্রের জলরাশির উপরে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই চিতাবহ্নির রক্তরাগ ঈজীয় সাগরের পূর্ব্ব কূল পর্য্যন্ত দীপ্ত করিল। বালডারের মৃতদেহ বহন করিয়া সমুদ্র বাহিয়া পশ্চিমমুখে তাঁহার নৌকাখানি চলিতেছে। নৌকার উপরে সজ্জিত চিতানলে বালডারের দেহখানি ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। বালটিক সাগরের আঁধার পৃষ্ঠ সেই চিতালোকে দীপ্ত হইতেছে। রাবণের চিতা আজও নিবায় নাই। বালডারের চিতা কি নিবাইয়াছে? দুরন্ত শীতের মধ্যভাগে যখন ভূমণ্ডলের উত্তরভাগ দিবালোকবর্জ্জিত হয়, ক্ষীণপ্রভ দিবাকর যখন দক্ষিণাকাশে দেখা দেন বা দেখা দেন না, সেই সময় নোর্স জর্ম্মানেরা সেদিন পর্য্যন্ত বালডারের চিতা জ্বালিত। সে দিন ও ঠিক্ সেই সময়ে খ্রীষ্টানেরা জোহনের স্মরণার্থ সেই আগুন জ্বালাইত। অদ্যাপি যখন মার্ত্তণ্ড গ্রীষ্মঋতুর মাঝখানে দক্ষিণায়নগামী হয়েন, তখন ইউরোপের লোকে সেই চিতার অনল জ্বালাইয়া থাকে।

দিবাকর অস্ত গেলেন, আর কি তিনি ফিরিবেন না? বালডারের দেহ ভস্মীভূত হইল, আর কি তিনি পুনর্জীবন পাইবেন না? অমরের কি মৃত্যু আছে? দেব গিয়াছেন অধোভুবনে পাতালপুরে,—পতিতের উদ্ধারের জন্য, মৃতের পুনর্জীবনের জন্য। আপোলো পাতালপুরে নামিয়াছিলেন, আলকেস্তিসের উদ্ধারার্থ।* দায়োনীসস্ পাতালপুরে নামিয়াছিলেন,

* মুমূর্ষু এড্‌মিটাসের প্রাণরক্ষার্থ আপলো নিয়তির নিকট এই বর পান যে অন্য কেহ এড্‌মিটাসের বিনিময়ে নিজের প্রাণ দিলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে। এড্‌মিটাসের পত্নী আলকেস্তিস্ স্বামীর জন্য নিজের প্রাণ দেন। 'এলকেস্তিস্‌কে পুনর্জীবিত করিবার জন্য হীরাক্লীস মৃত্যুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ হইয়াছিল সমাধিস্থানের নিকট, প্রেতলোকে নহে।

জননীর উদ্ধারার্থ। থর অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন। ওধিন অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন; স্বয়ং খ্রীষ্টদেব নরক-প্রবেশ করিয়াছিলেন, আশ্রিতগণকে ভুলিয়া আনিবার জন্য। ভয় নাই, আপোলো অধোভুবন হইতে ফিরিয়াছিলেন; বালডারও ফিরিবেন।

মেশায়া আবার আসিবেন। নবজেরুসালেমে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কল্কিদেব আবার আসিয়া খড়্গহস্তে ভূভার হরণ করিবেন। শাক্য বুদ্ধ গিয়াছেন; মৈত্রেয় বুদ্ধ আবার আসিবেন। আর্থর কি মরিয়াছেন? পৃথিবীর প্রান্তদেশে আবালন দ্বীপে তিনি অবস্থান করিতেছেন; সেখানে মর্ত্ত্যভূমির ঝঞ্ঝাবায়ু বহে না, সেখানে সারা বৎসর সমীরণ সুরভি বহন করে, সারা বৎসর সেখানে বসন্তের ফুল ফুটে। সময় হইলে আর্থর আবার ফিরিবেন।

দিবাকর চিরতরে অস্ত যান নাই। কাল আবার তিনি ফিরিবেন। আবার তাঁহার মস্তকোপরি কনক মুকুট জ্বলিবে; আবার স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলে তাঁহার শিরোদেশ শোভিত হইবে। আঁধার ও মেঘ ও কুজ্ঝটিকা তাঁহার উদয়ে বাধা দিবে; কিন্তু তীব্র করজালে সকল বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আকাশপথে দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনি চলিতে থাকিবেন। মহাবীর অদুসীয়স ট্রয়নগরে পরস্ত্রীধর্ষকের দমনের জন্য গিয়াছেন। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাসাগর পার হইয়া স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পেনিলপী, তোমার চিন্তা নাই; তোমার পাণিস্পর্শলোভী দুরাত্মাদিগের যথাকালে দমন হইবে। আকাশপটে কি দেখিতেছ? বৃষরাশি যখন পশ্চিমদিকে অধঃপতিত ও অস্তগামী, মধ্যাকাশে সিংহরাশি তখন উজ্জ্বলপ্রভায় জ্যোতিষ্মান্। তৎপশ্চাৎ কন্যারাশি। সিংহপৃষ্ঠে কন্যাকুমারী; তিনি মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষবৃষকে মর্দ্দন করিতেছেন। নীলাকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যোমগঙ্গা প্রবহমাণ; উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিগণ যজ্ঞনিযুক্ত; যজ্ঞভূমিতে অগ্নিদেব স্বাহাদেবীর রূপমুগ্ধ; তাঁহার

সিক্ত তেজ আকাশগঙ্গায় স্খলিত হইয়াছিল। বিজনে গঙ্গাতীরে শ্বেত পর্ব্বতগুহায় শরবনে কুমারদেবের উৎপত্তি হইল; ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহার জাতক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; কৃত্তিকাগণ তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিলেন; কন্যাকুমারী তাঁহাকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলেন; দেবগণ তাঁহাকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন; দেবসেনাপতি তারকাসুরকে জয় করিবেন; দেবগণ স্বপদে স্থির হইবেন। মহাভারতে বনপর্ব্ব খুলিয়া দেখ, তারকাসুরই মহিষাসুর; আকাশপটে চাহিয়া দেখ, ব্যোমগঙ্গার অপর পারে তারকারূপী মহিষবৃষ যখন অধঃকৃত ও মর্দ্দিত হইতেছে, কৃত্তিকাগণ গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া আছেন, সপ্ত ঋষি দূর হইতে চাহিয়া রহিয়াছেন, সিংহপৃষ্ঠে কন্যা তখন মধ্যগগনে জ্যোতির্ম্ময়ী।

বিজন গুহামধ্যে কুমারীগর্ভে নরনারায়ণের জন্ম হইয়াছে। বেথলহীমে তারকার উদয় হইয়াছে। প্রাচী হইতে ঋষিগণ অর্ঘ্যহস্তে পূজা করিতে যাইতেছেন। দুরাত্মা হেরডের আজ্ঞাকারী অনুচরগণ তাঁহার অন্বেষণে শিশুহত্যায় নিযুক্ত। মিশর দেশে তিনি গুপ্ত রহিবেন। শয়তান তাঁহাকে একাকী পাইয়া প্রলোভিত করিবে; শয়তান তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। সরীসৃপরূপে শয়তান এতদিন মানবের পদে দংশন করিতেছিল; মানবরূপী নারায়ণ এখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিবেন। তিনি মেষপাল; মানবজাতি তাঁহার মেষ। মায়াদেবীর কুক্ষিভেদ করিয়া তথাগত গর্ভস্থ হইয়াছিলেন; লুম্বিনীর বিজন উদ্যানে শালতরু-তলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ঋষি অসিতদেবল তাহা জানিতে পারিয়াছেন; অসিতদেবল শাক্যশিশুর পূজা করিতে যাইতেছেন। শিশু শাক্য বুদ্ধ হইবেন, জগৎকে প্রবোধিত করিবেন। তিনি গোপাপতি; গোপার প্রেমশৃঙ্খল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। মারসেনা তাঁহার নিকট পরাভূত হইবে; মারবধূগণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। কাশ্যপগৃহে তিনি কালিক নাগকে বশীভূত করিবেন।

দেবকীগর্ভে নারায়ণের জন্ম হইয়াছে। কারাগৃহের অন্ধকারে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; গোপগৃহে গুপ্ত হইয়া তিনি রক্ষিত হইয়াছিলেন; শিশুঘাতক কংসপ্রেরিত আততায়িগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে তিনি ধেনু চরাইতেন; তিনি গোপসখা গোপীকান্ত গোপাল; গো-গোপকে রক্ষার জন্য তিনি কালিয় সর্পের দমন করিয়াছিলেন; কালিয়ের শিরোদেশে পদাঘাত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; গোপীর প্রেমরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; অরাতিনিধনের জন্য তিনি মথুরায় গিয়া আত্মপ্রকাশ করেন; কেননা তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন। মিত্রদেব গিরিগুহায় জন্মিয়াছিলেন; গুহামধ্যে তাঁহার পূজা হয়; তিনি মহিষবৃষকে হত্যা করেন। তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা; অহুর মজ্‌দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি মানবজাতির পাপমোচন ভিক্ষা করেন। বিজনদ্বীপমধ্যে তালতরুতলে লীতোদেবীর গর্ভ হইতে আপোলো দেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; তিনি মানবজাতির প্রতি করুণাময়; তিনি পাইথন নাগকে বিনষ্ট করেন; ডেলফি নগরে সমবেত হইয়া গ্রীকগণ তজ্জন্য মহোৎসবে যোগ দিত। দেবরাজ ইন্দ্র অহিরূপী বৃত্রের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; মরুদ্গণ তাঁহার সহায় ছিলেন। দারুণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া অহি পতিত হইয়াছিল।

মানবজাতি, উত্থান কর; দিবাকর উদিত হইয়াছেন; দিবাকরের রথচক্র মহাকালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে, তাঁহার রথচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মহাকালদেহে অঙ্কিত করিয়া চলিতেছে। উত্তরায়ণের পর দক্ষিণায়ন; দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণ; যাত্রার পর পুনর্যাত্রা। অদ্য আষাঢ়ী শুক্ল দ্বিতীয়া; গ্রীষ্ম ঋতুর অবসান হইয়াছে; বর্ষার বারিধারায় বসুধার তপ্ত দেহ সিক্ত ও স্নিগ্ধ হইতেছে। জগন্নাথের

রথযাত্রা আজি আরম্ভ হইয়াছে; যে যেখানে আছ, রথস্থিত বামনমূর্ত্তির পুরোবর্ত্তী হইয়া জয়ধ্বনিসহ রথরজ্জুতে করার্পণ কর। অদ্য শরতের মহাষ্টমী; বর্ষাপগমে বসুধা নির্ম্মল মুখশ্রী ধরিয়া হাসিতেছে; মহাশক্তির বোধন হইয়াছে; প্রবুদ্ধশক্তির আরাধনা কর। অদ্য কোজাগরী পূর্ণিমা; মহালক্ষ্মীর চরণক্ষেপে জগৎ-শতদল বিকশিত হইয়াছে; এমন রাতে কি ঘুমায়? নারিকেলোদক পান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় আজি রাত্রি যাপন কর। অদ্য শারদোৎফুল্লমল্লিকা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী; বসুন্ধরা জ্যোৎস্না-বিধৌত শুক্লবসন পরিধান করিয়া যৌবনরাগ বিকাশ করিয়া প্রিয়তমের প্রতি অভিসারে চলিয়াছে এবং প্রিয়সঙ্গমে রাসরসে হাসিতেছে ও তরল-তরঙ্গে নাচিতেছে। অদ্য উত্তরায়ণসংক্রান্তি; হিমঋতু অবসানোন্মুখ; দেবগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তনয়েশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইবেন; দেবগণ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। অর্দ্ধ পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল; ঘরে ঘরে আলো জ্বাল, সুরাপাত্রে মদিরা ঢাল। আজি বাসন্তী পঞ্চমী; মলয় বহিয়াছে, কুহুস্বর শোনা গিয়াছে, বাগ্বাদিনী বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন। আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমা, মদনের মহোৎসবদিন। গোপীসখা সেই মহোৎসবে যোগ দিয়াছেন। আজি বহ্ন্যুৎসবের দিন; আকাশে ধধুপ উৎক্ষেপ কর। ফাগ কই, রঙ কই, নরনারী যে হোলিরঙ্গে মাতিয়াছে। অদ্য মহাবিষুবসংক্রান্তি; বর্ষচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিল; বৎসরের পর বৎসর এইরূপ পাকের পর পাক দিয়া মহাদেবের কালচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে; আজি চরক গাছে ঘুরিবার দিন। ঢাক বাজাও, আর করতালি দাও, আর আনন্দে নৃত্য কর।

দিনের পর রাত্রি; রাত্রির পর দিন। জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য; কিন্তু মৃত্যু হয় আবার জন্মের জন্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। মনুষ্য, চিন্তা করিও না; প্রকৃতির এই বিধান; প্রকৃতির পূজা কর। প্রকৃতি তোমাদের জননী; প্রকৃতিজননী তোমাদের জন্য আত্মোৎসর্গপরায়ণা।

বিশ্বসৃষ্টি এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞে সহস্রশীর্ষা পুরুষ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার শীর্ষ হইতে দ্যুলোক, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, পদদ্বয় হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রজাপতিকন্যা সতী যজ্ঞে প্রাণ দিয়াছিলেন; মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন; নারায়ণ চক্রদ্বারা সতীদেহ ছিন্ন করেন; সতীর ছিন্নাঙ্গ ভারতভূমি ব্যাপিয়া আছে। সতী হৈমবতী উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব অসীরিস মানবের হিতার্থ ভ্রাতা টাইফনের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন; দুরাত্মা টাইফন তাঁহার দেহ খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিল; মহাদেবী আইসিস সেই ছিন্ন অঙ্গের অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন; মিশরদেশে নীলনদীর উভয় তটে সেই ছিন্ন অঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; যেখানে যেখানে ছিন্ন খণ্ড পতিত হইয়াছিল, তাহা মহাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। অসীরিস পুনর্জন্ম লাভ করেন; আজিও তিনি দণ্ডধর দেবরাজ; পুণ্যের পুরস্কার, পাপের তিরস্কার, তিনি বিধান করেন। আত্মোৎসর্গ বিনা যজ্ঞ হয় না; যজমান যজ্ঞে আপনাকে পশুরূপে উৎসর্গ করেন; যজ্ঞে তিনি আত্মনিষ্ক্রয়স্বরূপে পশু বধ করেন। যজ্ঞের বধ বধ নহে। মানবের পাপপ্রক্ষালনের জন্য বলির প্রয়োজন। বিধাতা নিজ পুত্রকে বলিস্বরূপ ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রক্তে ধরাতল পবিত্র হইয়াছে; মানবের পাপরাশি ধুইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর তিনি নবজীবন লাভ করেন। শেষের সেই দিনে তিনি পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিবেন। অতএব বলিদানের আবশ্যকতা।

শোভাময়ী শরৎ সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর মত বনস্থলী আলো করিয়া বিচরণ করে। কোথা হইতে দুরন্ত শীত আসিয়া সুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। জননী বসুন্ধরা কাঁদিতে থাকেন; জননী তাঁহার

নন্দিনীর শোকে বিষাদের কুজ্ঝটিকায় মুখ ঢাকিয়া, সর্ব্বত্র তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান। সুন্দরী পাসিফনী সহচরীপরিবৃতা হইয়া বনে বনে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ ধরাতল বিদীর্ণ হইল। ভূগর্ভ হইতে কোন্ অদৃশ্য পুরুষের হস্ত উঠিয়া কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সখীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। শ্রীরূপিণী মাতা দীমিতীর হাহাকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষী ছিলেন চন্দ্রমা,—তাঁহার তমসাবৃত গুহার মধ্য হইতে; সাক্ষী ছিলেন সূর্য্য,—তাঁহার সুদূর নির্জ্জন শিবিরাবাসে। জননী দীমিতীর কন্যাশোকে আলো হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে জলস্থল অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্ধান দিলেন। অধো-ভুবনে প্রচণ্ড দেবরাজ প্লুটো তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। জননী দীমিতীর ক্রোধ করিলেন। সংসার হইতে লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিলেন। গাছে আর ফুল হয় না; ভূমি আর শস্য দেয় না; জীবকুল নিরানন্দ হইল। দেবরাজ ভীত হইলেন। মাতার হস্তে কন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই অবধি বৎসরের মধ্যে আট মাস কন্যা মায়ের নিটক থাকে; চারি-মাস অধোভুবনে প্লুটোর নিকট বাস করে। চারি মাস পৃথিবী শ্রীহারা হইয়া কাঁদে; আট মাস পৃথিবী শ্রীযুক্তা হইয়া হাসে। ঋষিশাপে লক্ষ্মী স্বর্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; ত্রিভুবন লক্ষ্মী হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল। ত্রিভুবনে হাহাকার উঠিল। দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে পাইলেন। লক্ষ্মী সুধাভাণ্ড হস্তে উঠিলেন; সুধার সহিত হলাহলও উঠিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দীমিতীর কন্যা পাইয়াছিলেন। এমনি করিয়া দেবী আইসিস পতি অসীরিসকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। সহজে কি তিনি পতি পাইয়াছিলেন? আইসিসকেও তাঁহার অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সাবিত্রী সতীও সত্যবান্‌কে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনেন; সেও কি সহজে? তিনি ভর্ত্তৃবিনা সুখ প্রার্থনা করেন নাই, ভর্ত্তৃবিনা তিনি দ্যুলোক প্রার্থনা করেন নাই। দেবী

আস্ফুজিৎ আদনিসকে নিহত দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি আদনিসকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বালডার মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করিতেছেন? সহজে কি তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন? যে যেখানে আছ, রোদন কর; বনের পশু, গাছের পাখী, তরুলতা, যে যেখানে আছ, রোদন কর। মাটি ফাটিয়া শোকাশ্রুর উৎস উঠিতেছে; বালডারের জন্য নির্জীব শিলা দ্রবীভূত হইতেছে।

মরণের রহস্য সকলের উপর। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? জীয়ন্তে কি সেখানে যাওয়া যায় না? সে পুরী কোথায়? বৈতরণীর অপর পারে, বাল্টিক সাগরের অপর পারে। বৈতরণীর অপর পারে যমদ্বার; মহাঘোরে যমদ্বারে শ্যামশবল সারমেয়দ্বয় দাঁড়াইয়া আছে। চিন্বৎ সেতুর পার্শ্বে ঘোরদংষ্ট্র সারমেয় দাঁড়াইয়া আছে। অধোভুবনে যমদ্বারে কার্ব্বেরস কুক্কুর প্রহরী আছে। জাহ্নবীনীরে প্রিয়তমের ভস্মরাশি ভাসাইয়া দাও; বালডারের দেহখানি ভেলায় চাপাইয়া আগুন ধরাইয়া বালটিকের জলে ভাসাইয়া দাও; হয়ত সেই পুরীতে পৌঁছিতে পারে।

যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম, তাহারা কে কোথায় আছে, কে জানে? কোন্ আঁধার পুরে তাহারা বসতি করিতেছে? আঁধারে কি তাহারা পথ চিনিতে পারিবে। হাতে হাতে মশাল ধর। ঘরে ঘরে আলো জ্বাল। আজি কার্ত্তিকী অমাবস্যা। প্রিয়গণ গন্তব্য পথ চিনিতে পারিবে না। দীপমালায় অন্ধকার বিনষ্ট কর। গঙ্গাস্রোতে দীপগুলি ছাড়িয়া দাও। স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাক্। প্রেতপুরুষগণ দীপগুলি ধরিয়া লইবেন। ব্যোমবহ্নি ঊর্দ্ধমুখে ছাড়িয়া দাও। পিতৃপক্ষ ব্যাপিয়া বারি-ধারায় পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি; আজি অমাবস্যার অন্ধকারে মহালয়া; যমলোক ত্যাগ করিয়া যাঁহারা মহালয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারা উজ্জ্বলজ্যোতি ব্যোমবহ্নির সাহায্যে পথ চিনিয়া লউন।

শুধু শোক করিলে, যে যায় সে কি ফিরিয়া আসে? মৃত্যুর উপরে যে

রহস্যের আবরণ আছে, তাহা উন্মোচন করিতে হইবে। সে বড় দুর্ভেদ্য রহস্য। বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে; তবে মরণতত্ত্ব জানিবে। যদি মরণতত্ত্ব জানিতে চাও, নিজে অমৃত পান কর। ঋষিগণ সোমপান করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন। সোমলতা হইতে অমৃত নিষ্কাশন কর; দ্রাক্ষালতা হইতে অমৃতরস বাহির কর। গৌড়ীপৈষ্টীও অভাবে চলিতে পারিবে। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিবে, বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইবে, আবরণ অপসৃত হইবে, রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। ইহার নাম গুপ্ত বিদ্যা; এই বিদ্যালাভে যথাবিধি দীক্ষা চাই। যে সে ইহাতে অধিকারী নহে। দীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম। সাবধান, অনধিকারী যেন এখানে প্রবেশলাভ না করে। পশ্বাচারী যেন বীরত্বের স্পর্দ্ধা না করে। খ্রীষ্টের শোণিতধারা যে খর্পরমধ্যে গৃহীত হইয়াছিল, যে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। শুদ্ধসত্ত্ব সার গালাহাড্ তাহার দর্শন পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের শোণিত বেদির উপর মদিরারূপে বিদ্যমান। দীক্ষিত তাহা পান করেন; অপরের তাহাতে অধিকার নাই।

শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া, ঢাকঢোল বাজাইয়া, নৃত্য-গীত-উৎসব হাসিকান্না দ্বারা, দেবীর পূজা কর। ধূপধুনা জ্বালাও; পশুরক্তে নররক্তে মহীতল সিক্ত কর; তাহাতে দেবীর তৃপ্তি হইতে পারে। প্রাচীন ফিনিশিয়ায় দেবতার তর্পণ কিরূপে হইত? স্বয়ং এল দেব জগতের হিতের জন্য আপন পুত্রের কণ্ঠশোণিতে মহীতল সিক্ত করিয়াছিলেন। ফিনিকেরা তাহা জানিত; যখনই কোন দৈবী অথবা মানুষী আপৎ আপতিত হইয়া স্বদেশের জন্য আশঙ্কা জন্মাইত, তখনই পিতা আপন পুত্র আনিয়া দিত, মাতা আপন কন্যা আনিয়া দিত। নরকণ্ঠনিঃসৃত তপ্তশোণিতে দেবীর তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা হইত। কিন্তু তাহাতেও বুঝি মহাদেবীর তৃপ্তিলাভ ঘটিত না। তিনি অন্যবিধ বলি উপহার চাহিতেন, সে উপহার বীভৎস।

গুপ্তবিদ্যায় যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া অনধিকারীর চক্ষু হইতে সাধনাকে গুপ্ত রাখেন। সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়োজন নাই। গুপ্ত সাধনা গুপ্ত থাকুক। বাবিলনে মাইলিটা দেবীর মন্দিরে, ফিনিকেয়া আস্তার্ত্তি দেবীর মন্দিরে, যে সকল অনুষ্ঠান করিত, সাইপ্রস দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী সাগরফেনোদ্ভবা আফ্রুজিৎ দেবীর উপাসনায় যাহা অনুষ্ঠিত হইত, দায়নীসস দেবের পূজোপলক্ষে প্রাচীন থ্রেসে ইতর ভদ্র নরনারী একত্র উপস্থিত হইয়া যে সকল আচরণ করিত, পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টান নরনারী আগাপীর প্রীতিভোজে সমবেত হইয়া যে অনুষ্ঠান সম্পাদন করিত, বৌদ্ধবিহারমধ্যে আর্য্য তারা ও অনবদ্যাঙ্গী প্রজ্ঞাপারমিতার পূজার্থ সমবেত ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা মানবের ইতিহাসে অতীত ঘটনা নহে। এখনও অন্তঃস্রোতস্বিনী ফল্গুধারার মত, নরসমাজে সেই স্রোত বহিয়া আসিতেছে; কবে তাহার গতি রুদ্ধ হইবে জানি না। তবে শুষ্ক বালুকা উৎখাত করিয়া সেই প্রবাহে আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি-পূজার মন্দিরদ্বার অর্গলরুদ্ধ রহুক।

ধর্ম্মের জয়

উৎকট প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ভূমণ্ডলে পাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং এই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া গুরুমহাশয়পরম্পরা বিনীত শিষ্যগণকে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। আমাদের পুরাণ শাস্ত্রে যমরাজ ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দণ্ডপাণি গুরুমহাশয়ে সেই দক্ষিণ-দিক্‌পালের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কবিহ্বল ছাত্রবর্গ ধর্ম্মের তাৎকালিক জয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় হওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে তাহাদের মনের মধ্যে একটা সংশয় বাধিয়া যায়। নতুবা মনুষ্যগণ এতকাল ধরিয়া শৈশবকালে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিলেও, আজিকার দিনে ধর্ম্মকে তাঁহার চারিখানি পায়ের মধ্যে তিনখানি হারাইয়া নিতান্ত খঞ্জের ন্যায় বিচরণ করিতে হইত না। নতুবা এই তিন হাজার বৎসরে মনুষ্যজাতির অন্য বিষয়ে এত অদ্ভুত উন্নতি সত্ত্বেও ধর্ম্মবিষয়ে তাহার উন্নতি আদৌ ঘটিয়াছে কি না সে বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত সংশয় করিতেন না।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন, এখনও ঠিক্ তেমনি, আর্ত্তের ও ব্যথিতের করুণস্বর দয়াময় জগৎকর্ত্তার অভিমুখে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু জগৎকর্ত্তার হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইতেছে না। ঠিক তেমনি ভাবে সবল দুর্ব্বলের হৃদয়শোণিত পান করিয়া আপনার তৃষ্ণানিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন ন্যায়পরায়ণ বিধাতা সেই অত্যাচারের প্রতীকার করিতেছেন না। ঠিক তেমনি ভাবেই অধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া অহরহঃ

ধর্ম্মের গ্লানিসম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোন দণ্ডদাতা সাধুর পরিত্রাণের ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন না। দুই সহস্র বৎসর হইতে চলিল, ইহুদীজাতির মধ্যে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের রাজ্য অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে এই আশ্বাসবাণী ও অভয়বাণী প্রচার করিয়া অশান্তিপূর্ণ নরসমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মসমাজেই অধর্ম্ম ধর্ম্মের ধ্বজা আন্দোলন করিয়া ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া ভূমণ্ডলের বিশাল রঙ্গ মঞ্চের উপর আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে; ধর্ম্ম তাহা অকাতরে সহিয়া যাইতেছেন।

শ্রোতৃবর্গ কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন, আমরা একবার যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই চির-প্রচলিত নীতিবাক্যের যাথার্থ্যবিচারে অথবা তাৎপর্য্যবিচারে প্রবৃত্ত হইব। ঐ নীতিবাক্যের যাথার্থ্যে আমি কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিতেছি, এই মনে করিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যদি কেহ ইতিমধ্যেই হতভাগ্য প্রবন্ধপাঠকের প্রতি রক্তকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমি সহিষ্ণুতার ভিখারী হইতেছি।

আমি পূরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই সভামধ্যে উপস্থিত কেহই নাই যিনি ধর্ম্মের জয় হউক ইহা অকপটে মনের সহিত বাঞ্ছা করেন না। ধর্ম্মের জয়ে আনন্দলাভ সুস্থ মানবচিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক। অতি বড় অধার্ম্মিক, শাস্ত্রে যাহাকে মহাপাতকী বা অতিপাতকী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে ব্যক্তিও ধর্ম্মের পরাভবে মন ভরিয়া উল্লসিত হয় না, এরূপ সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু জগৎপ্রণালীর কি বিচিত্র বিধান, আমরা যাহা বাঞ্ছা করি, তাহা সর্ব্বত্র ঘটে না। ধর্ম্মের জয় আমরা বাঞ্ছা করি বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না ইহা সত্য কথা। ধর্ম্মের জয় যদি প্রত্যক্ষ নিত্য ঘটনা হইত, তাহা হইলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন অধম পাতকীকে অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে পাইতে দেখিলে, আমরা এত

উৎসাহের সহিত, এত আনন্দের সহিত তাহা ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গল্প করিয়া বেড়াইতাম না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে আমাদিগকে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হইতে হইত না। যদি মনুষ্যমাত্রই চক্ষুর উপর দেখিতে পাইত, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়, যদি নিজ জীবনে ও প্রতিবেশীর জীবনে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে অধর্ম্ম এরূপ দর্পের সহিত বুক ফুলাইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে সাহসী হইত না। তাহা হইলে অধার্ম্মিককে দমনে রাখিবার জন্য রাজার সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হইত না; শান্তিরক্ষার জন্য অশান্তির অবতার পুলিশ প্রহরীকে রাজার পক্ষ হইতে বেতন ও প্রজার পক্ষ হইতে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন হইত না। ধর্ম্মাধিকরণের প্রাচীরমধ্যে বিচারকর্ত্তাকে ফরিয়াদির অভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। রাজব্যয়ে নির্ম্মিত কারাগারগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানমতে কালেজের ছাত্রাবাসে পরিণত করা এবং জেল-দারোগাদিগকে কালেজ-ইন্‌স্পেক্টারিতে নিযুক্ত করা সহজ হইত। সমাজ-শাসনের প্রয়োগের অবকাশ না পাইয়া সমাজ-পতিগণ কর্ম্মাভাবে তাসপাশাকে দুর্মূল্য করিয়া তুলিতেন। নীতি-কথার পুস্তকগুলি ক্রেতার অভাবে দোকানের মধ্যে কীটদষ্ট হইতে থাকিত; যাজকেরা যজমানের অভাবে হলকর্ষণ আরম্ভ করিতেন; ধর্ম্মপ্রচারকেরা শ্রোতার অভাবে থিয়েটারের দল বাঁধিতেন; সন্ন্যাসীরা শিকারের অভাবে রোমন্থন করিতে আরম্ভ করিতেন; তাঁহাদের গেরুয়া বসন যাদুঘরের গ্লাসকেসের মধ্যে শোভা পাইত।

কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এ সকল কিছুই ঘটে নাই। রাজ-শাসন, সমাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন অধর্ম্মকে দমনে রাখিবার জন্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পীনালকোডে পুরাতন ধারার সংশোধনের জন্য ও নূতন ধারা বসাইবার জন্য রাজমন্ত্রিগণ মন্ত্রণা আঁটিতেছেন;

কারাগারের পরিধি, সম্প্রসারিত করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নক্‌সা টানিতেছেন; এণ্ট্রান্স কোর্সের মধ্যে কয় পাতা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ও নীতিশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, তজ্জন্য সেনেট সভায় বিতণ্ডা চলিতেছে; গুরুমহাশয়েরা ছাত্রের পৃষ্ঠে বেত্রপ্রয়োগে ধর্ম্মের জয়ের নমুনা দেখাইয়া গাঁজার পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন। কাজেই বলা চলে না, ধর্ম্মের জয় সংসারে নিত্য ঘটনা। অধর্ম্মের শাস্তি হাতে হাতে ঘটিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না; রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্ম্মের শাসনের কিছুই প্রয়োজন হইত না।

তথাপি আমরা প্রতি নিশ্বাসেই বলিয়া থাকি ও বলিতে চাহি,—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। জগৎপ্রণালীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বিধানই যেন এইরূপ। ঐ বিধান মানবকল্পিত বিধান নহে। জগদ্‌যন্ত্রের নিয়ামক যদি কেহ থাকেন, তিনি স্বয়ং ঐ বিধান বিহিত করিয়াছেন। উহা রাজার ও সমাজ-পতির ও ধর্ম্মপ্রচারকের কোন অপেক্ষা রাখে না। যে অধার্ম্মিক, সে রাজার চোখে ধূলা দিয়া রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে; সে সমাজপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে; সে ধর্ম্মপ্রচারকের সম্মুখে ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া সার্টিফিকেট পাইতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, তাহার দৃষ্টির অন্তরালে, তাহার নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্য-ভাবে ধর্ম্মের ফাঁদ পাতা রহিয়াছে; তাহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। সেই ফাঁদে তাহাকে পা দিতেই হইবে। আজি দিতে না হউক, কালি দিতে হইবে; কালি দিতে না হউক, পরশু দিতে হইবে। সেই ফাঁদ সে কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। সেখানে এক দিন ধরা পড়িতেই হইবে। সেই দর্শনের অগোচর নিয়ন্তার ও শাস্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিবার কোন উপায় নাই; তাঁহাকে ফাঁকি দিবার কোন উপায় নাই; তাহা হইতে গোপনে রহিবার কোন উপায় নাই; মানুষকে ফাঁকি দেওয়া চলে, রাজাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, সমাজকে ফাঁকি দেওয়া চলে, মনুষ্য-

জাতিকে ফাঁকি দেওয়া চলে; কিন্তু এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই জগদ্বিধানের নির্ম্মম হস্ত সকল সময়ে ক্ষিপ্রতা না দেখাইতে পারে, কিন্তু উহার সন্ধান অব্যর্থ। উহা অজ্ঞের নিকট অন্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা নিবিড় অন্ধকারে দেখিতে পায়। উহা কখন কোথা হইতে কিরূপে অজ্ঞাতসারে অজ্ঞাত প্রণালীতে কাজ করে, তাহা নির্ব্বোধ মানবের বুদ্ধির অতীত; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে উহা কাজ করিতে ভুলে না। উহা অভ্রান্ত, উহা সদা জাগ্রত, উহা সর্ব্বদা চেতন।

যখন আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি, তখন আমরা সেই অদৃশ্য দুর্বোধ্য জগদ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার উল্লেখ করি। অপরাধ করিলে রাজা দণ্ড দিতে পারেন বা নাও পারেন; সমাজ শাস্তি দিতে পারে বা নাও পারে; রাজাকে উৎকোচ দেওয়া সহজ, সমাজকে প্রতারিত করা সহজ; কিন্তু যদি রাজার ভয় না থাকিত, সমাজের শাসনের ভয় যদি একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলেও ঐ জাগতিক বিধান হইতে কোন পাপী অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত না। যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের অর্থই ইহাই। উহার অন্যবিধ অর্থ করিলে উহাকে খাট করা হয়; উহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে উহার গৌরব থাকে না।

উহার অর্থ উহাই বটে; এবং অন্য অর্থ করিলে উহার গৌরব থাকে না, তাহাও ঠিক কথা; কিন্তু বস্তুতই কি জগতের বিধান এইরূপ? বস্তুতই কি পাপী জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া পার পাইতে পারে না? অমুক ফাঁকি দিতে পারে নাই, অমুক পারে নাই; দেবদত্ত পারে নাই, যজ্ঞদত্ত পারে নাই, বেণ, নহুষ, হইতে জয়চন্দ্র, মীরজাফর পর্য্যন্ত পারে নাই; অথবা অনেকে পারে না, বহুলোকে পারে না, অধিকাংশ লোকে পারে না; এইরূপ বলিলে ঐ নীতিবাক্যের সার্থকতা থাকিবে না, উহার গৌরব রক্ষিত

হইবে না। দেখাইতে হইবে, কোন ব্যক্তিই পারে না; এই বর্ত্তমান ক্ষণে ধরাপৃষ্ঠে যে দেড় শত কোটি মনুষ্য বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক জনও ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারিবে না; ও তাহাদের যে সহস্র কোটি পূর্ব্ব পুরুষ অতীতকালের কুক্ষিতে লীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও পারে নাই। যদি এই অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান মনুষ্যসঙ্ঘের মধ্যে একজনও এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া অতিক্রম করিয়া থাকে বা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ধর্ম্মের পরাভব হইল; সেই ক্ষেত্রে অধর্ম্মের বিজয় হইল; তাহা হইলে ঐ নীতিবাক্য আপনার উচ্চ মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইল। কেন না, ঐ জগদ্বিধান এরূপ বিধান, উহার কোন এক স্থানে অন্যথাভাব কল্পনা করিলে উহার সার্থকতা থাকে না; উহা এক সংক্ষিপ্ত সূত্র, উহার বিকল্প কল্পিত হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? বস্তুতই কি ঐ সূত্রের বিকল্প নাই? বস্তুতই কি অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী? বস্তুতই কি অধর্ম্মের ফল সর্ব্বত্র হাতে হাতে ফলে?

অধর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হউক না হউক, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা অস্বীকার করিয়া ফল নাই। ইহা অস্বীকার করিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে; এবং ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া একটা মিথ্যা কথা বলা নিতান্তই সাজে না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে জগতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ধর্ম্মে এত দুর্ভিক্ষ হইত না। হাতে হাতে শাস্তি পাইলে এমন সাহসী কেহই নাই, এমন দুর্দ্ধর্ষ কেহই নাই, যে সেই অঙ্কুশতাড়না অহরহঃ সহ্য করিয়াও উন্মার্গগমনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা সত্য কথা; ইহার অপলাপ চলিবে না।

কাজেই ঘুরাইয়া বলিতে হয়, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে না ফলিতে পারে, কিন্তু অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী শব্দ

ব্যবহার করিয়া উহাকে অনাগত ভবিষ্যতের গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আজ হউক, কাল হউক, বা অন্য দিন হউক, এক দিন না এক দিন, অধর্ম্মের ফল ফলিবে; উহা সর্ব্বত্র হাতে হাতে ফলে না—কিন্তু এক দিন না এক দিন ফলে।

ক্লাইবের না ওয়ারেন হেষ্টিংসের, কাহার ঠিক্ মনে হইতেছে না, কুকর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লর্ড মেকলে এই ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন, অধর্ম্মটা কিছু নহে, উহার ফল হাতে হাতে ফলে না বটে, কিন্তু ফলে—in the long run অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত। লর্ড মেকলের সজাতীয়েরা দয়াধর্ম্মের নিতান্ত বশীভূত হইয়া উচ্চতর নীতির শিক্ষা দ্বারা এই পতিত জাতির উদ্ধারসাধনের জন্য এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং লর্ড মেকলে স্বয়ং নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া আমাদের পুরাতন অসভ্য শিক্ষা প্রণালীর বদলে সভ্যতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; অতএব অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তদুপদিষ্ট ধর্ম্মনীতি শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য আছি, এবং ক্লাইবের ও হেষ্টিংসের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল বিলম্বিত হউক, ইহাই অকপটে আমরা প্রার্থনা করি। কিন্তু এই long run—এই লম্বা দৌড়—কত কালের দৌড়, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন এই ধর্ম্মবিচারে আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। আমরা যে উচ্চতর খ্রীষ্টীয় সভ্যতা গ্রহণের জন্য কখন সাদরে, কখন কর্ণমর্দ্দনসহকারে, আহূত হই, সেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের গোড়ায় না কি একটা কথা আছে, মানবজাতির আদিম মাতাপিতার কর্ম্মের ফল সন্ততিকে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাতেই যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের সার্থকতা ঘটিয়াছে। মানবজাতির অতিবৃদ্ধ পূর্ব্বপিতামহ ও অতিবৃদ্ধা পূর্ব্বপিতামহী যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হতভাগ্য সন্তানপরম্পরা এত যুগ ধরিয়া তাহার সমুচিত

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতেছে, এবং এই যুগব্যাপী ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বেও তাহাদিগকে সেই অন্তিম দিনের বিচারের পর নরকের অগ্নিকুণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে in the long run—অতি লম্বা দৌড়ে—মানুষকে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রকে ভোগ করিতে হয়, পৌত্রকে ভোগ করিতে হয়, এবং যে পরপুরুষকে সেই মূল দুষ্কৃতকারীর সপিণ্ডীকরণও করিতে হয় না, তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। এইরূপে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের সার্থকতা ঘটে; এইরূপেই জাগতিক বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে।

কথাটা মিথ্যা নহে। দুষ্কৃতকারী পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রে ভোগ না করে, এমন নহে। কেবল পুত্র কেন, পিতার কর্ম্মফল সাতপুরুষ ধরিয়া ও চৌদ্দপুরুষ ধরিয়া অধস্তন পুরুষগণের হাড়ে হাড়ে সংক্রমণ করে, তাহার প্রমাণসংগ্রহের জন্য ডাক্তারের ও প্যাথলজি বিদ্যার সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হইবে না। নবীন বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের মুখ চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, বৃদ্ধ নরপতি লক্ষ্মণ সেন কি করিয়াছিলেন বা না করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ জানি না। কিন্তু যদি তিনি তদারোপিত দুষ্কর্ম্মটুকু করিয়া থাকেন, আমরা সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, যাহারা সেনবংশে জন্মে নাই, যাহাদের ধমনীতে লক্ষ্মণ সেনের শোণিতের এক কণিকামাত্রও বিদ্যমান নাই, তাহারাও তাঁহার কর্ম্মের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছে। পিতার কর্ম্মফল পুত্রে ভোগ করে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই ধর্ম্মনীতির সার্থকতা হয় কি না, তাহা বিচার্য্য। খ্রীষ্টানেরা প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবের যতটা স্বাধীনতা, যতটা পরের প্রতি অনপেক্ষিতা স্বীকার করেন, আমরা ততটা স্বীকার করিতে চাহি না। আপনাকে সর্ব্বভূতে নিরীক্ষণ করিতে আমরা ভগবদুপদেশ লাভ করিয়াছি; সুতরাং একের কর্ম্মফলে অন্যের শাস্তিলাভ আমাদের নিকট নিতান্ত দুরূহ সমস্যা না

হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টানের ন্যায় জীবের স্বাতন্ত্র্যবাদী কিরূপে এক অতিপ্রাচীন অতিবৃদ্ধপিতামহের স্কন্ধের উপর—যাঁহার পক্ষসমর্থন করিবার জন্য, যাঁহার অপরাধক্ষালনের জন্য, কোন আধুনিক উকীল ব্রীফ গ্রহণে সম্মত হইবেন না, যাঁহার জন্মকালনিরূপণে ও মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে গবেষণায় কোন ঐতিহাসিক সাহসী হইবেন না, যাঁহার অস্থিকয়-খানি কোন টার্শিয়ারি প্রস্তর হইতে আবিষ্কার করিয়া মিউজিয়মে পাঠাইতে সমর্থ হইতে কোন ভূতত্ত্ববিৎ আশা করেন না—সেই অতি পুরাতন পিতামহের স্কন্ধে এই বিশাল মানবসমষ্টির আধিব্যাধি, শোকতাপ, জরা-মরণের দুর্ভর দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহা একটা মহাসমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসার ভার আমাদের উচ্চতর ধর্ম্মনীতির শিক্ষকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইব, একের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই ধর্ম্মনীতির ঠিক্ সার্থকতা হয় না—তাহাতে ঐ জগদ্বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঠিক্ ঘটে না। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে; অন্যে তাহার ভাগ পাইল কি না, ভাগ পাইবে কি না, তাহা দেখার দরকার নাই; ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। অপরে ফল ভোগ করুক আর নাই করুক, আমি অধর্ম্ম করিয়া নিষ্কৃতি পাইব না, উহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। আমাকে একাকী আমার কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে; আমি একাকী সমস্ত দণ্ড বহন করিব; রত্নাকরের আত্মীয়েরা তাহার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে চাহে নাই, আমার আত্মীয় লোকেও সেইরূপ আমার পাপের ফলের ভাগ লইতে চাহিবে না;—এইরূপ বিধানে পাপীর মনে যতটা ভয়সঞ্চার হইতে পারে, অন্যকেও সে তাহার ফাঁদে জড়াইতে পারিবে—কুম্ভীপাকের অগ্নিকুণ্ডেও সে সহচর পাইবে, এই আশ্বাস পাইলে নরকাগ্নিও তাহার নিকট ততটা আতঙ্কজনক না হইতে পারে। বস্তুতই

মানুষের মনের এমনি গতি যে, একাকী কোন নূতন পথে চলিতে তাহার সাহস হয় না; একাকী তাহার স্বর্গে যাইতেও ভয় হয়; আর দল বাঁধিয়া যাইতে পারিবে এই আশা থাকিলে শয়তানের পুরীতে প্রবেশ করিতেও সে তেমন ভয় পায় না। একের কর্ম্ম অন্যকে স্পর্শ করে, ইহা সত্য কথা। একের কর্ম্ম অন্যের স্পর্শ করা উচিত কি না, সে উৎকট তত্ত্বের মীমাংসায় এ স্থলে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমরা যখন যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই প্রবচন উচ্চারণ করি, তখন অপরের দিকে চাহি না; যে ধার্ম্মিক তাহারই জয়, অন্যের নহে; যে অধার্ম্মিক তাহারই পরাজয়, তাহার পুত্রপৌত্রাদির বা স্বজন প্রতিবেশীর নহে;—এই সরল স্পষ্ট কথাই আমাদের অভিপ্রেত হয়।

কাজেই পরের উপর নিজের কর্ম্মফল চাপাইয়া in the long run বা লম্বা দৌড়ে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় হইবে এরূপ বলিলে চলিবে না। আপন কর্ম্মের ফল আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে, ইহারই প্রতিপাদনের দরকার। অথচ মোটের উপর যখন দেখা যায়, অধর্ম্ম জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ধর্ম্মকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জীবনের নৌকায় সুখের পবনে পা'ল তুলিয়া ভাসিয়া চলিতেছে, তখন বলা যায়, নৌকা এক দিন না একদিন ভরাডুবি হইবে। আজি না হউক, কালি না হউক, এক দিন ভরাডুবি হইবেই। কিন্তু আবার যখন দেখা যায়, পাপের বোঝা লইয়া তরীখানি অবহেলে ভবসমুদ্র পার হইয়া চলিয়া গেল, তখন বলা হয়, ভবসমুদ্র একটা ক্ষুদ্র উপসাগর বৈ ত নহে, বৈতরণীর প্রণালীর অপর পারে যে প্রকাণ্ড মহাসাগর বর্ত্তমান আছে, সেইখানে গেলেই নৌকাখানি উল্টাইয়া যাইবে, এবং তখন অধর্ম্মের পরাভব ঘটিবে, তাহার আর সংশয়মাত্র নাই।

পরজন্মের অস্তিত্বে আপনারা বিশ্বাস করেন কি না আমি জানি না,—অনেকে হয় ত করেন, অনেকে হয় ত উহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া

দেন,—সেই অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে গিয়া এই সম্মুখস্থ বিপুল শ্রোতৃসঙ্ঘের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে এই ক্ষীণদেহ প্রবন্ধপাঠকের ক্ষমতা নাই। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈতরণীর ও পার হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদিগকে দেখা দেন নাই এবং ও পারে কি আছে না আছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই,—অন্ততঃ আমাদের দুই এক জন থিয়সফিষ্ট বন্ধু ব্যতীত অন্যকে সেরূপ অনুগ্রহ করেন নাই—তখন অন্য কোন উপায়ে আমরা পরজন্মের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। ইহ জন্মে যদি সর্ব্বত্র পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখা যাইত, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও তাহার ফলভোগ যদি সর্ব্বত্রই ইহজন্মে হাতে হাতে ঘটিতে দেখা যাইত, তাহা হইলে পরজন্মে যাঁহাদের এখন ধ্রুব বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি হয় ত শিথিল হইত। যিনি পুণ্যবান্, তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার ইহলোকে সর্ব্বত্র পান না, এবং যে পাপী, সে তাহার প্রাপ্য তিরস্কার ইহলোকে সর্ব্বত্র পায় না; ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াই আমরা আশা করিয়া বসিয়া আছি, অন্যত্র এই পুরস্কারের ও তিরস্কারের বিতরণটা ঘটিবেই ঘটিবে। নতুবা যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই বাক্যের সার্থকতা থাকিবে না; নতুবা অধর্ম্মেরই জয় হইবে; কেননা ইহজন্মে অধর্ম্মের জয় প্রত্যক্ষ; চোখের উপর ঘটিতে সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, ইহা অপলাপের উপায় নাই। অধর্ম্ম জিতিয়া যাইবে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, কোথাও তাহার অবশ্যপ্রাপ্য দণ্ড লাভ করিবে না, ইহা মনে করিতে গেলে আমাদের জীবনের গ্রন্থি একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। কেন না, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবনের ভিত্তি, অন্ততঃ মনুষ্যের সামাজিক জীবনের ভিত্তি; সেই ভিত্তি যদি এরূপ আলগা মাটিতে নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে জীবনের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান চলে না; জীবনের পথে সাহস করিয়া এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না; কোথা হইতে কে আসিয়া একটা ধাক্কা দিয়া

আমাদিগকে দলিত পিষ্ট করিয়া দিবে, সেই ভয়েই আমাদিগকে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া চলিতে হয়। কাজেই আমাদের স্বার্থের জন্য, আমাদের সর্ব্বস্বের জন্য, আমাদের জীবনের অনুরোধে, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, জীবনের ভিত্তি তেমন শিথিল নহে; ধর্ম্মের দেহ জমাট মশলাতে গঠিত; উহা কোনরূপে ভাঙ্গিবার উপায় নাই; সেই জন্য আমরা মানিয়া লই যে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই সূত্রের কোন বিকল্প সম্ভবপর নহে। আজি হউক, কালি হউক, ইহজন্মে না হউক পরজন্মে, কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী; অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইহা স্বীকার করি। স্বীকার করি, না বলিয়া, আশা করি বলিলে বোধ হয় ঠিক্ হয়; কেন না ঐরূপ আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীবনের নৌকায় দাঁড় ফেলিয়া ভবসমুদ্রের ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া চলিতেছি। ঐরূপ আশা না থাকিলে আমরা কিরূপে অধর্ম্মকে তাহার আস্ফালন হইতে নিরস্ত করিতাম। যদি কোটি মনুষ্যের মধ্যে এক জনও ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি পাইবে এরূপ সম্ভব হইত, এজন্মে বা পরজন্মে কোথাও সমুচিত শাস্তিলাভ করিবে না এরূপ সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমার প্রতিবেশী যখন মুদ্গর তুলিয়া আমার মাথা ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইতাম যে, সে সেই এক জন হইবে না; তাহাকে কি বিভীষিকা দেখাইয়া আমি নিরস্ত করিতে পারিতাম। এখন আমি তাহাকে এই বিভীষিকা দেখাই—ভ্রাতঃ, অত আস্ফালন করিও না; তুমি আপাততঃ আমার মাথায় মুদ্গরাঘাত করিতে পার, তোমার হাতে বল আছে, তোমার মুদ্গরে প্রচুর শক্তি আছে, আমার মাথার খুলিও ভঙ্গপ্রবণ; কিন্তু একদিন না একদিন কোন অদৃশ্য হস্ত, কোন মহৎ ভয়, বজ্র উদ্যত করিয়া তোমার কপালে আপতিত হইবে, তোমার মস্তিষ্ক ছড়াইয়া দিবে, তোমার আজিকার কৃত অপকর্ম্মের প্রতিফল দিবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে শক্ত হইবে না। এইরূপ আশা করিয়া, এই আশ্বাসে, এই সান্ত্বনায় আমরা জীবনের পথে চলিয়া থাকি;

নতুবা জীবনের পথে চলা অসাধ্য হইত, নতুবা, একেই ত জীবনে আতঙ্কের সীমা নাই, আতঙ্কের মাত্রা আরও বাড়িলে অভাগা পথিকদিগকে আত্মহত্যা করিয়া জীবনলীলা অকালে সমাপ্ত করিতে হইত।

সকলের পক্ষে না হউক, অনেকের পক্ষেই পরকাল এইরূপ আশার সামগ্রী ও আশ্বাসের বিষয় ও সান্ত্বনার আশ্রয়। ইহকালে আমরা সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় দেখি না বলিয়াই পরকালের আশায় বসিয়া থাকি; এবং আমরা হিন্দুজাতি, আমরা পরকালেও মানুষে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবে, এরূপ কল্পনায় আনিতে পারি না; আমরা সেই পরজন্মকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিবার জন্য জন্মজন্মান্তর বা জন্মান্তরপরম্পরা কল্পনা করিয়া থাকি। এই কোটি জন্মের পরম্পরায় পরিভ্রমণের নাম সংসার—আমরা এই সংসারের চক্রে ভ্রমণ করিতেছি; এ লোক হইতে ও লোক, ও লোক হইতে সে লোক আমরা কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; যেখানেই থাকি, কর্ম্ম করিতেই হইবে; স্বর্গে গিয়াও ধান ভানিতে হইবে; ভাল হউক মন্দ হউক, কর্ম্ম করিতে হইবে; নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইবার উপায় নাই; এবং সেই ভাল কাজের বা মন্দ কাজের ফলভোগও করিতে হইবে। না করিলে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না; নতুবা জগদ্‌যন্ত্র মরিচা পড়িয়া বিকল হইয়া কোন দিন বন্ধ হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকে; নতুবা জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে না। কবে এই কর্ম্মপাশের বন্ধন হইতে শ্রান্ত জীব মুক্তিলাভ করিবে, এই উপায়ের আবিষ্কারে আমাদের পিতামহগণের ধীশক্তি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত ছিল; "অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে, পায় কি নিস্তার," এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা এতকাল ধরিয়া ব্যাকুল রহিয়াছি।

আমি আজ সেই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসারূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। সে সাহস আমার নাই, সে ক্ষমতা আমার নাই;

আমার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ; আমি যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই বাক্যটির সার্থকতা কতটুকু, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহাই কেবল বুঝিতে চাহি। তাহাই বুঝিতে চাহি, কেন না অনেক সময়ে আমরা এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না; কি অর্থে বলিতেছি, তাহা অনেক সময়ে নিজেই জানি না; অপরকে কি অর্থ বুঝাইতে চাহি, সে সম্বন্ধেও কোন দৃঢ় ধারণা আমাদের থাকে না। একটু চাপিয়া ধরিলেই বুঝা যাইবে, এই বর্ত্তমান ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট! বস্তুতঃ ইহলোকে ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না—ঘটে না দেখিয়াই আমরা জন্মান্তরের কল্পনা করি বা অস্তিত্ব স্বীকার করি—জন্মান্তরের আশা করি ও অপেক্ষা করি; অথচ ইহ জীবনেই যে ধর্ম্মের জয় ঘটে না, এরূপও পূরা সাহসের সহিত বলিতে পারি না। অধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহলোকটা ফাঁকি দিয়া উত্তীর্ণ হইল, চোখের উপর দেখিতে পাইলাম, —পরকালে তাহার যথোপযুক্ত সে দণ্ড পাইবে, এইরূপ প্রত্যাশাও থাকিল,—অথচ ভিতরে একটা খটকা রহিয়া গেল। যদি কোনরূপে আবিষ্কার করিতে পারি যে না, লোকটা ইহলোকেই নরকযাতনা ভোগ করিয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি নাই; ইহলোকেই সে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে; বাহিরে সে আস্ফালন করিয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে পুড়িয়া মরিয়াছে;—এইরূপ যদি আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমরা মনকে বুঝাইতে চাহি যে যদিও পাপী পাপের জন্য ইহকালে কোন শারীরিক বা ভৌতিক দণ্ড লাভ না করে, তথাপি একটা আধ্যাত্মিক শাস্তি লাভ তাহার ঘটিবেই ঘটিবে। তাহার পার্থিব বা সংসারিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, সমাজের নিকটে সে ধনে, মানে, পদে, যশে, গৌরবে বাহবা লইয়া জয়ঢাক বাজাইয়া জীবনযাত্রা সমাপন করিতে পারে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে সে পাপের ফল হাতে হাতে সমুচিতভাবে

অনুক্ষণ ভোগ করিয়া থাকে, লোকে তাহা দেখিতে পায় না বা জানিতে পারে না। পাপীর মনের ভিতর, তাহার অভ্যন্তরে, সর্ব্বদা চৌষট্টি নরকের আগুন জ্বলে, সেই নরকাগ্নি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নাই; পাপী স্বীকার করুক আর নাই করুক, তাহার পাপের ফল সে দিবানিশি জাগ্রতে ও স্বপ্নে ভোগ করিতে বাধ্য হয়। স্বপ্নসঞ্চারিণী লেডি ম্যাকবেথের রক্তলিপ্ত হস্ত সপ্ত সাগরের জলে ধৌত হয় নাই, পৃথিবীর যাবতীয় সুরভিদ্রব্যের ধূপ সেই শোণিতের গন্ধ নাশ করিতে পারে নাই। পাপের শাস্তির জন্য পরলোকে নরককল্পনা অনাবশ্যক; ইহলোকেই পাপীর হৃদয় যে নরককুণ্ডে পরিণত হয়, কোন কাল্পনিক রৌরবের সহিত তাহার ভীষণতার তুলনা হয় না।

কথাটা সত্য বটে, আবার সম্পূর্ণ সত্য বটে কিনা ইহা লইয়াও তর্ক চলিতে পারে। এমন পাষণ্ড কি বস্তুতই অস্তিত্বহীন, যে পাপকর্ম্মজন্য অনুতাপভোগেও বঞ্চিত আছে? যে পাপী অনুতাপ করিতে পারে, তাহার পাপের হয়ত কোথাও ক্ষমা আছে; কিন্তু যে অনুতাপ করিতে পারে না বা জানে না, এমন মহাপাপীও কি সংসারে একবারে অস্তিত্বহীন? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য; তবে আমরা যখন যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই বাক্য ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মের জয়গানে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা এই আধ্যাত্মিক নরকভোগের কথা মনে করি না, ইহা সত্য কথা। আমরা বুঝি যে এই যে জয়, ইহা সংসারে জয়, বৈষয়িক জয়, ভৌতিক জয়। অধর্ম্মের যে পরাজয় প্রতিপন্ন করিতে চাহি, সে পরাজয় সাংসারিক পরাজয়; তাহা রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন ও ব্যসন রূপেই সকলের নিকট উপস্থিত হয়। ইহা ভৌতিক পরাজয়; ইহা বৈষয়িক পরাজয়; ইহা নিতান্তই পার্থিব সমুন্নতিবিষয়ে ও পার্থিবসুখলাভ বিষয়ে পরাজয়। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। নতুবা আমাদের কাব্যে উপন্যাসে, কথায় কাহিনীতে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের বক্তৃতায়, ধর্ম্মপ্রচারে,

নীতিপ্রচারে, সর্ব্বত্র, অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় ঠিক ভৌতিক বিষয় সম্পর্কেই দেখিবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত কেন? আমাদের যাত্রায় গানে, থিয়েটারে, আমাদের ঘরকন্নায়, কথাবার্ত্তায়, ঝগড়ায়, দলাদলিতে, আমাদের নাটকে, প্রহসনে, বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে, সর্ব্বত্র আমরা ইহকালেই এবং পার্থিব ভৌতিক বিষয়েই অধর্ম্মকে তিরস্কৃত ও ধর্ম্মকে পুরস্কৃত দেখিবার জন্য এত লালায়িত কেন? কোন কাব্যলেখক একখানা কাব্য লিখিলেই তাহাতে এইরূপেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সমালোচককুল এত ব্যগ্র কেন? যে কোন কুকাব্যলেখক আপনার কুকাব্যমধ্যে এই হিসাবেই অধর্ম্মের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করেন কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। এবং ইহার উত্তর দিতে হইলেই আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই বাক্যে কি অর্থে বিশ্বাস করি ও কতটুকু বিশ্বাস করি, ইহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হয়। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক; এবং যে উদাহরণটি লইব, তাহা ছোট উদাহরণ নহে। কোন অকাব্যের বা কুকাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আধুনিক ক্ষুদ্র ভারতের কোন ক্ষুদ্র কাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আমাদের মহা-ভারতের মহাকাব্য মহাভারতকেই দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিব। এই মহাভারতের মহাকাব্য হইতে আমাদের বালকবালিকা টেকস্‌ট্‌ বুক কমিটির অনুমোদিত নীতিকথার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত এণ্ট্রান্স কোর্সের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই ধর্ম্মনীতি শিখিয়া আসিতেছে। এখন আমরা দেখিতে চাহি, এই মহাভারতে ধর্ম্মের জয় কিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ—উহা ধর্ম্মযুদ্ধ, উহার উদ্দেশ্য হালের ভাষায় ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির—তিনি ধর্ম্মপুত্র এবং ধর্ম্মরাজ। ঐ নায়কের যিনি আবার নেতা ও

পরিচালক, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে জয়। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ঘটনা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের জয় এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য। যে দিন হইতে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অধর্ম্মের অবতার ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদের নিগ্রহ আরম্ভ করেন। পরম সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডবেরা সেই নিগ্রহ সহ্য করিলেন। বিষদানে ভীমের হত্যাচেষ্টা, জতুগৃহদাহ, বহুকাল অনাথের ন্যায় অরণ্যবাস, কপট দ্যূতক্রীড়া, সভাস্থলে পত্নীর দারুণ অবমাননা,—সহিষ্ণুতা ইহার বহুপূর্ব্বেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরেও বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস; তাহার পরও প্রতিশ্রুতিরক্ষায় অসম্মতি—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তখন কৃষ্ণপ্রেরিত ধর্ম্মরাজ আর ক্ষমা অবলম্বন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সবংশে বিনষ্ট হইল। পার্থিব সমৃদ্ধি হইতে তাহারা ভ্রষ্ট হইল। ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে বসিলেন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, ইহা এইরূপে প্রতিপন্ন হইল।

দেখান হইল, ধর্ম্মের জয় হাতে হাতে ঘটে না। ধর্ম্মের পথ কণ্টকে আকীর্ণ। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহাকে জীবনে নানা বিপদ্, নানা অপমান, নানা কষ্ট সহিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। অধর্ম্ম জয়ঢক্কা বাজাইয়া কিছু দিনের জন্য—বহুদিনের জন্য—ধর্ম্মকে পীড়ন করে। কিন্তু ধর্ম্মের জয় শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্য্যন্ত—in the long run—ধর্ম্মের জয় ঘটে। অধর্ম্ম পরাভূত হয় এবং ইহলোকেই পরাভূত হয়।

বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি, মহাভারতের এই শিক্ষা; ধর্ম্মের জয় ঘটে, তবে শীঘ্র না ঘটিতে পারে। কিন্তু যিনি মহাভারতের পাঠক, তিনি পদে পদে ধর্ম্মের নিগ্রহ দেখিয়া মর্ম্মাহত হন; তাঁহার সমস্ত সমবেদনা ধর্ম্মের পক্ষে ও অধর্ম্মের বিপক্ষে প্রেরিত হয়; এবং যখন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

ভীষ্মসহায়, দ্রোণসহায়, কর্ণসহায় অধর্ম্মকে পরাভূত হইতে দেখেন, তখন বুঝিতে পারেন, অধর্ম্মকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না—জগদ্বিধাতার অদৃশ্য হস্ত আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত অধর্ম্মকে দণ্ডিত করে। তখন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। কৌরবেরা এতকাল ধরিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে; শেষে যখন তাহারা তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করিল দেখা যায়, তখনই পাঠকের তৃপ্তিলাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে হয় না। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানের পরই মহাভারতের মহানাটকের প্রকৃত অবসান। অন্ততঃ বোধ হয় এইখানেই অবসান হওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষীয় কবি না হইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশের কবি হইলে এইখানেই যবনিকাপাত ঘটিত। কেন না, যে অন্তিম অঙ্কের ভীষণ অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের চিত্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের প্রেরিত গদাঘাতের সহকারে সেই অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। তার পর যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া কি করিলেন, কত বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন, কতগুলি অশ্বমেধ করিলেন, কত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, কতগুলি হাতী পুষিলেন, কত টাকা খরচে প্যালেস তৈয়ার করিলেন, কত টাকার ফর্ণিচার কিনিলেন, এ সকল অবান্তর কথা, এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা; এ সকল না বলিলেও চলিত—মূল মহানাটকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই—এ সকল কথা শুনিবার জন্য শ্রোতা বসিয়া থাকিতে চাহেন না—সভাভঙ্গে সভাপতিকে ধন্যবাদের মত এ সকল কথা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল।

বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই মহাভারতের সমাপ্তি—উহাতেই ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইল। এবং যতদিন পরেই হউক, ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিতেই অধর্ম্ম তাহার সমুচিত ফল পাইল, তাহাই এখানে প্রতিপন্ন হইল। মহাভারতের পাঠক যে পর্ব্বের পর পর্ব্ব, পর্ব্বাধ্যায়ের পর পর্ব্বাধ্যায়, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, শ্লোকের পর শ্লোক, অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত

গলদঘর্ম্ম হইয়া এই অধর্ম্মের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন, ইহাই তাঁহার পরম লাভ। তৎপরে পরকালে কৌরবগণের কোথায় গতি হইল, দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন, দুঃশাসন কোথায় গেলেন, মাতুলের জন্য যমরাজ্যে কোন্ বাড়ীখানা নির্দ্দিষ্ট হইল, আর পাণ্ডুপুত্রেরা শচীপতির উদ্যানের কোন্ কুঞ্জে স্থান পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের আগ্রহ থাকে না। পাঠক শুনিতে চাহেন না বটে, কিন্তু নাছোড়বান্দা মহাভারত-কার পাঠককে নিতান্ত জবরদস্তি করিয়া তাহার খুঁটিনাটি শুনাইতে ছাড়েন নাই। কোন্ রাস্তায় পাণ্ডুপুত্রগণ মহাপ্রস্থান করিলেন, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৈলশিখরের মধ্যে কোন্খানে—সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত ফুট উচ্চে —কে কোথায় পড়িতে লাগিলেন, সেখানে টেম্পারেচার কত ডিগ্রি, সেখানে ব্যারমিটার কত ইঞ্চিতে, কে কত ঘণ্টা আগে পড়িলেন, কে কয় ঘণ্টা পরে পড়িলেন, আর কেন আগে পড়িলেন, কেন পরে পড়িলেন, ইহজন্মকৃত পাপের মাত্রা কার কতটুকু ছিল, নিক্তি ধরিয়া রতি মাষা যবে পরিমাণ করিয়া পাঠককে তাহার হিসাব না শুনাইয়া মহাভারতকার কিছুতেই ছাড়িবেন না। পাঠকের শ্বাস রুদ্ধ হউক, পাঠক পরিত্রাহি চীৎকার করুন, মহাভারত-কার তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না।

নিতান্তই যখন পরিত্রাণ পান, তখন পাঠক বুঝিতে পারেন, মহাভারতের কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত; ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। তার পর যুধিষ্ঠির যে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, বা নরকদর্শনমাত্র করিয়াই খোলসা পাইয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মের জয়প্রতিপাদনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক ছিল না। যিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন,—অথবা আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের খাতিরে বলিতেছি, যাঁহারা মহাভারত সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি অন্যরূপ বর্ণনা করিতেন—যদি কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ে পাণ্ডবগণেরই পরাজয় হইত, ও কৌরবগণ বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া শকুনিকে অগ্রে করিয়া ফিরিয়া

আসিতেন, দুঃশাসন যদি ভীমসেনের রক্তপান করিত, আর অলম্বুষ যদি শ্রীকৃষ্ণকে অকালে বৈকুণ্ঠে পাঠাইত, এবং উপসংহারে পাঠকগণকে আশ্বাস দেওয়া হইত, ইহকালে ধর্ম্মের জয় হয় না বটে, কিন্তু পরকালে জয় অবশ্যম্ভাবী;—কেন না ইহলোকে ঐরূপ বিঘটন সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে পঁহুছিয়াই বিরাট রাজার অনুকরণে নকুলসহদেবকে আপনার আস্তাবল রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, বৃকোদরকে সূপকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পার্শ্বে বাসা দিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে কমলার নাট্যশালার ম্যানেজারি দিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত অন্তঃপুরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশাখেলায় সময় কাটাইতেন—অপিচ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ মায় মাতুল কৃতান্তের চার্জে প্রেরিত হইয়া রৌরবের অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানি কাঠে পরিণত হইয়াছিল,—যদি মহাভারত-কার এই রূপেই ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে আপনারা সন্দেহ করিবেন না যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইত, গণেশের লেখনীচালনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত, এবং লক্ষশ্লোকী বৈয়াসিকী সংহিতার কথা দূরে থাকুক, বটতলার মহাভারতও কেহ চারি পয়সা মূল্যে খরিদ করিয়া অর্থ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইত না।

কাজেই বলিতে হইবে, মহাভারতে যদি যথা ধর্ম্ম তথা জয় এই নীতি সমর্থিত হইয়া থাকে, সেখানে জয়ের তাৎপর্য্য এই লোকেই জয়—পরকালে জয় নহে, পরজন্মে জয় নহে—অনেক দুর্গতির পর শেষ পর্য্যন্ত—এই মর্ত্ত্যধামেই সাংসারিক, বৈষয়িক ও ভৌতিক হিসাবেই ধর্ম্মের জয় ঘটে। তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কৌরব ও পাণ্ডব—অধর্ম্মাচারী কৌরব সবংশে বিনষ্ট হইল—ধর্ম্মাচারী পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অতএব অহে মানব, অহে বালক, অহে বৃদ্ধ, অয়ি বনিতা, তোমরা অধর্ম্মের তাৎকালিক সমৃদ্ধি দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইও না। অধর্ম্মের ভৌতিক জয় অবশ্যম্ভাবী, এই মর্ত্ত্যধামেই অবশ্যম্ভাবী।

বাল্যকাল হইতেই শিখিয়া আসিতেছি, মহাভারত এইরূপেই ধর্ম্মের জয় শিখাইয়াছেন এবং সকলের বটে কি না জানি না, অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, মহাভারতে ধর্ম্মের জয় এইরূপেই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় মহাভারতে এই নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে মনে করিলে মহাভারতকে খাট করা হয়, ক্ষুদ্র করা হয়, মহাভারতের অপমান করা হয়, উহাকে উহার অতুল্য গৌরব হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। মহাভারতের মহাকাব্যকে আজিকালিকার ক্ষুদ্র ভারতের কুকাব্য সকলের শ্রেণীতে নামাইয়া আনা হয়। কেন না, আমার বিশ্বাস, মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রের জয় হয় নাই। আমরা যুদ্ধে বিজয়কে জয় বলি, শত্রুনিপাতকে জয় বলি, সিংহাসনলাভকে ও রাজ্যপ্রাপ্তিকে জয় বলি, কিন্তু তাহা জয় নহে। সেরূপ জয়ে ধর্ম্মের জয় হয় না। পাণ্ডুপুত্রেরাও সেরূপ জয় লাভ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু সে জয়ে আমরা মহাভারতের ক্ষুদ্র পাঠকেরা উল্লসিত হইতে পারি, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে উল্লসিত হন নাই। পাণ্ডবেরা সেই জয় লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন মনে করিলে সেই মহাসত্ত্ব পুরুষসিংহগণের গৌরবের হানি হইবে। বস্তুতই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরশূন্যা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া আপনাকে জয়যুক্ত বোধ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে সহস্র আত্মীয়-বান্ধবের চিতাগ্নি তাঁহার মনের মধ্যে যে আগুন জালাইয়াছিল, মৃত্যুর ক্রোড়ে শরশয্যোপরি সুখাসীন বীরোত্তমের শান্তির উপদেশ সেই আগুনের জ্বালা উপশম করিতে পারে নাই। পতিহীনা পুত্রহীনা লক্ষ নারীর করুণ রোদন, যাহা নারীপর্ব্বের প্রতি শ্লোকের মধ্য হইতে অশ্রুর উৎস ঢালিয়া দিয়া ভারতসমাজকে আজি পর্য্যন্ত প্লাবিত রাখিয়াছে, সেই অশ্রুস্রোতে ধর্ম্মরাজের হৃদয় মরুভূমির উপরিস্থিত মৃৎস্তরকে ক্ষালিত করিয়া তাহাকে

উষর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল, অশ্বমেধের মহোৎসব তাহাতে হরিৎ তৃণের অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। যদি ইহাতেও আপনাদের মনে সংশয় থাকে, তাহা হইলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন দর্পের অবতার কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন, পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বান্ধবহীন, অনুচরহীন হইয়া বিকলাঙ্গ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমির একপ্রান্তে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, যখন মাংসাশী শৃগালকুক্কুর মাংসলোভে হর্ষের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছিল, যখন নরমাংসভোজনে পূর্ণোদর গৃধ্রকুল উচ্চবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই দিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অষ্টাদশদিনব্যাপী উন্মত্ত রণকোলাহল মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরবতায় শ্রান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সময়ে, পাণ্ডবশিবিরে করালা মহাকালীর ভীমমূর্ত্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মহানিশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সুপ্তমানবের মরণকোলাহল নিশীথিনীর নীরবতা বিদীর্ণ করিল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে দীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডবসৈনিকগণের ও পাণ্ডববান্ধবগণের ও পাণ্ডবপুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ভীষণ বর্ণনা যাঁহারা মহাভারতমধ্যে পাঠ করিয়াছেন, যে হত্যাকাণ্ডে দ্রোণবিজেতা ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পর্য্যন্ত পদদলিত কৃমির ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও মহাসত্ত্ব কৃপাচার্য্য মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃতের ন্যায় যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া মানবচরিত্রের দুর্বোধ্য রহস্যকে আরও দুজ্ঞের্য় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি বলিতে

চাহেন, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে পাণ্ডুপুত্রেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জয় হইয়াছিল, অধর্ম্মের পরাজয় হইয়াছিল, তাহা হইলে এই দীন প্রবন্ধ-পাঠক এইখানেই বিদায় লইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু আমার বিদায়গ্রহণের প্রয়োজন নাই। মহাভারতের মহাকবি যিনিই হউন, তিনি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শত্রুবিনাশ করিয়া পাণ্ডুপুত্র জয়লাভ করেন নাই। ধনঞ্জয় যখন কপিধ্বজে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার লোমহর্ষ উপস্থিত হইল, তাঁহার গাত্র অবসন্ন হইল, তাহার মুখ পরিশুষ্ক হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইল। তিনি তাঁহার সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ; মহাবাহো, আমি এ জয় চাহি না; যাহার জন্য পুত্রকে হত্যা করিতে হইবে, ভ্রাতাকে হত্যা করিতে হইবে, শ্যালক শ্বশুরকে হত্যা করিতে হইবে, আচার্য্য ও পিতামহকে হত্যা করিতে হইবে, সে সিংহাসন পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় নহে। বস্তুতই তাহাই। সে সিংহাসন, সে জয়, ইতরের প্রার্থনীয়, ক্ষুদ্রের প্রার্থনীয়, তাহা পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। পাণ্ডুপুত্র বনবাস আশ্রয় করিতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র জতুগৃহে দগ্ধ হইতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র পরগৃহে বাস করিয়া পরান্নে শরীর পোষণ করিতে পারেন; যিনি ইন্দ্রসখ্য লাভ করিয়াছিলেন, যিনি উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যিনি কিরাতরূপী পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতার অপেক্ষায় চক্ষুর উপরে পত্নীর নগ্নীকরণও সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এরূপ জয় বাঞ্ছা করিতে পারেন না। এ জয় তাঁহার জয় নহে। ইহা পরাজয়। ইহাতে ইতরের জয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইহাতে ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হয় না। •

বস্তুতই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অভিনয়ের সহিত মহাভারতের মহানাটকের যবনিকাপাত হয় নাই। উহার পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি পরিত্যাজ্য নহে। অন্য দেশের অন্য কবির রচিত কাব্য হইলে ঐখানে যবনিকাপাত

সম্ভবপর হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের মহাকবি-রচিত মহাভারতের যবনিকা-পাত ঐখানে সম্ভবপর হয় নাই। সৌপ্তিকপর্ব্ব ও নারীপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব ও আশ্রমবাসিকপর্ব্ব, মৌষলপর্ব্ব ও মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব এই মহাকাব্যের সমাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক। নতুবা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভ্রম জন্মিতে পারিত, শত্রুনিপাতে ও রাজ্যলাভে ধর্ম্মের জয়ঘোষণাই বুঝি মহাভারত-কারের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইতে চাহেন, ধর্ম্মের জয় সেই অর্থে অবশ্যম্ভাবী নহে। মানবজীবনের সমস্যা অত সহজ নহে।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বিয়োগান্ত কাব্যের প্রতি—ইংরেজীতে যাহাকে ট্রাজেডি বলে, তাহার প্রতি—অনুকূল ছিলেন না। কোন আধুনিক কাব্যলেখক সংস্কৃত ভাষায় বিয়োগান্তকাব্যরচনায় সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু মহাভারত এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি। আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাস এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি; তাহাতেই ভারতবর্ষে মহাভারতের উৎপত্তির বুঝি সার্থকতা। অথবা মহাভারতে ঐরূপ প্রাদেশিকত্ব অর্পণ করিলে বুঝি উহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়। মানবের মর্ত্ত্যজীবনই বোধ করি এক মহা ট্রাজেডি। মহর্ষি কপিল জীবনকে দুঃখময় বলিয়া জানিয়াছিলেন। মানবজাতির প্রামাণিক ইতিহাসে যে মহাপুরুষের স্থান সকলের উচ্চে, যাঁহাকে পঞ্চাশৎকোটি এশিয়াবাসী অদ্যাপি উপাসনা করিতেছে, যাঁহাকে পঞ্চবিংশতিকোটি ভারতবাসী ভগবদবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ত্রিংশৎকোটি ইউরোপবাসী অজ্ঞাতসারে যাঁহার পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে, তিনিও মানবজীবনের দুঃখাত্মকতা আর্য্য-সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই দেশে ও এই দেশের মহাকাব্যে শত্রুসংহারে ও সিংহাসনলাভে ধর্ম্মের জয় দেখিতে গেলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়। কোথায় কাহারও সংশয় থাকিতে পারে বলিয়া মহাভারতের মধ্যে মৌষলপর্ব্বটি যেন নিতান্তই জোর করিয়া গাঁথিয়া

দেওয়া হইয়াছে। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়; অথচ আমরা মুষলপর্ব্বে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ যাঁহাদের নায়ক, সেই দুর্দ্ধর্ষ যদুবংশ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল; কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন, তাহার প্রতিবিধান তিনি করিতে পারিলেন না বা করিলেন না; তৎপরে সেই পুরুষোত্তম, কুরুক্ষেত্রের মহাহবে যিনি অস্ত্রধারণে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার গৃহস্থিত নারীগণকে দস্যুতে ভোগার্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, আর সংশপ্তকবিজেতা মহারথ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব তুলিতে সমর্থ হইলেন না। ইহাকে জয় বলে না; ইহার নাম পরাজয়। কুরুক্ষেত্রের সমরে যদি বা জয় হইয়া থাকে, ভগ্নহৃদয়, দীনচিত্ত, মহাপ্রস্থানোদ্যত পাণ্ডবগণ জীবনসমরে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ইহ জীবনে ধর্ম্মের জয় হয় নাই। মহাভারতই প্রতিপন্ন করিয়াছে, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্য ইহজীবনে প্রযোজ্য নহে।

বাস্তবিকই জীবনসমস্যার অত সহজে মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মের বিচার এত সহজ নহে। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সেই গুহা এত অন্ধকার, সেখানে কি যে ধর্ম্ম কি যে অধর্ম্ম, তাহা বিচার দ্বারা, বিতর্ক দ্বারা নিরূপণ করা কঠিন; কিসেই বা জয়, কিসেই বা পরাজয়, তাহা বলা কঠিন। আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে লৌকিক জয়কে জয় বলে, রাজ্যপ্রাপ্তিকে ও সিংহাসনপ্রাপ্তিকে জয় বলে ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মের জয় প্রতিপাদন করিয়া উল্লসিত হয়। কিন্তু যাঁহারা মানবত্বের উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অবস্থিত, তাহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন খেলার সামগ্রী, উহার লাভালাভে জয়পরাজয় নির্ণীত হইবার নহে। কি যে ধর্ম্ম, তাহা চেনাই কঠিন; তাহার লক্ষণনির্ণয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞ এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না জানি না।

যাঁহারা ডারুইনের আবিস্কৃত তত্ত্বে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ তত্ত্ব কিরূপে ধর্ম্মের গুহাস্থিত মূল অনুসন্ধানে কতটা পথ দেখায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে যাহাতে লোক ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। লোকশব্দ মনুষ্যসমাজকে বুঝায়। মনুষ্য সমাজবদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্মের অস্তিত্ব। ভূমণ্ডলে মানুষ একজনমাত্র থাকিলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিত কি না সংশয়ের স্থল। ডারুইনের মতে মানুষের অতিপূর্ব্বপিতামহ এককালে সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল। তখন মানুষের, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানুষের সেই পশুধর্ম্মা পূর্ব্বপুরুষের কোন ধর্ম্ম ছিল না; কেন না পশুর কোন ধর্ম্ম নাই। বাঘ নিরীহ মেষশাবককে অকুণ্ঠিতভাবে উদরসাৎ করে; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম হয় না। জম্বুক প্রতারণায় চিরনিপুণ; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম হয় না। পশুর মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই, কাজেই উহারা কোন কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। পশুকে অধর্ম্মের জন্য দায়ী করিতে গেলে, চৌষট্টি নরকেও স্থান কুলাইত না। যে পশু সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র, কেবল নিজের স্বার্থটুকুই বুঝে, তাহার ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই; যে পশু বা যে ইতর জীব দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া বাস করে, তাহাদেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। পিপীলিকা ও মৌমাছি সমাজমধ্যে বাস করে। তাহাদের সমাজের শৃঙ্খলা, শ্রেণীবিভাগ, কর্ম্মবিভাগ দেখিলে চমকিত হইতে হয়। তাহাদের প্রত্যেকের নিরূপিত কাজ আছে। কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি হইলে কোন ব্যক্তি সমাজপতির নিকট দণ্ড লাভ করে কি না জানি না—করা অসম্ভব নয়—তবে প্রকৃতির কাছে দণ্ডিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন নীতিশাস্ত্রকার বা ধর্ম্মশাস্ত্রকার পিঁপীড়াকে বা মৌমাছিকে কর্ত্তব্যা-নাচরণে প্রত্যবায়ভাগী করিতে সাহসী হইবেন না। পিপীড়াকে নানা দণ্ড ভোগ করিতে হয়, কেবল যমদণ্ড ভোগ করিতে হয় না। কেন না পিঁপীড়ার ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা স্বীকারে কেহ সাহসী হইবেন না। সে যাহা কিছু করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বা ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া করে না, সে

নৈসর্গিক সহজসংস্কারবশে, যাহাকে ইংরেজিতে instinct বলে, তাহার বশেই করিয়া থাকে। এই সহজ সংস্কারের হাতে সে কলের পুতুল; ঘটিকাযন্ত্রের মত যথানিয়মে চলিতে সে বাধ্য। মনুষ্য যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখন সেও ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী ছিল না। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিলেও যদি তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য সে দায়ী ছিল না। অভিব্যক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া যখন সমাজবদ্ধ মনুষ্য ক্রমশঃ উচ্চতর পদবীতে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, ডারুইন-শিষ্য তাহা বলিতে চাহেন না। সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ডারুইন-শিষ্যের অভ্যাস নাই, তাহার উত্তর দিতেও তিনি বাধ্য নহেন। তবে তিনি দেখান যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গমে তাহার লাভ আছে। এবং যাহাতে জীবের লাভ আছে, তাহাই প্রকৃতিক নির্ব্বাচনে কেমনে বলিতে পারি না, ক্রমশঃ উৎপন্ন ও অভিব্যক্ত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশে সামাজিক মনুষ্যের লাভ আছে কি না, এইটুকু দেখাইতে পারিলেই ডারুইন-শিষ্যের কাজ শেষ হইল। লাভ আছে দেখাইতে পারিলেই, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারিবে। মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখন সে সম্পূর্ণরূপে আপন প্রকৃতির অধীন ছিল। ঐ সকল ষোলআনা পাশবিক প্রকৃতির মধ্যে দুইটা প্রধান—ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি। প্রথমটা আত্মরক্ষার অনুকূল, দ্বিতীয়টি বংশরক্ষার অনুকূল। অনুকূল বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ঐ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিও উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়; এবং পশুর মধ্যে ঐ প্রকৃতি দুইটা অত্যন্ত তীব্র, তাহাও বুঝা যায়। তীব্র না হইলে পশুর জীবনরক্ষা ও পশুর বংশরক্ষা ঘটিত না। বোধোদয়ে পড়িয়াছিলাম, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু সেই ঈশ্বরই আবার জীবকেই জীবের একমাত্র আহার

সামগ্রী করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মাটি খাইয়া ও জল খাইয়া ও বায়ু খাইয়া কোন জীবের বাঁচিবার উপায় তিনি করেন নাই। এক জীবকে মারিয়া ভক্ষণ না করিলে অন্য জীবের বাঁচিবার উপায় থাকে না। এই স্থলে আহারদাতৃত্ব ও রক্ষাকর্ত্তৃত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে ঘটিবে, তাহার মীমাংসার ভার শ্রোতৃবর্গের উপর নিক্ষেপ করিলাম। জীবের আহার জীব, অথচ সেই আহারসামগ্রীও অত্যন্ত পরিমিত। বিধাতা গুটিকতক প্রাণীকে ধরাধামে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ কর। এরূপ ক্ষেত্রে পশুজীবনে ক্ষুৎপ্রবৃত্তির তীব্রতার কারণ বোঝা যায়। যাহার ক্ষুধার তেজ নাই, এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারে সে খাইতে পাইবে কি? এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারের নাম জীবনসংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে লিপ্ত জীবসকল পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সবলের জয় হয়। প্রকৃতির রাজ্যে সবলের জয়ের মূল এখানে। কিন্তু মানবসমাজে অধর্ম্মের মূলও প্রধানতঃ এইখানে; মুষ্টিমেয় খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া বাঁচিতে হয়, কাজেই মানুষ গোড়ায় অধার্ম্মিক। ডারুইন-শিষ্য ইহা স্পষ্টরূপে দেখিয়াছেন। ঠিক কোন্‌খানে, এখন বলিতে পারিতেছি না, মহাভারতের এক স্থানে, অধর্ম্মের মূল অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে ঠিক্ এই কথাই দেখিয়াছি। জলাশয়ের মধ্যে মৎস্যেরা যেমন পরস্পরকে খাইয়া বাঁচে, সমাজমধ্যে মানুষেরা সেইরূপ পরস্পরকে খাইবার চেষ্টা করে। ইহার নাম দেওয়া হয় মাৎস্য ন্যায়। অধর্ম্মের মূল মানুষের এই সনাতন ক্ষুৎপ্রবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটাও বর্ত্তমান। পাঁচটি সন্তান জন্মিয়া যেখানে পিতামাতার সেই মুষ্টিমিত আহারসামগ্রীর নূতন ভাগী হইতে বসিবে, সেখানে বংশবৃদ্ধি আত্মরক্ষার প্রতিকূল। জীব ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া জীবন-সংগ্রামের উৎকটতা বাড়াইবে না। অথচ বংশবৃদ্ধির উপায় না থাকিলে

মর্ত্ত্যধামে জীবের ধারা রক্ষা হয় না। কাজেই কামপ্রবৃত্তি সময়ে সময়ে তীব্রতায় ক্ষুৎপ্রবৃত্তিকেও পরাস্ত করে। নিতান্ত অন্ধের মত নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জীবগণ যৌনসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা বংশরক্ষা ঘটে না। সেই হেতু এই উভয় প্রবৃত্তি পশুতে অতীব তীব্র। মনুষ্যও গোড়ায় পশু; কাজেই মনুষ্যেও ঐ দুই প্রবৃত্তি তীব্রমাত্রায় বর্ত্তমান। ঐ দুই পাশবিক প্রবৃত্তির তীব্রতা না থাকিলে মানুষ টিকিত না। অথচ এই দুই প্রবৃত্তি মানুষের সকল অধর্ম্মের মূল। মানুষকে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে হয়; নচেৎ মানুষ এত দুর্ব্বল, সে একাকী ইতর পশুর সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের দাঁতে পান চিবান চলে, হাড় চিবান চলে না; ইতর পশুর সঙ্গে লড়াই করিতে সে দাঁত কোন কাজে লাগে না। দাঁত নাই, নখ নাই বলিয়া মানুষের পক্ষে দল বাঁধিয়া থাকিলে সুবিধ হয়। কাজেই মানুষের সামাজিকতা। কিন্তু দল বাঁধিতে হইলে আবার বশুতা স্বীকার করিতে হয়, প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিতে হয়; পুরা স্বাতন্ত্র্যে দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এক দিকে গোড়ায় প্রবৃত্তি অতীব তীব্র; অন্য দিকে প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। একটা জৈবধর্ম্ম, অন্যটা সামাজিক ধর্ম্ম। অথচ উভয়ের মধ্যে সনাতন বিরোধ। সকল মানুষ যদি অকস্মাৎ ব্রহ্মচারী ও বাতাহারী হইয়া বসে, তাহা হইলে সত্বর মনুষ্যজাতি অস্তিত্বহীন হইবে। আবার প্রবৃত্তিকে নিরঙ্কুশ করিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে; মানবজাতি বন্য পশুর দংষ্ট্রাঘাতে ও নখরপ্রহারে লোপ পাইবে। সামাজিক মনুষ্যকে কাজেই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হয়। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল। প্রবৃত্তির সংযমে ধর্ম্ম, উহা সমাজরক্ষার অনুকূল; উহাই সমাজকে ধরিয়া রাখে; প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ চালনায় অধর্ম্ম; উহা সমাজের বন্ধন শিথিল করে। কখন্ কোন্ পথে চলিতে হইবে, মানুষকে তাহা বিচার করিয়া চলিতে হয়। আপন ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে হয়। পিঁপীড়ার মত ও মৌমাছির মত সে

প্রকৃতির নিকট হইতে এ বিষয়ে সহজ সংস্কার লাভ করে নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী সে বিষয়ে কৃপা করিলে ধর্ম্মবিচার দুরূহ হইত না, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহানিহিত হইত না। সহজসংস্কার যে পথ দেখাইয়া দিত, মানুষকে সেই পথে চলিলেই হইত। তাহাকে ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী হইতে হইত না। কেন জানি না, প্রকৃতি দেবি মানুষের প্রতি সে কৃপা করেন নাই। অধিকন্তু মনুষ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্গত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত ফাঁফরে ফেলিয়াছেন। সংসারের মধ্যে জীবনসমরে কোন্ পথে চলিতে হইবে, সে তাহা সর্ব্বত্র ঠিক করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, আপনার দিকে চাহিও না; স্বার্থের দিকে চাহিও না; যাহাতে লোকহিত হয়, সেই দিকেই চল; লোকহিতেই ধর্ম্ম,—ইহার নাম হিতবাদ। লোকহিত আবার কি, বলিলে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়, যাহাতে—greatest good of the greatest number—সমাজের মধ্যে যাহাতে অধিকাংশের অধিক পরিমাণ হিত হয়। কিন্তু সে হিসাবটা বড় শক্ত হিসাব। কোনও শুভঙ্কর তাহার জন্য আর্য্যা বাঁধিয়া দেন নাই। আবার সমাজের সঙ্গে সমাজের বিরোধ আছে। যাহা আমার সমাজের অনুকূল, তাহা অন্য সমাজের প্রতিকূল। এবারে কেহ বলিয়া উঠিবেন, যাহা মানবজাতির পক্ষে মোটের উপর অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম, আত্মসমাজের প্রতিকূল হইলেও যাহা সমগ্র মনুষ্যসমাজের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। ইহা Religion of Humanity—মানবহিতরূপ মহাধর্ম্ম। কিন্তু এ আরও কঠিন সমস্যা; এখানে patriotism বা স্বদেশহিতৈষায় আঘাত লাগে। মানব-সমাজের অনুরোধে নিজের সমাজের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজের সমাজ বাদী হয়, ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে যায়। ও পক্ষ বলিবেন, ভয় কি, মানবহিতের অনুরোধে এখন ফাঁসি কাঠে চড়, আখিলে বুঝা যাইবে। আবার মানবের হিত কিরূপে হইবে, বলা কঠিন। দৃষ্টান্ত চোখের উপর। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যজাতির এই মানবের প্রতি

প্রেম এত অধিক যে, তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যত অসভ্য জাতিকে, যত দুর্ব্বল জাতিকে, নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছেন। কেন না, তাহাতে মানবজাতির মোটের উপর লাভ—in the long run অর্থাৎ লম্বা দৌড়ে লাভ।

কাজেই কি যে ধর্ম্ম, তাহার নিরূপণই দুরূহ; মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহার দ্বিধাস্থলে নিরূপণের জন্য কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মের তত্ত্ব পূর্ব্বের মত গুহাতেই নিহিত আছে। যে মনীষী দার্শনিকের মৃত্যুতে পাশ্চাত্য পৃথিবীতে সম্প্রতি এক সমুজ্জ্বল দীপের নির্ব্বাণ হইয়াছে, যে দীপের আলোকে কেবল পাশ্চাত্য সমাজে নহে, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানিসমাজ আলোক পাইতেছিল, যাঁহার মৃত্যুর জন্য সভাস্থলে এই অবকাশে শোকপ্রকাশ আমি কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি, সেই মনীষী হর্ব্বার্ট স্পেন্সর relative ethics ও absolute ethics—সাপেক্ষ ধর্ম্ম ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম—এই দুই সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে বিচারের প্রয়োজনীতা বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকল সমাজে মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি সমান জাগ্রত নহে। ফিজিদ্বীপের অধিবাসীরা বুড়াবাপকে রাঁধিয়া খাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইত; মিশরের টলেমিগণ ভগিনীবিবাহে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদের নিকট উহা লোমহর্ষকর। কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান সেই সেই সমাজে তদানীন্তন ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধ ছিল না। ঐ সকলের অনুষ্ঠানকারীদের জন্য নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে গেলে ন্যায্যবিচার হইবে না। যাহা এক সমাজে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সমাজে অধর্ম্ম। যাহা এক ক্ষেত্রে ধর্ম্ম, তাহা অন্য ক্ষেত্রে অধর্ম্ম। যাহা এক সময়ে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সময়ে অধর্ম্ম। মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুগধর্ম্ম সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিব? এই ধর্ম্মের তত্ত্ব কে আবিষ্কার করিবে? ধর্ম্মের তত্ত্ব অদ্যাপি গুহায় নিহিত রহিয়াছে।

অর্জ্জুন যখন জ্ঞাতিহত্যা দ্বারা রাজ্যলাভকে অধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ও সেই জয়কে পরাজয় মনে করিয়া ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। ক্ষমা পরম ধর্ম্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু সময়ক্রমে ক্ষমাও অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; ধর্ম্মনিরূপণ অতি কঠিন ব্যাপার—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। খ্রীষ্টানদিগের প্রতি উপদেশ আছে, এক গালে চড় মারিলে, অন্য গাল পাতিয়া দিবে। খ্রীষ্টানেরা সে উক্তি কত দূর পালন করেন জানি না—কিন্তু পাণ্ডবেরা যেমন পরপ্রযুক্ত চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, সকলে তাহা পারে না। ক্ষমাধর্ম্ম অবলম্বনে যুধিষ্ঠির কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের জীবনে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ক্ষমা আর ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। সহিষ্ণুতার যে সীমা থাকা উচিত, অন্য লোকের বিবেচনায় বহুপূর্ব্বেই সে সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল; এখন শত্রুকে ক্ষমা করিলে উহা ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হইত। উহার নাম হইত ক্লৈব্য। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই ক্লৈব্য পরিহার করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বস্তুতই মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন এক সময় আইসে, তখন ক্ষমা ক্লৈব্য হইতে অভিন্ন হয়। ইহার নাম relative ethics; পরের প্রাণরক্ষায় বীরের গৌরব আছে, নিজের প্রাণপরিত্যাগে বীরের গৌরব আছে; কিন্তু অকারণে যখন আততায়ী আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহার হস্তে প্রাণটাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় গৌরব নাই। শত্রু যখন আসিয়া চোখের উপর পত্নীর বা দুহিতার অপমান করে, তখন তাহার শাস্তিবিধানে অধর্ম্ম হয় না; তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলেই অধর্ম্ম হয়। পরে আসিয়া যখন অকারণে স্বদেশ আক্রমণ করে, তখন স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধে সঙ্কুচিত হইলে ক্লৈব্য হয়। পাণ্ডবদিগের জীবনে সেই সময় আসিয়াছিল, যখন আর ক্ষমাপ্রদর্শন ক্লৈব্য হইত। তাঁহারা পত্নীর নগ্নীকরণ পর্য্যন্ত সহিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও যদি সেই অপমানকর্ত্তার দণ্ডবিধানে

দ্বিধাবোধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্লৈব্য হইত। এখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ভ্রাতার সহিত, পুত্রের সহিত, শ্বশুরশ্যালকের সহিত, আচার্য্যের সহিত ও পিতামহের সহিত, যুদ্ধ তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন; রাজ্যপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না; সিংহাসনপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্ম্মরক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধের ফল কাহারও অধীন ছিল না, সম্ভবতঃ কৃষ্ণেরও অধীন ছিল না। কৃষ্ণ বালক ভাগিনেয় অভিমন্যুর হত্যানিবারণেও সমর্থ হন নাই, বা নিবারণ করেন নাই। পাণ্ডবগণের হস্তে জয়লক্ষ্মীর সমর্পণও তাঁহার হয় ত অসাধ্য ছিল। জয় হউক আর পরাজয়ই হউক, যুদ্ধ এখন কর্ত্তব্য হইয়াছিল। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধে কৌরব-কুলের ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু যদি পাণ্ডবকুলেরই ধ্বংস হইত, তাহাতেও কৃষ্ণের পক্ষে ফল সমান হইত। জয় পরাজয় তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না। বস্তুতই পাণ্ডবকুলের জয় হয় নাই। ভ্রাতার ও পুত্রের রুধিরপ্রদিগ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিয়াছিলেন, মনে করিতে গেলে যুধিষ্ঠিরের অবমাননা হয়। বস্তুতই তাঁহাদের জয় হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। মনুষ্যের সুস্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি অনেক সময়ে এই ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দেয়। মানবের অভ্যন্তরে সেই পথ দেখাইবার জন্য এক জন বসিয়া আছেন, তিনিই সেই পথ দেখান; ইউটিলিটির বিচারে ক্ষতিলাভগণনায় ও শুভঙ্করী আর্য্যায় এই ধর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অধিক লোকের অধিক হিত ঘটিয়াছিল কি না, কে তাহার হিসাব করিবে? আঠার অক্ষৌহিণী মনুষ্যের পত্নী যেখানে অকালে বিধবা হইয়াছিল, পুত্র কন্যা যেখানে অনাথ হইয়াছিল, সেখানে এই ক্ষতিলাভগণনার হিসাব

করিয়া ধর্ম্মনিরূপণ করিতে কে সাহস করিবে? কাহারও যদি সেরূপ হিসাবে সাহস থাকে, তিনিই হিসাব করুন, আমরা সে দুঃসাহস করিব না। গাণ্ডীবধন্বা কপিধ্বজ হইতে নামিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে আপাততঃ বসুন্ধরা রক্তক্লিন্ন হইত না। ইতরের বিবেচনায় হয় ত তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অর্জ্জুনও ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়া উহাই ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। যুদ্ধ ক্রূরকর্ম্ম, অতএব অধর্ম্ম, কিন্তু সময়ক্রমে উহাও ধর্ম্ম হয়। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষমাত্র করিয়া পরবর্ত্তী মানবজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার—ফলে তোমার অধিকার নাই। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতি হয় ত সত্য—কিন্তু সত্য হউক আর নাই হউক, ইহলোকে উহা প্রযোজ্য হউক আর নাই হউক, তুমি ধর্ম্মসাধনে বাধ্য, জয়ে তোমার অধিকার নাই। তুমি যাহাকে জয় বিবেচনা কর, তাহা জয় না হইতে পারে; তুমি যাহাকে পরাজয় মনে করিতেছ, দুর্জ্ঞেয় জাগতিক বিধানে তাহাই হয়ত জয়। কিন্তু জয়পরাজয়বিচারে তোমার ক্ষমতা নাই; ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া তুমি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও না।

আচার্য্য হক্‌সলী এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, যে বিধানক্রমে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে, উহা moralও নহে, immoralও নহে, উহা unmoral. জীবেরা পরস্পরকে হত্যা করিয়া ও ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ও তাহার ফলে জীবনসংগ্রামে অযোগ্য জীবের ধ্বংস ঘটিতেছে; ইহা জাগতিক বিধান—ইহা immoral নহে অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে, ইহা unmoral অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবহির্ভূত। ভূমিকম্পের ও ঘূর্ণীবায়ুর উৎপাতে পাপ নাই; সেইরূপ বাঘেরও মেষভক্ষণে পাপ নাই। মানুষ যখন ধর্ম্মবুদ্ধি সত্ত্বেও জ্ঞানপূর্ব্বক অপকর্ম্ম করে, তখনই ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা

আসে। তখনই সেই অপকর্ম্মটা immoral অর্থাৎ অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিতান্ত অসভ্য বন্য দশায় পশুর মত পরস্পর মারামারি করিয়া আত্মরক্ষা করিত, তখনও তাহাদের কাজ unmoral অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্পর্ক শূন্য ছিল; কিন্তু উন্নত অবস্থায়, কাজটা অনুচিত হইতেছে বুঝিয়াও, স্বার্থরক্ষার জন্য বা প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন সে সেই অপকর্ম্ম করে, তখনই তাহা immoral বা অধর্ম্ম হয়। উচ্চতম মনুষ্যসমাজেও এখনও সেই জীবনসংগ্রাম থামে নাই; তবে মনুষ্য যাহা unmoral ছিল, তাহাকে immoral বলিয়া ক্রমশঃ গ্রহণ করিতেছে; যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের বাহিরে ছিল, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; ইহারই নাম তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তি।

হক্‌স্‌লী বিশ্লেষণ দ্বারা জগৎপ্রণালীকে এইরূপে দুইটা প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়াছেন। জগতে যে বিধান, তাহার নাম দিয়াছেন cosmic process; উহা unmoral, উহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক নাই; উন্নত মানবসমাজে যে বিধান, তাহার নাম দিয়াছেন ethical process—উহার সহিতই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশ্লেষণ কার্য্যে মজবুত। বিবেকের অণুবীক্ষণ লাগাইয়া ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে দক্ষ। আমাদের প্রাচ্যদেশে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারেই প্রতিভা নিয়োজিত আছে। পাশ্চাত্ত্যেরা যে ঐক্য দেখেন না, তাহা বলিতে চাহি না; প্রকৃতপক্ষে ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য আবিষ্কার ও অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার, উভয় লইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র। তবে, বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কখনও বা এদিকে, কখনও বা ওদিকে ঝোঁক দিতে হয়। অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারেই প্রাচ্যগণের ঝোঁক। মানবসমাজেই হউক, আর পশুসমাজেই হউক, আর অচেতন জড় জগতেই হউক, একটা নিয়তি, কোন একটা অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া, সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে; প্রাচ্যগণ জগদ্বিধানকে

সেই চোখে দেখেন। যে নিয়তি সৌরজগতে গ্রহউপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘূরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিনরাত্রি হয়, ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়, জলঝড় হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও মাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষে রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়াছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎকর্ম্মে ও অসৎকর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে। আর্য্যঋষি জড়জগতে, জীবজগতে ও মানবসমাজে অনৈক্যের মাঝে সেই ঐক্য দেখিয়াছিলেন। যাহাতে মানবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম দাও, আর যাহাতে সৌরজগৎকে ধরিয়া আছে বা জীবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম না দাও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উভয়ই একটা বৃহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ; সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাহার অধীন; জগতের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ, তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চলিতে পারে না।

এই যে ঋত, যাহা জগতের নিয়ামক, যাহার নাম নিয়তি, যাহা তোমার আমার অধীন নহে, তাহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—তাহা ব্যাবহারিক বিশ্বজগতে সত্যের সহিত অভিন্ন—বিজ্ঞানবিদ্যায় তাহার নামান্তর সত্য। আর্য্যঋষি পুরাকালে দেখিয়াছিলেন,—এই যে ঋত, এই যে সত্য, তাহা অভীদ্ধ তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—কাহার তপস্যা হইতে জন্মিয়াছিল কে বলিবে; কবে জন্মিয়াছিল তাহার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই;—আর্য্য ঋষি দেখিয়াছিলেন, ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽভীদ্ধাদজায়ত—তাহার পর রাত্রি হইয়াছে, দিন হইয়াছে, সূর্য্যচন্দ্র হইয়াছে, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশ্বজগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ঋতের জয় সর্ব্বত্র। তাহার

পরাজয় সম্ভবপর নহে ;—সেই ঋতেই বিশ্ব অবস্থিত, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হিরণ্যগর্ভ হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলই তাহার অধীন। ঋতের জয় সর্ব্বত্র ; সেই ঋত বিশ্বকে ধরিয়া আছে, অতএব তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মশব্দে এই ব্যাপকতর অর্থ আরোপ করিলে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, উহার পরাজয় কল্পনায় আসে না। এই অর্থে ধর্ম্মের জয় সত্য ; ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। সেই ঋত হইতেই এ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃকই এ সকল চালিত হইতেছে, তৎকর্ত্তৃকই এ সকল আবার সংহৃত হইবে। দিন রাত্রি থাকিবে না, চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে না, স্বর্গপৃথিবী থাকিবে না। কোথায় বা জয়, আর কোথায় বা পরাজয় ; উভয়ই ইহার কাছে তুল্যমূল্য ; পুণ্য ইহার দক্ষিণ হস্ত, পাপ ইহার বাম হস্ত। মনুষ্যজাতির সমস্ত ইতিহাস ইহার নিকট এক নিমেষ ; পলকের পূর্ব্বে সেই ইতিহাস ছিল না, পলক ফেলিবার পরে আর তাহা থাকিবে না। ঋষি যাহা দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা কর্ত্তব্যমূঢ় অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়া দেখাইয়াছিলেন—জগন্নিয়ন্তার সেই বিশ্বরূপের আদি অন্ত কোথায় জানা যায় না, মধ্য কোথায় তাহা বলা যায় না—দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরাল ব্যাপিয়া তাহা অবস্থিত ; তাহার অভ্যন্তরে লোকসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া নাশের জন্য প্রবিষ্ট হইতেছে, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রবেশ করিতেছেন, সূতপুত্র-জয়দ্রথ প্রবেশ করিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, পাণ্ডুপুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ সকলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইতেছেন। সেখানে জয়ই বা কাহার, আর পরাজয়ই বা কাহার ?

এই বিশ্বরূপ দেখাইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে দেখিবার প্রয়োজন নাই ; হিসাবের খাতায় অঙ্ক কষিয়া কোন্ কার্য্যের কি ফল হইবে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই ; ফলে তোমার অধিকার নাই, কর্ম্মেই তোমার অধিকার ; অতএব অপ্রমত্ত

হইয়া স্বাভাবিক সুস্থ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায়, শত্রুর বিনাশই যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শত্রুনাশ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হও। ইহলোকে তোমার জয় হইবে কি না, পরলোকে তোমার কোথায় গতি হইবে, তাহার হিসাব করিতে বসিও না—কামনাশূন্য হইয়া তুমি কর্ম্ম কর। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে; হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ অপিহিত রহিয়াছে। ক্ষমা সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; প্রাণত্যাগও সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; আততায়ীর বিনাশেও সকল সময়ে অধর্ম্ম হয় না।

এতক্ষণে দেখা গেল, যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য প্রলোভনের প্রয়োজন হয় ত থাকিতে পারে—লোকস্থিতির জন্য, লোকরক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন আছে, ফাঁসিকাঠের প্রয়োজন আছে; নীতিকথাপূর্ণ এণ্ট্রান্স-কোর্সেরও প্রয়োজন আছে; যথা ধর্ম্ম তথা জয় বা তাদৃশ অন্যান্য নীতি-বাক্যেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটু উচ্চ সোপানে উঠিলে ঐ বাক্যের সার্থকতা লইয়া বিতর্ক উঠিতে পারে। অন্ততঃ আমরা যে সঙ্কীর্ণ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই অর্থে উহার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে সংশয় উঠিতে পারে। বস্তুতঃ জাগতিক বিধানে কিসে জয়, কিসে পরাজয়, তাহাই বলা যখন অসাধ্য, যাহাকে আমরা পরাজয় মনে করি, তাহাই হয় ত যখন জয়, তখন এইরূপে ধর্ম্মের জয় হইল, তাহা প্রতিপন্ন করিব কিরূপে?

এইখানে তার্কিক আসিয়া যদি প্রশ্ন করে, যদি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও আমার জয়ের আশা থাকিল না, তবে কেন আমি সুগম অধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মের গহন পথে যাইব, তাহা হইলে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন হয়। নিরস্ত করিবার লৌকিক উপায় আছে বটে;—তুমি ঐ পথে চলিলে, তোমার কাণ মলিয়া দিব, তোমাকে ফাঁসিকাঠে

ঝুলাইব, তোমাকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব। ওপক্ষ তাহার উত্তর দিবে—তোমার পায়ে জোর আছে, যতক্ষণ তুমি সেই জোর আমার উপর প্রয়োগ করিতে পারিবে, ততক্ষণ আমাকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু যদি তোমাকে ও তোমার ডালকুত্তাকে ফাঁকি দিতে পারি, তাহা হইলে কি করিবে?

ধর্ম্মপ্রচারক এখানে আসিয়া বলেন, তুমি লোকহিতে প্রস্তুত হও, নিজের দিকে তাকাইও না—কেন না লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু লোকহিতে আমার কি লাভ? লোকে যতক্ষণ জোর করিয়া আমাকে এপথে রাখিবে, ততক্ষণ থাকিতে পারি, কিন্তু অন্য সময়ে কেন থাকিব? কেহ আসিয়া বলিবেন, যাহাতে অধিক লোকের অধিক হিত ঘটে, সেই পথে চল; কেহ বলিবেন, তুমি মানবজাতির জন্য স্বার্থ উৎসর্গ কর। কিন্তু কি আকর্ষণে আমি তাহা করিব? এইখানে পণ্ডিতেরা একটা শেষ উত্তর দিবেন—ধর্ম্মেই সুখ এবং সুখই লাভ; অতএব ধর্ম্মপথে চল। অধর্ম্মে যে সুখ হয়, সে সুখই নহে, ধর্ম্মের সুখের নিকট তাহা দাঁড়াইতে পারে না—সেই সুখই তোমার লভ্য—সেই লাভের কামনায় তুমি ধর্ম্ম পথে চল। কিন্তু এ সেই পুরাণ কথা—সুখের নামান্তর জয়; ধর্ম্মে সুখ, তাহার অর্থ যথা ধর্ম্ম তথা জয়। ইতর লোকে যাহাকে সুখ মনে করে, সে সুখ সুখই নহে; ইতর লোকে যাহাকে জয় মনে করে, সে জয় জয়ই নহে। কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্বও যেমন, সুখের তত্ত্বও তেমনি গুহায় নিহিত; ঐ সুখের মরীচিকার উদ্দেশে চলিতে গেলে পথভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা। মিছা প্রলোভনে লোককে ভ্রান্ত করা উচিত নহে।

বস্তুতই ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট সমস্যা। ধর্ম্মের sanction কি, ধর্ম্মের প্রমাণ কি, ধর্ম্মের চরম ও পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, ইহা নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বদেশের তত্ত্বান্বেষিগণ ব্যাকুল। কেহ বলেন, ইহা বিধাতার আদেশ—অতএব ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লও—

তর্ক করিয়া ফল নাই। এই আদেশের মূল খুজিবার জন্য কেহ অলৌকিকের ও অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় লন। কেহবা প্রাকৃত জগতের বিধানকেই বিধাতার আদেশের সহিত সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের শাস্ত্রে এই মূল অনুসন্ধান করিয়া একটি কথা বলা হইয়াছে, অন্য শাস্ত্রে সে কথা আছে কি না জানি না। পরের হিত করিব কেন, ভূতের হিত করিব কেন? ইহার উত্তর—সেই ভূতই তুমি—সর্ব্বভূত তোমা হইতে অভিন্ন। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি—নিরীক্ষণ করিবে। 'তুমি সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া আছ ও সর্ব্বভূত তোমাতেই অবস্থিত আছে; কাজেই ভূতের উপকার, লোকহিত, তোমারই হিত। পরকে পীড়া দিলে তুমি নিজেকেই পীড়া দিবে; পরের পায়ে কাঁটা বিঁধিলে তোমার নিজের গায়ে বিঁধিবে। পরকে আনন্দ দিলে তোমার নিজেরই আনন্দ হইবে। যখন তুমি জানিবে তোমাকে ছাড়িয়া আর পর নাই; যেখানে যা কিছু আছে, সে তুমি স্বয়ং; যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ, তাহা দ্রষ্টা তোমা হইতে অভিন্ন; যাহা তোমার বিষয়, তাহা বিষয়ী তোমা হইতে অভিন্ন; তখন আর তুমি এই প্রশ্ন করিবে না, যে কেন আমি স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ করিব।

বস্তুতই যে তাহা জানিয়াছে, সে আর সে প্রশ্ন তুলিবে না। যাহারা এখনও জানে নাই, তাহাদিগকে সে উত্তর দেওয়া মিছা। তাহাদিগের জন্য ফাঁসিকাঠ ও ডালকুত্তার ব্যবস্থা করিয়া, স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের বিভীষিকা ব্যবস্থা করিয়া, সমাজের নায়কগণ লোকরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

আমার পরমসহিষ্ণু ক্ষমাধর্ম্মের অবতার শ্রোতৃবর্গের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে আর আমার সাহস হইতেছে না, কি জানি তাঁহারা যদি অকস্মাৎ ক্লৈব্য পরিহার করিয়া আমার উপর আপতিত হন, তাহা হইলে আমার পক্ষে ধর্ম্মবিচার অসম্ভব হইবে। একবার ইচ্ছা ছিল, আমাদের ভারতবর্ষের

অন্যতর মহাকাব্য রামায়ণে এই ধর্ম্মতত্ত্ব কিরূপে বুঝান হইয়াছে, তাহার আলোচনা করি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস এই মহাকাব্যও ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইবার জন্য আদিকবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। অধর্ম্মমূর্ত্তি রাবণের সবংশে নিধন ও রামচন্দ্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত; কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে এই ভ্রমটা যেন ঘুচাইবার জন্যই মহাকবি তাঁহার কাব্যের শেষভাগে—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুনশ্চ ক্ষমা করিবেন—মহাকবি তাঁহার মহাকাব্যের শেষভাগে উত্তর-কাণ্ডটি জুড়িয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতা-দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া কাজটা ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় আমার সাহস নাই। আমাদের মত ইংরেজিনবিশদের এ বিষয়ের সমালোচনায় কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি আমি দেখিয়াছি; কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তি নাই। সেই বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুমের অপেক্ষাও কোমল লোকোত্তর চরিত্র চিত্রপটে আঁকিবার চেষ্টা করিলে আমার বেপথু হয়, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়। সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের সম্মুখীন হইলে আমার ক্ষুদ্রতা তাহার জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী যাহাতে সংশয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দেয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। তিনি পত্নীত্যাগ করেন নাই; তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার অর্দ্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া আপনাকে হীন, আপনাকে ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূর্ণ করিয়া সেই অসম্পূর্ণ আত্মটুকু ধর্ম্মের পরিচর্য্যার জন্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইহা লোকোত্তর কর্ম্ম—ইহা ধর্ম্ম—ইহার তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; সেই গুহার অন্ধকার ভিন্ন করা তোমার আমার মত

মূষিকের ও ছুচ্ছুন্দরের কার্য্য নহে। তোমার আমার সৌভাগ্য যে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোকোত্তর ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি। ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে প্রেরিত করিয়া এই ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল—তিনি সুখের আশা করেন নাই, তিনি জয়ের আশা করেন নাই। সীতার সহিত তিনি যখন বনে ছিলেন, তখন তিনি জয়ী ছিলেন; রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া তিনি জয়ী হয়েন নাই। জয়ের আশা তিনি করেন নাই; শুনিয়াছি তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি আপনার মাহাত্ম্য আপনি জানিতেন না, বৈকুণ্ঠ তাঁহার আপন ধাম হইলেও তিনি বৈকুণ্ঠের দিকে চাহেন নাই। যমের ভয় তাঁহার ছিল না; যমভয় নিবারণের জন্য তিনি ধরায় আসিয়াছিলেন। নিজের হাতে তাঁহার হৃদয়কুণ্ডে তিনি যে তীব্র আগুন জ্বালিয়াছিলেন, যমালয়ের অগ্নিকুণ্ডে তাহার তীব্র যাতনার তুলনা হয় না। যাবচ্চরন্তি ভূতানি যাবদ্‌গঙ্গা মহীতলে, মানবধর্ম্মের সেই মহাদর্শ মানবজাতির নিকট অব্যাহত রহুক্।

মানবজাতির ভাবনা ভাবিয়া, এখন আমাদের কাজ নাই—আমরা ভারতবাসী যেন চিরকাল ধরিয়া সেই আদর্শের নিকট প্রণত থাকি। ভারতের মহাকবি যে করুণগীতি গাহিয়া গিয়াছেন, উহা বিজয়গীতি নহে, উহা পরাজয়-সঙ্গীত; উহা সুখের গীত নহে, উহা দুঃখের গীত। উহা মানবজীবনের দুঃখগীতি—মহাজ্ঞানী কপিলঋষি মানবজীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ তথাগত বোধিদ্রুমতলে মানব-জীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন—উহা মানবের সেই চিরন্তন দুঃখের গীতি। উহা বিশেষতঃ ভারতসন্তানের দুঃখগীতি। প্রাণিসমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবন-সংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়। যাঁহারা আমাদের এই পরাজয়ে নিয়তির মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা সুখী। তাঁহাদের সেই সুখে আমার অধিকার নাই। আমি এই

পরাজয়মাত্রই দেখিতে পাই; ভবিতব্য আমার নিকট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; ভারতবাসীর জাতীয় জীবন কিরূপে সমাপ্ত হইবে, তাহা আমি জানি না। ভারতের আদিকবি যেন দিব্যচক্ষে আমাদের এই ভবিতব্য পরাজয় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং আমাদের সান্ত্বনার জন্য পরাজয়সঙ্গীত ও দুঃখের সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন। আমরা জয়ের আশা করিব না—ভারতবাসীর ভবিতব্য কি—সেই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া আমাদের কাজ নাই। আমাদের আদিকবির সেই দুঃখগীতি আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে—জয়পরাজয় লক্ষ্য না করিয়া আমরা ধর্ম্মের পথে চলিব। ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হউক। সত্য আমাদের লক্ষ্য হউক। জয় পরাজয় নিয়তির বিধান। নিয়তির জয় হউক।

যজ্ঞ

আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্র বেদনামক শব্দরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাঁহারা এই শব্দরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া থাকেন। যাঁহারা মানেন না,—কার্য্যতঃ মানেন না,—তাঁহারা বড়লোক ও ভাললোক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

অথচ ইহা না মানিবারও সম্যক্ কারণ দেখি না। এই ব্যাবহারিক জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে; ইহা না মানিলে কোন বিজ্ঞানেরই ভিত্তি থাকে না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে বস্তুমাত্রই বিকারী ও পরিণামশীল; এবং এই বিকার ও পরিণামই আমরা অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। এই অনিত্য বিকারের অন্তরালে ইহার আশ্রয়রূপে যে নিত্য বস্তু আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে; উহা হয়ত একটা কাল্পনিক বস্তু। কিন্তু এই ব্যাবহারিক জগৎ সমস্তটাই যখন কল্পিত বস্তু, তখন এই যুক্তিতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্যাবহারিক হিসাবে অস্তিত্বযুক্ত যাবতীয় বস্তুকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে নিত্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ"—সত্য দ্বারাই ভূমি ধৃত হইয়া আছে; "ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি"—ঋত দ্বারাই আদিত্যগণ স্থির আছেন; ইহা না মানিলে বিজ্ঞানশাস্ত্র টিকে না। এই 'ঋত', এই 'সত্য' অভীদ্ধ তপস্যা হইতে জাত, এবং তাহা হইতেই আর সমস্ত জন্মিতেছে, এটুকু মানিয়া লইয়াই আমরা সংসার-ক্ষেত্রে চরিতেছি।

বেদকে শব্দসমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু এই শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়লব্ধ এবং বায়ুরাশিতে প্রতিঘাত-জাত শব্দ মনে না করিলেও চলিতে পারে। প্রাচীন কালের মীমাংসক ও শাব্দিক আচার্য্যগণ ইহা লইয়া বহু বিতণ্ডা করিয়াছেন। সেই বিতণ্ডার ফলে এইটুকু বুঝা যায়, যে প্রাচীন আচার্য্যেরা যে শব্দকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিতেন, তাহা সাধারণের পক্ষে কোনরূপ অতীন্দ্রিয় বস্তু;—তাহা নিত্যবস্তুরূপে জগৎ জুড়িয়া বিদ্যমান আছে;—তাহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব তাহা অনাদি; তাহা কোন পুরুষের "কৃত" নহে, অতএব অপৌরুষেয়। এমন কি এই শব্দ হইতেই ব্যাবহারিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ কথাও যখন দেখা যায়, তখন সেই শব্দকেই ঋত বা সত্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও কোন কোন মহাপুরুষ সাধনাবলে কোন না কোনরূপে তাহার কোন না কোন দিকের, কোন না কোন অংশের, সন্ধান পান—তাহা যেন তাঁহাদের 'দৃষ্ট'-পথে আইসে। যাঁহারা ইহা দেখিতে পান, তাঁহাদের নাম 'ঋষি'।

বস্তুতঃ এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশে সকল কালে হইয়া থাকে; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাঁহারা তাহা দেখেন, এবং জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দদ্বারা প্রকাশ করেন। তাঁহারাই ঋষি। নিউটন, ডারুইন এবং মাক্‌সওয়েলকে যদি কেহ আধুনিক যুগের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ দেখিব না। তাঁহারাও সেই ঋতের—যে ঋত বিশ্ব জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই ঋতের—এক দেশ না এক দেশ দেখিয়াছেন। তাঁহারা যাহা দেখেন ও প্রচার করেন, তাহা ব্যাবহারিক জগতের নিত্য সত্য—তাহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে;—ছিল এত দিন প্রচ্ছন্নভাবে; তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া দেন।

বেদপন্থীরা বলেন, বেদনামক অতীন্দ্রিয় শব্দরাশিও সময়ে সময়ে ঋষি-গণের বিজ্ঞানদৃষ্টির গোচর হইয়াছে; তাঁহারা সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রচলিত মানবী ভাষায় প্রকাশ করিয়া মানবের হিতার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণঘটিত মন্ত্রে অথবা ডারুইন যেমন অভিব্যক্তিঘটিত মন্ত্রে ব্যাবহারিক নিত্য সত্যের এক একটা দেশ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বেদপন্থী সমাজের প্রাচীন ঋষিরাও সেইরূপ ব্যাবহারিক জগতের কোন না কোন দেশের আবরণ খুলিয়া দিয়াছেন। এমন কি, যে আবরণে গূঢ়তর পরমার্থতত্ত্ব আবৃত হইয়া ব্যাবহারিক জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, সেই আবরণও উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

আর একটু নীচে নামিয়া দেখা যায়,—বেদ ও বিদ্যা এই দুই শব্দ সমানার্থক। প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে ঋষিগণের আবিষ্কৃত সমুদয় বিদ্যার সমষ্টিকে বেদ বলিত। এ কালের বেদপন্থী সমাজেও যে কিছু বিদ্যা বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও পরিণতি মাত্র। ভাগীরথীর সহস্র শাখার উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সেই গোমুখীতেই উপস্থিত হইতে হইবে। স্থূলতঃ, এই বিদ্যাকে জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে ভাগ করা হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্তে সম্ভবতঃ সেই তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রচার দেখা যায়; উক্ত সংহিতার অন্তর্গত অম্ভৃণকন্যা বাগ্‌দেবীদৃষ্ট দেবীসূক্তে সেই তত্ত্বের প্রায় পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। বেদের সমুদয় জ্ঞানকাণ্ডে এই তত্ত্বই আরও ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, আর নূতন কথা বড় একটা বলা হয় নাই। তার পর কত যুগ অতীত হইয়া গেল; আর কেহ আর কোন নূতন কথা প্রচার করিতে পারেন নাই; পারিবেন এরূপ আশাও নাই। উহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা— উহাতে যে সত্যের উল্লেখ আছে, তাহা অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্য। ঋষিগণের আবিষ্কৃত এই সত্য মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি।

শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঈশাবাস্তমিত্যাদি ঋকৃসমূহাত্মক উপনিষদে মানব-সাধারণের ধর্ম্মসম্পর্কে মূল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে;—মানবের কর্ম্মকাণ্ডের ইহাই প্রথম কথা ও শেষ কথা। তৎপরে যিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মূল কথাকেই পল্লবিত করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জগতের প্রতি মানবের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যে অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্যের এতদ্দ্বারা প্রচার হইয়াছে, তাহাও মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি।

কিন্তু বেদপন্থীর বেদমধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা মানবের সাধারণ সম্পত্তি নহে। মানবসমাজের যে সঙ্কীর্ণ অংশ বেদপন্থী, সেই সঙ্কীর্ণ অংশেই তাহার প্রয়োজ্যতা। এই অংশকেই সাধারণতঃ বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড বলিয়া থাকে। এই কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তিভূমিও উক্ত উপ-নিষদেই নিহিত আছে।

বেদপন্থী সমাজের মূল কোথায় ও এই সমাজের বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা জানিতে হইলে ঋষিপ্রচারিত বেদের এই কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। বেদপন্থী সমাজের যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, যদ্দ্বারা ঐ সমাজকে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া চিনিয়া লইতে পারা যায়, সেই ধর্ম্মের পরিচয় বেদের এই কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও জানিবার উপায় নাই।

এই বিশিষ্ট সামাজিক ধর্ম্মেরও আদি কোথায়, তাহা খুজিয়া পাওয়া যায় না। সহসা একদিন পাঁচজনে জটলা করিয়া এই ধর্ম্মের স্থাপনা করে নাই—কোন পুরুষকর্ত্তৃক ইহা "কৃত" নহে; বেদপন্থীর চক্ষুতে এই ধর্ম্মে যে ব্যবহারিক সামাজিক সত্যের একদেশের পরিচয় দেয়, তাহাও অনাদি ও অপৌরুষেয়। যে দিন হইতে আর্য্য জাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ হইয়াছে,—সে কোন্ দিন তাহা আজিও কেহ জানে না—সেই দিন হইতে এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের পারিভাষিক নাম যজ্ঞ এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ। ত্যাগ নহিলে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইতে পারে না। মানবজাতির ধর্ম্মমাত্রই

ত্যাগাত্মক ; তবে বেদপন্থী সমাজে ত্যাগের একটু বিশিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বেদপন্থীর বেদ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্পর্ক এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়েরই আলোচ্য বিষয় ; আর তৃতীয় কাণ্ডের কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আমি ইহা জানি এবং আমি ইহা করি—এই দুইটা বলিলেই আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হয় ; আর তৃতীয় কথা বলিবার প্রয়োজন থাকে না। এই বাহ্য জগৎ কতিপয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে নির্ম্মিত ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ছাড়িয়া দিলে বাহ্য জগতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আমারই জ্ঞানের বিষয় ; আমার যখন জ্ঞান থাকে না—যেমন সুষুপ্তির সময়—তখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের লেশমাত্র কোথাও কিছু থাকে না—তখন বাহ্য জগৎও থাকে না। বাহ্য জগৎ যে তখন বর্ত্তমান থাকে, কোন তার্কিকই তাহার প্রমাণ দিতে পারিবেন না। আমিই শব্দস্পর্শাদিকে জানি ; এবং যতক্ষণ জানি, ততক্ষণই উহারা বর্ত্তমান থাকে ; আমি জানি বলিয়াই বর্ত্তমান থাকে। আমিই ঐ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 'সৃষ্টি' করিয়া উহাদিগকে বিবিক্ত-ভাবে স্বতন্ত্র-ভাবে জানিয়া থাকি ; এবং উহাদিগকে দুই ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সাজাইয়া বিন্যস্ত করিয়া বা সন্নিবেশিত করিয়া জানিবার চেষ্টা করি। এক রকম বিন্যাসের নাম দেশে বিন্যাস ; অন্যরূপ বিন্যাসের নাম কালে বিন্যাস। এই দেশ ও কাল, উভয়ই সেই রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানগুলিকে সাজাইবার রীতিমাত্র ; উভয় রীতিই আমারই কল্পিত। আমার যখন জ্ঞান থাকে না, তখন দেশও থাকে না, কালও থাকে না ; তখন দেশকালের অস্তিত্বের কেহ প্রমাণ দিতে পারিবে না। ফলে এই দেশে বিস্তৃত ও কালে প্রসারিত রূপরসাদিময় বাহ্যজগৎকে আমি কল্পনা করিয়া বা সৃষ্টি করিয়া আমার কল্পিত সম্মুখে ও পশ্চাতে, আশে ও পাশে ছড়িয়া ফেলি এবং আমার কল্পিত অতীতে ও ভবিষ্যতে টানিয়া লইয়া যাই। ইহাই আমার

সুষুপ্তি হইতে জাগরণ; ইহারই নামান্তর জগৎ-সৃষ্টি। আবার যখন আমার জাগরণ সুষুপ্তিতে লীন হইয়া যায়, তখন এই বাহ্য জগৎকে গুটাইয়া লইয়া, দেশ ও কালকে লোপ করিয়া আমার ভিতরে টানিয়া লই—ইহারই নামান্তর প্রলয়। কিন্তু যখন এই জগদ্‌ব্যাপারটা আমারই কল্পনা—যখন কালনামক পদার্থটা আমারই কল্পিত,—তখন এই 'যখন' 'তখন' প্রভৃতি নির্দ্দেশেরও কোনরূপ পারমার্থিক তাৎপর্য্য নাই; জগৎই যদি কল্পনা হয়, তবে তাহার সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটনাও কল্পিত না হইয়া যায় না।

কিন্তু এই কল্পনা করে কে?

এই কল্পনা করি আমি। এই আমার অস্তিত্বে আমার কোনরূপ সংশয় নাই; সংশয় করিলে আমার কোন কথা কহিবারই অবসর বা অধিকার থাকে না। জগতের অস্তিত্ব আমার অপেক্ষা করে—আমি না থাকিলে এই জগৎ কোথায় থাকিত? কিন্তু আমার অস্তিত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। আমি আছি,—ইহা আমার পক্ষে অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। এই সত্যটুকুই পরমার্থতত্ত্ব।

আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, উহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক মাত্র। আমি উহাকে সৃষ্টি করিয়া আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি ও উহার সহিত আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতিয়াছি। এই কাল্পনিক সম্পর্ক পাতানর নাম ব্যবহার—এই ব্যবহারের আলোচনা যাবতীয় বিজ্ঞানবিদ্যার বিষয়।

বেদের যাহা জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতে ঋষিগণ এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে আমাছাড়া আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই। আমিই আছি—আর যাহা আছে বলিয়া মনে করি, তাহা মনে করি মাত্র, তাহা আমারই কল্পনামাত্র, আমারই সৃষ্টিমাত্র—তাহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। আমিই এই কল্পিত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—আমি ভিন্ন আর কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। এই যে আমি, সেই আমার

নামান্তর ব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত কোন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা একেবারে অনাবশ্যক। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য ইহাই—অহং ব্রহ্মাস্মি নাপরঃ।

প্রশ্ন উঠে, আমিই না হয় একমাত্র সৎপদার্থ হইলাম এবং জগৎ না হয় কল্পিত পদার্থ হইল; কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মৎকর্তৃক কেন ও কিরূপে সৃষ্ট বা কল্পিত হইল? নাসদাসীয় সূক্তের ঋষি এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ,"—কে জানে, কে বলিবে. এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ"—যিনি পরম ব্যোমে অর্থাৎ ব্যবহারিক দেশের পরপারে থাকিয়া এই জগতের অধ্যক্ষ, সাক্ষী বা দ্রষ্টা—তিনিই জানেন; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দ্রষ্টা আমিই ইহা জানি—আমিই উত্তর দিতে পারি। অথবা আমিও হয় ত জানি না; অর্থাৎ আমি মূঢ় সাজিয়া, এই জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহা না জানিবার ভান করি।

বস্তুতঃ এই জগতের উৎপত্তি একটা "বিসৃষ্টি" বা বিসর্জ্জনমাত্র,—ছুড়িয়া ফেলামাত্র; আমিই এই জগৎকে আমার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছি। কিরূপে ছুড়িয়া ফেলিলাম?—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের উৎপত্তিহেতু অর্থাৎ আমি ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতে ইহার উৎপত্তি। এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনামাত্র, আমার ইচ্ছামাত্র, আমার লীলামাত্র। আমার এই কামনারূপ জগন্নির্ম্মাণ-শক্তির পরবর্ত্তী কালে নাম দেওয়া হইয়াছে মায়া।

অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাক্ দেবী স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি, অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ, অহং মিত্রাবরুণোভা

বিভর্ম্মি, অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা"—আমিই রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ভরণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ভরণ করি। "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্, মম যোনিরপ্স্ব অন্তঃ সমুদ্রে, ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা, উতামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি"—আমিই সকলের শিরঃস্বরূপ দ্যৌঃপিতাকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের অভ্যন্তরে জলমধ্যে আমার যোনি আছে; সেই স্থান হইতে আমি সকল ভুবনে প্রতিষ্ঠিত হই; আমার দেহ দ্বারা আমি দ্যুলোক স্পর্শ করি। "অহমেব বাত ইব প্রবামি, আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা"—আমি বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবহমাণ হই। "পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা এতাবতী মহিমা সম্বভূব"—আমার মহিমা পৃথিবী ও দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়া রাখিয়াছে। কোন ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট হইতে পারে না।

আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। আমি এই জগতের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছি—কেন করিয়াছি, কি উদ্দেশে করিয়াছি? এ সমস্যার উত্তর দিতে আমিই সমর্থ, অথচ আমিও সম্যক্‌রূপে সমর্থ নহি। মনুষ্যের ভাষা আশ্রয় করিয়া আমি অসম্পূর্ণভাবে উত্তর দিই—আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি—ইহাই আমার কামনা—ইহাই আমার লীলা—ইহাই আমার আনন্দ। এই আনন্দ হইতেই ভূতসকল জন্মিয়াছে। অথবা ইহাই আমার মায়া;—মায়াবী আমি এই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিয়া আনন্দ পাইতেছি। নিতান্তই যদি মানবীয় ভাষায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—উহাই আমার আনন্দ—আমি এই ব্যবহারিক কল্পিত জগতের সম্পর্কে আনন্দস্বরূপ,—আমি রসস্বরূপ,—আমি কামস্বরূপ। এই জগন্নির্ম্মাণ-কামনাই আমার হ্লাদিনী শক্তি, উহা লীলাময়ী, অতএব আনন্দ-

রূপিণী। ভারতবর্ষে সমুদয় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব পন্থার ভিত্তি এইখানে। অথবা বলিতে হয়,—আমার মায়াকল্পিত এই জগদ্‌ব্যাপার;—জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের জননী আমার মায়া। এই মায়া আমার ইচ্ছা ও আমার আনন্দ—ইহা ইচ্ছাময়ী, অপিচ আনন্দময়ী। সমুদয় সাম্প্রদায়িক শাক্ত পন্থার ভিত্তি এইখানে। আর এই যে আমি—আমি আছি অতএব; আমি সৎস্বভাব; আমি মায়াজগতের চেতন সাক্ষী; অতএব আমি চিৎ স্বরূপ; আমার অস্তিত্বেই আমার আনন্দ—আমিই আমার পরম প্রেমাস্পদ—অয়মাত্মা পরানন্দঃ—অতএব আমি আনন্দস্বরূপ। একযোগে আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমি সত্য শিব সুন্দর—শান্ত শিব অদ্বয়—মায়া-জগতের কর্ত্তা সংহর্ত্তা হইলেও স্বয়ং উদাসীন—শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহম্। সমুদয় সাম্প্রদায়িক শৈব ধর্ম্মের ভিত্তি এইখানে। এই গেল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত যিনি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন, ইহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা—অন্যান্য বেদান্তবাক্য ইহারই পল্লবিত ভাষ্যমাত্র।

যাহা হউক, আমি এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক বিষয়রূপী জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—তাহাকে দেশে ও কালে ছড়াইয়া দিয়াছি—এবং এই স্বকল্পিত জগতের সহিত নিজের একটা সম্পর্ক পাতাইয়াছি। এই সম্পর্ক প্রথমতঃ জ্ঞানরূপী—আমি এই জগৎকে আমার জ্ঞানের বিষয় করিয়া লইয়াছি। এই জগৎকে আমি এইরূপ জানি—ইহাই আমার চেতনা। আমি চিৎস্বরূপ—আমি চেতন। এই জগৎ যে আমার জ্ঞান-গম্য হইতেছে—এই জগতের সহিত আমার যে এই সম্পর্ক পাতান হইয়াছে—ইহাই আমার চেতনা—ইহাই আমার জাগরণের অবস্থা। আমি চেতন থাকিয়া এই জগৎকে সম্মুখে ও পশ্চাতে, অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত দেখিতেছি; আমি এই জগদ্ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী। কেননা শব্দস্পর্শাদি পরস্পরকে জানিতে পারে না। শব্দ স্পর্শকে

জানে না, স্পর্শ রূপকে জানে না, আমি শব্দস্পর্শ সকলকেই জানি। আমিই চেতন—আর শব্দস্পর্শাদি সমস্তই অচেতন বা জড়। দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক কর্ম্মরূপী। বস্তুতঃ আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও কেমন একটা খেয়ালের বশে আপনাকে সেই জগতের সর্ব্বতোভাবে অধীন ধরিয়া লইয়াছি। মনে করিতেছি যে এই জগৎ অতি বৃহৎ, আর আমি অতি ক্ষুদ্র; মনে করিতেছি এই বৃহৎ জগৎ সর্ব্বতোভাবে আমাকে অধীন রাখিয়াছে। এই বৃহৎ জগতের সহিত সর্ব্বদা আমার আদান প্রদান চালাইতেছি; ইহার কিয়দংশ আমার উপাদেয়—আমি তাহা গ্রহণ করিতেছি; অপরাংশ আমার হেয়—তাহা আমি বর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপে মৎকৃত জগতের সহিত আমার একটা কারবার—লেনা দেনা চলিতেছে। এই কারবার—লেনা দেনা সমস্তই কল্পিত ব্যাপার—ইহারই নাম ব্যবহার—ইহারই নামান্তর কর্ম্ম। এবং এই কর্ম্মের ফল সুখদুঃখের ভোগ। আমি মনে করিতেছি যে আমি জগতের সহিত নিয়ত আদানপ্রদানরূপ কর্ম্ম করিতেছি ও সেই কর্ম্মের ফলরূপে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। যখন আমি এইরূপে আপনাকে জগতের অধীন মনে করিয়া জগতের সহিত আদান প্রদান—উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন—কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি, তখন আমার নাম হয় জীব। এই জীবরূপে আমি কর্ম্মকর্ত্তা ও কৃতকর্ম্মের ফল-ভোক্তা।

কে বলিল? কে জানে? আমি যে কর্ম্ম করিতেছি ও ফল ভোগ করিতেছি, তাহা কে জানে? আমিই জানি। আমিই ইহার দ্রষ্টা বা সাক্ষী। আমিই দেখিতেছি যে আমি জগতের সহিত আদান প্রদান কর্ম্মে নিযুক্ত আছি ও কর্ম্মফলের ভোক্তা রহিয়াছি। আমিই আমাকে ঐভাবে দেখিতেছি।

আমিই দেখি ও আমাকেই দেখি। যে আমি দেখি ও যে আমাকে দেখা যায়, উভয় আমিই এক আমি। আর দ্বিতীয় আমি কুত্রাপি নাই।

বাঙ্গালা আমি পদ সংস্কৃত ভাষায় আত্মা ; যে আমি দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা—তাহার নাম দিই পরমাত্মা ; যে আমি কর্ত্তা, ভোক্তারূপে দৃশ্য ও জ্ঞেয়, তাহার নাম দিই জীবাত্মা। অথচ উভয় আমিই এক আমি। কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়ই ব্যবহারমাত্র—জগৎ যখন কল্পনা, উহাও তখন কল্পনা। যতক্ষণ আমি এক কল্পনায় ভ্রান্ত থাকি, ততক্ষণ আমি বদ্ধ জীব। আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া এই কল্পিত জগতের অধীনতায় স্থাপনের নামই বন্ধন। যখন বুঝি এটা আমারই খেয়াল বা আমোদমাত্র, আমারই কল্পনা বা স্বপ্ন বা কামনা, তখন আমি মুক্ত। ইন্দ্রজালটাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝাই মুক্তি।

আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব। জীব এক বই দুই নহে—একমেব অদ্বিতীয়ম্। তবে ব্যবহারিক জগতে আমি খেয়ালের বশে মৎসদৃশ বহু জীবের কল্পনা করিয়া লই এবং সেই সকল কাল্পনিক জীবের সহিতও আদান প্রদান করিয়া খেয়াল পূরণ করি। ভাসুরকসিংহ কূপমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দ্বিতীয় সিংহের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল। বহু কূপে প্রতিবিম্ব দেখিবার সুযোগ পাইলে সে বহু সিংহের কল্পনা করিতে পারিত। কিন্তু ভাসুরক এক বই দুই হইত না। আমিও বহু দেহে মৎসদৃশ বহু জীবের কল্পনা করিলেও এক বই দুই হইতে পারি না। এই সকল কল্পিত মৎসদৃশ জীবের সমষ্টি মানবসমাজ। এই মানব-সমাজের সহিত আদানপ্রদানরূপ কর্ম্মও আমি করিয়া থাকি এবং তাহার ফলভোগও আমাকে করিতে হয়।

জীবের পক্ষে জগতের কিয়দংশ উপাদেয়, কিয়দংশ হেয়। উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন দ্বারা জীবের, জীবত্ব রক্ষিত হয়। ইহাতেই জীবের সুখ; উহা না করিতে পারিলেই জীবের দুঃখ। ঐ গ্রহণ ও ঐ বর্জ্জনই জীবের কর্ম্ম—তাহার করণে ফল সুখ ও অকারণে ফল দুঃখ। জীব সেই সুখভোগের ও দুঃখভোগের কর্ত্তা। এই সুখ-দুঃখ ভোগই ভোগ। কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল এই ভোগ।

কোন্ কর্ম্মের ফল সুখ, কোন্ কর্ম্মের ফল দুঃখ—তাহা আমি জীব সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না। যে ভ্রান্তি হইতে আমি ক্ষুদ্র জীব, সেই ভ্রান্তির বশে বুঝিতে পারি না। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিতে হয়। জগতের সহিত বহুদিন কারবার করিয়া তবে সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখপরিহারের উপায়—কোন্ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম্ম অকরণীয়—তাহা আমাকে বুঝিতে হয়। এই অভিজ্ঞতালাভ বহুকালসাধ্য ও বহুক্লেশসাধ্য। অনেক ঠেকিয়া তবে এই কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে ক্ষমতা জন্মে। আধিব্যাধি দৌর্ম্মনস্য প্রভৃতি দুঃখ সহিয়া সহিয়া ক্রমশঃ ঠেকিয়া শিখিতে হয়। জগতের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় লাভ করিতে হয় এবং সেই পরিচয়ের সহিত কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। জগতের সহিত পরিচয়বৃদ্ধিসহকারে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা একালের ভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আর তদ্দ্বারা যে কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ হয়, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই জন্য দাঁতন কাঠির ব্যবহার হইতে কুরুক্ষেত্রের লড়াই পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে দাঁতন কাঠির ব্যবহার-সম্বন্ধে উপদেশ দিলে তাহাতে বিদ্রূপ করিও না।

জীবের জীবত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব যখন গোড়াতেই একটা কল্পিত ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন, তখন জীবের বিজ্ঞানান্ধতাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানান্ধ জীব সর্ব্বদা কার্য্য অকার্য্য বিবেচনায় অক্ষম। যাহা উপাদেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা উপাদেয় নহে; যাহা হেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা হেয় নহে। ঐ অজ্ঞানান্ধতার ফলে জীব আপনাকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং জগৎকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জগতের সহিত একটা অহেতুক বিরোধের সম্পর্ক খাড়া করিয়া সর্ব্বদা প্রতারিত হয়। পরমার্থতঃ ঐরূপ বিরোধ নাই। ঈশাবাস্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে"—যে দেখে সর্ব্বভূতই আমাতে বর্ত্তমান এবং আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—সে সেই জগৎ

হইতে ভয় পায় না, জগৎকে ঘৃণা করে না। বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র জীবকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে—তাহারই ফলে আধিব্যাধি—যে এইরূপ মনে করে, সেই প্রতারিত হয়। আর যে জানে আমিই জগৎকে আমার বাহিরে, দূরে ও নিকটে, অতীতে ও ভবিষ্যতে, ছুড়িয়া ফেলিয়া, বিসর্জ্জন করিয়া, জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছি—জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করিবে কি, আমিই আপনাকে প্রসারণ করিয়া জগতে পরিণত করিয়াছি,—আধিব্যাধি আমার ক্রীড়ামাত্র—তাহার সেই ভয় নাই। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—যে জানে আমিই সব, তাহার মোহই বা কি আর শোকই বা কি ?

কিন্তু জীব যতক্ষণ আপনাকে জগতের অধীন ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করে, ততক্ষণ ইহা জানিতে পারে না তাহাকে জগতের সহিত সাবধানে কর্ম্ম করিতে হয়। এই কর্ম্ম যতই উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হউক না, এতদ্দ্বারা কখনই নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে না। কেননা যতক্ষণ জীবত্বভ্রম, ততক্ষণ বদ্ধত্ব, ততক্ষণই কর্ম্মের বন্ধন; তবে কোন্‌টা কার্য্য, কোন্‌টা অকার্য্য তাহার নিরূপণ দ্বারা জগতের সহিত জীবের জীবনের সামঞ্জস্যস্থাপনে আনুকূল্য ঘটে মাত্র। সুখের মাত্রা বাড়ে, দুঃখের মাত্রা কমে মাত্র, কিন্তু সুখদুঃখের অধীনতা রহিয়াই যায়।

বিজ্ঞানান্ধ জীব মনে করে বৃহৎ জগৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে উন্মুখ; তাহার পাল্‌টা দিতে গিয়া আপনার জীবত্ব রক্ষার জন্য সে জগতের যাহা কিছু উপাদেয় মনে করে, তাহাই নিজে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়; ইহাই তাহার প্রবৃত্তি। ছয়টা "রিপু" তাহাকে এই প্রবৃত্তির পথে চালায়। কিন্তু এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ও জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। কেননা জগতের সহিত জীবের প্রকৃত সম্পর্ক অন্যরূপ। আমিই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি—আপনাকে প্রসারিত করিয়া জগতে

পরিণত করিয়াছি—আপনাকে জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছি। এই যে জগন্নির্ম্মাণ ব্যাপার, ইহা আমার ত্যাগ। কেননা এতদ্দ্বারা আমি আমার মহত্ত্ব ত্যাগ করিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবে পরিণত করিয়াছি; আপনার একত্বকে নষ্ট করিয়া বহুত্বে পর্য্যবসিত করিয়া জগদ্বিধানের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি আমার বৃহত্ত্বকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করিয়া জীব সাজিয়াছি, এবং সেই ক্ষুদ্র আমা হইতে স্বতন্ত্র বৃহৎ জগৎ কল্পনা করিয়া সেই জগতের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছি;—স্বয়ং জগৎকর্ত্তা হইয়াও আপনাকে স্বকৃত জগতের নিকট বলি দিয়াছি।

অতএব এই জগন্নির্ম্মাণ একটা ত্যাগ এবং ত্যাগের নামান্তর যজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে আমিই সর্ব্বময়—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্"—যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহার সমষ্টিই পুরুষ।" পুরুষ অতি বৃহৎ, তাঁহার কিয়দংশ মাত্র বিশ্বভুবনরূপে বিজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞানগোচর; অবশিষ্ট অংশ এখনও অজ্ঞানাবৃত। 'স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"—সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন—তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আছেন। অথবা এই বিশ্বভুবন তাঁহার এক পাদ মাত্র—বিশ্বভুবনের ওপারে যে অদৃশ্য দীপ্তিময় অমৃত লোক আছে—সেখানে তাঁহার ত্রিপাদ বর্ত্তমান। কিন্তু হইলে কি হয়—"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ"—সেই সকলের অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে—যজ্ঞিয় পশুরূপে—কল্পনা করিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ"—সেই পুরুষকেই যজ্ঞিয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞসম্পাদন হইয়াছিল; সেই যজ্ঞ হইতেই চন্দ্র-সূর্য্য-ইন্দ্র-অগ্নি-ভূমি-আকাশ-ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি সকলেই জন্মিয়াছে।

অতএব এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ।

কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—"সংসার" করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল। প্রবৃত্তির বশে জীব সবই গ্রহণ করিতে চায়—প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে উপদেশ দিয়া তাহাকে ত্যাগ শিখাইতে হইবে। ত্যাগাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই জীবের সহিত জগতের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধিত হইবে—ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সম্পাদ্য—জীবের অন্যথা গতি নাই। এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে—এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মেই জীবের জীবত্বের সার্থকতা।

ঈশোপনিষৎ এই কথাই বলিয়াছেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ঈশিত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; ঈশ্বররূপী আমিই আপনাকে প্রসারণ করিয়া—বিলাইয়া দিয়া—সেই সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি আত্মত্যাগ দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই আমার ভোগের বিষয় হইয়াছে। মূলে ত্যাগ না থাকিলে ভোগ ঘটিত না। অতএব "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই ইহা ভোগ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে—ত্যাগই এখানে ভোগ—অন্যরূপ ভোগ জগদ্ব্যাপারের প্রতিকূল। অন্যরূপে ভোগ করিতে গেলে জগদ্ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"—এ সমস্তই যখন আমার—অন্যের ইহাতে কোন অধিকারই নাই—কেননা অন্য কেহ যখন বিদ্যমান নাই—তখন ইহাতে গৃধ্নুতার—লোভের—প্রয়োজন কি? নিজের ধনে কে নিজে লোভ করে? অতএব লোভ করিও না—ত্যাগ কর। এই ত্যাগই কর্ম্ম—এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াই পৃথিবীতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—ভাক্ত বৈরাগ্য দ্বারা সমস্ত জগৎকে হেয়

জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম কর ও শতায়ুঃ হইতেই ইচ্ছা কর—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে,"—এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে জীবকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যে হেতু তুমি জীব—তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। ত্যাগরূপ কর্ম্ম কর—তাহাতে তোমার উপরে আর নূতন কর্ম্মের প্রলেপ পড়িবে না। এই কর্ম্মেরই নামান্তর ধর্ম্ম।

মানবজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিপত্তন এইখানে। সর্ব্বদেশের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই ধর্ম্মমূল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ত্যাগই ধর্ম্ম—অন্যথা ধর্ম্মই না। কিন্তু কেন আমি ত্যাগ করিব—তাহাতে আমার লাভ কি—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অন্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র হাবুডুবু খাইয়াছেন। বেদপন্থীর বেদ এইখানে মূল সত্য আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। মানবজাতির জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা যেমন নাসদাসীয় সূক্তে পাওয়া যায়—সমস্ত বেদান্তবিদ্যা তাহাকেই পল্লবিত ও বিস্তারিত করিয়াছেন; মানবজাতির কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা, সেইরূপ এই ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়—সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাই মূল ধরিয়া পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়াছে।

বেদবিদ্যা এইরূপে ধর্ম্মমীমাংসা করিয়াছেন। জীব কর্ম্মে বাধ্য—কিন্তু সেই কর্ম্মত্যাগরূপী কর্ম্ম হইলেই জীবের সহিত জগতের আপাততঃ দৃশ্য বিরোধের মীমাংসা হয়; জগৎ হইতে জীবের ভয় দূরে যায়—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে না, কিন্তু পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ।

এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। বঙ্কিম বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন, যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে। আগুনে ঘি ঢালিয়া দেবতার নিকট কিছু আদায়ের চেষ্টাকেই তিনি সম্ভবতঃ যজ্ঞ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে যজ্ঞশব্দের গ্রহণ আবশ্যক ছিল না। ত্যাগাত্মক

কর্ম্ম যজ্ঞ, এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মে যদি ধর্ম্ম হয়, তবে যজ্ঞেই ধর্ম্ম। ত্যাগাত্মক না হইলে লোকহিতেও ধর্ম্ম হয় না। ইহ বা পরত্র লাভের প্রত্যাশায় যে লোকহিত, তাহা যজ্ঞ নহে; যে লোকহিতের মূলে কেবল ত্যাগ, তাহা মহাযজ্ঞ, অতএব পরম ধর্ম্ম।

আবার দেবোদ্দেশে আগুনে ঘি ঢালিয়াও যে ধর্ম্ম হয় না তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব না। কেন পারিব না, তাহা বুঝাইবার এ সময় নহে। মানবজাতির যে অংশ বেদপন্থী বলিয়া পরিচিত, সেই অংশ আবহমান কাল হইতে কতিপয় বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করিয়া অন্যান্য জাতি হইতে আপনার বিশিষ্টভাব রক্ষা করিতেন। আপনার সমাজতন্ত্রকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্য কতিপয় আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কারণপরম্পরায় ঐ সকল অনুষ্ঠান উদ্ভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বেদপন্থীর বেদশাস্ত্র সেই আচার অনুষ্ঠানকে পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন নাই, বরং সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে অব্যাহত রাখিয়া বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্টভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী ছিলেন। অধিকন্তু সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে সংস্কৃত, মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ করিয়া ত্যাগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যজ্ঞে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাই বেদপন্থীর সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। পশুযাগ, সোমযাগ, ইষ্টিযাগ প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, অবহিত ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মনুষ্যের স্বাভাবিক সহজ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া তাহাকে ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টাতেই এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভব। জীবধর্ম্ম বা সমাজধর্ম্ম স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যজ্ঞে পরিণত হয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ফল নিজের ভোগ্য মনে না করিয়া যজ্ঞেশ্বর নারায়ণে অর্পিত করিলেই তাহা যজ্ঞ হয়। কেননা দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম্মই যজ্ঞ।

মনুষ্য আপনাকে বৃহৎ জগদ্ব্যাপারের অধীন ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া লইয়া

জগদ্ব্যাপারের আপ্যায়নজন্য সর্ব্বস্বত্যাগে বাধ্য মনে করে; যজ্ঞকর্ম্মের গোড়ার কথা এই। কিন্তু স্বার্থান্ধ ও বিজ্ঞানান্ধ মানুষ এই সর্ব্বস্বত্যাগের অর্থ করিয়া লয় আত্মহত্যা—নরহত্যা। ফলে যজ্ঞে নরাহুতি বহুস্থলে প্রচলিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, বহু প্রাচীন সমাজে যজ্ঞার্থ নরপশুর প্রদান কোন না কোন আকারে প্রচলিত ছিল। বেদপন্থী সমাজেও হয়ত এক কালে নরযজ্ঞ চলিত ছিল। যজমান আপনার জীবন অর্পণ করিতে না পারিয়া পরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া যজ্ঞ করিত। নিজের পরিবর্ত্তে প্রতিভূস্বরূপে—বা নিষ্ক্রয়স্বরূপে—অন্যকে অর্পণ করিত। যীশুখ্রীষ্ট সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়স্বরূপে আপনাকে যজ্ঞিয় পশুরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অনুসারে নরের বদলে পশু—পশুর বদলে ধান যব—পশুযাগের পরিবর্ত্তে পুরোডাশযাগের স্থষ্টি;—উক্ত উপাখ্যানেই তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। মাতলামি করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা বহু জাতির ধর্ম্মেতিহাসে দেখা যায়। মাতাল জাগতিক বা সামাজিক বন্ধন মানিতে চায় না। মনে করে যে জগতের বন্ধন, বিশেষতঃ মৃত্যুর বন্ধন হইতে হয়ত সে এইরূপে মুক্ত হইতে পারিবে। সোমপানে মত্ততা জন্মে মাদকসেবনে স্ফূর্ত্তি হয়—দেবগণ সোমপান করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেন। তাঁহারা সোমপানেই ব্যবহারিক অমরতা পাইয়াছিলেন। এই ব্যবহারিক অমরতা লাভের জন্য, দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য, পার্থিব জগতের মলিনতা হইতে সংস্কৃত হইয়া দ্যুতিমান দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য—মনুষ্য সর্ব্বত্র লালায়িত; সোমপান করিয়া যজমান দেবত্বের জন্য স্পর্দ্ধী হইত। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবার ব্যবস্থা হইল—সোমপানের অনুষ্ঠান বজায় থাক—উহা বেদপন্থী সমাজের পুরাতন অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠান—কিন্তু মাতাল হইও না। সোমযজ্ঞে ব্যবস্থা হইল, চুমুকমাত্রেই পান, অথবা ঘ্রাণমাত্রেই পান। উদর পূরিয়া সোমরসপানের প্রয়োজন নাই—কেননা দেবগণ যে সোম

পান করে ন, তাহা সোমলতার রস নহে—“সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ, ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন”—ওষধি সোমকে পিষিয়া তাহার রস পান করিয়া লোকে মনে করে যে সোম পান করিলাম; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যাহাকে সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহ পান করিতে পায় না। “সোমেনাদিত্যা বলিনঃ, সোমেন পৃথিবী মহী, অথো নক্ষত্রাণামেষাম্, উপস্থে সোম আহিতঃ”—আদিত্যগণ সেই সোমের প্রভাবে বলবান্, পৃথিবী সেই সোমের প্রভাবেই মহীয়সী, সোম এই নক্ষত্রগণের সম্মুখে স্থাপিত আছেন। “অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্”—এই সোম পান করিয়া আমরা অমর হইয়াছি, জ্যোতিঃ পাইয়াছি, দেবগণকে জানিয়াছি। ঋষিগণ এই সোম পান করিয়া অমরতা লাভ করিতেন। উহা মাতলামি ছিল না।

কিন্তু যজ্ঞশব্দটি কেবল বেদপন্থী সমাজের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ ছিল না। উহা ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইত। যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য্য ত্যাগ, এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝিতে পারা যাইবে। জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধন যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ কল্পনা জ্ঞানান্ধ প্রবৃত্তিপ্রবণ মনুষ্যের সহজ ধর্ম্ম। মানুষ সহজে ত্যাগ করিতে চায় না, ভোগ করিতে চায়। ঈশোপনিষৎ দেখাইয়াছেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল। জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ। জীব জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই জগৎ ভোগের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই অধীনতা একরূপ ঋণস্বীকার। জীব জগতের নিকট নানা ঋণে আবদ্ধ।

বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র এইঋণের শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন—মনুষ্যের নিকট ঋণ, ভূতগণের নিকট ঋণ, পিতৃগণের নিকট ঋণ, দেবগণের নিকট ঋণ, এবং সর্ব্বশেষে ঋষিগণের নিকট ঋণ। এই পঞ্চবিধ ঋণ লইয়া মনুষ্যকে জীবরূপে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। এই পঞ্চঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাহাকে জগতের নিকট আপনার ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

যজ্ঞের মাহাত্ম্যবর্ণনায় বেদপন্থীর শাস্ত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে। বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারই একটা যজ্ঞ—পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। প্রজাপতি স্বয়ং এই যজ্ঞের যজমান; দেবগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক্। আবার যিনি যজমান, যাঁহার হিতার্থ এই যজ্ঞ, সেই বিরাট্ পুরুষ-রূপী প্রজাপতিই এই যজ্ঞের পশু। যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের উদ্দেশেই ত্যাগ—এই ত্যাগের অন্য কোন কামনা হইতে পারে না। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ"—দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই—ত্যাগস্বীকারদ্বারাই —যজ্ঞরূপী দেবতার যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও যজ্ঞরূপ বস্ত্রের বয়নকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন—সেই বস্ত্রে বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত রহিয়াছে—বিশ্বভুবনের ঘটনাবলী এই বস্ত্রের তন্তুসূত্র। "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্ততঃ, একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ, ইমে বয়ন্তি পিতরো য আ যযুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে"—এই যজ্ঞরূপী বস্ত্রের তন্তুসকল সমস্ত বিশ্বে আস্তীর্ণ হইয়াছে, দেবগণের কর্ম্মে ইহার শত তন্তু বিস্তৃত হইয়াছে; পিতৃগণ আগমন করিয়া তন্তুসকলদ্বারা বয়ন করিতেছেন; দৈর্ঘ্যের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বলিতে বলিতে তাঁহারা রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ—ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ—মানবসমাজগঠনকালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; "পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষুষা তান্ য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্ব্বে"—

পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আজ যেন আমি তাঁহাদিগকে মানস চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। এমন কি, বিশ্বকর্ম্মা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, —বিশ্বকর্ম্মা—"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা, ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা"—যিনি আমাদের পিতা ও জনক ও বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবন ও বিশ্বধাম জানেন, তিনিই প্রথমে এই বিশ্বনির্ম্মাণরূপ যজ্ঞ করেন—"য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদ্, ঋষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ"—সেই পিতা—সেই পুরাণ ঋষি—তিনিই হোতা হইয়া এই বিশ্বভুবনকে আহুতি দিতে বসিয়াছিলেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ, বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ, সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ, দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"—বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার চক্ষু ও মুখ, বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার হস্তপদ, সেই একমাত্র দেব, তিনি বাহু সঞ্চালন করিয়া ও পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গমন করেন—তাহাতেই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন হয়। ঋষি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বিবৃধানঃ, স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্"—অহে বিশ্বকর্ম্মা, তুমি ভূলোকে ও দ্যুলোকে বিশ্বসৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ করিয়াছ, ঐ যজ্ঞে অর্পিত হব্যদ্বারা, হবিঃশেষ-ভোজন দ্বারা তুমি স্বয়ং বর্দ্ধিত হও। তুমি যাহা ত্যাগ করিয়াছ, তাহাই তোমার ভোগ্য হউক।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মহাবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা এখন বুঝা যাইবে। ত্যাগই ভোগ—অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবনের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করিতে করিতেই শতায়ুঃ হইবার ইচ্ছা করিবে। গীতায় ভগবান্ এই মহাবাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—কোন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া

বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে—এই যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট কামনা দান করিবে—এই ত্যাগই তোমাদের ভোগ হইবে। "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ—নিয়ত কর্ম্ম কর, কেন না কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ" —যাঁহারা যজ্ঞের হুতাবশেষ ভোজন করেন—ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোগ করেন—তাঁহারা সর্ব্বপাপপ্রমুক্ত হন। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্—কর্ম্ম অক্ষর ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত, নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপনিষৎও বলিয়াছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—সেই জন্য সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর; কিন্তু আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে—"মা গৃধঃ"। কোন্ বিষয়ে আসক্ত হইবে? সবই ত তোমার। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়ো-হপ্যত্র মোহিতাঃ"—কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম অকার্য্য, ইহা পণ্ডিতেরাও ঠিক করিতে পারেন না। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ"—যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মকে দগ্ধ করেন। "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ, যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে"—যাঁহার আসক্তি নাই, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত, তিনি কর্ম্মবন্ধনমুক্ত; যজ্ঞার্থ আচরিত সমস্ত কর্ম্ম লয় পায়। এই কর্ম্মাকর্ম্মবিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কর্ম্মের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তুষ্টিরেব চ"। শ্রুতির অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী; স্মৃতি অর্থে মহাজনকৃত শ্রুতির তাৎপর্য্যব্যাখ্যা; সদাচার অর্থে মহাজনগণের অবলম্বিত পন্থা; এবং সকলের উপর আত্মতুষ্টি;—আত্মার পরিতোষ,—যিনি সকল তত্ত্বের হেতুভূত, সকল চরাচরের নিদান, যিনি আপনাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া স্বকল্পিত জগতের সমীপে আপনাকে যজ্ঞিয় পশুরূপে আহুতি

দিয়াছেন, তিনিই সেই বৃহৎ জগতের সহিত ক্ষুদ্র জীবের আদান-প্রদান-বিষয়ে, জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধনে, অন্তর্য্যামিস্বরূপে কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে পরম সহায়; দুর্গম সংসারযাত্রায় যেখানে কোন আলোক পাওয়া যায় না, যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচারও গন্তব্য নির্দ্দেশ করে না, সেই খানে সেই অন্তর্য্যামী সহায়;—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া আহ্বান করিলে অন্তর্যামী সেখানে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ, বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত এবং যুগে যুগে ঋষিমুখে প্রচারিত ও মহাজনকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম্ম, আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথপ্রদর্শক হউক। স্বধর্ম্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব—ইহাই এই ক্ষুদ্রলেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা নিয়তির প্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদের নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য্য বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা—কেন না ভগবান্ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।